পাতায় পাতায় রহস্য ।। অদ্রীশ বর্ধন

পাতায় পাতায় রহস্য

A Member of pathager.net

Against All Dirty Activity

পাতায় পাতায় রহস্য

অদ্রীশ বর্ধন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৪০১
তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৪

অলংকরণ সুব্রত চৌধুরী

ISBN 81-7215-344-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

৮০.০০

pathagar.net

প্রাণপ্রিয়
সিদ্ধার্থ ঘোষ-কে
অদ্রীশদা

সূচী

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

অলৌকিক অ্যাডভেঞ্চার

"লোকটাকে দেখতে অবিকল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সিনেমার হাতেগড়া দৈত্যটার মতন। হাইটে যা একটু ছোট। তেমন হৃষ্টপুষ্টও নয়। কিন্তু মাথার গড়ন হুবহু বরিস কারলফের মাথার গড়নের মতন।" এই পর্যন্ত বলে দারুণ আওয়াজ করে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আমি ব্যাজার মুখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। ইদানীং বড্ড বেশি নস্যি নিচ্ছে আমার এই খামখেয়ালি বন্ধুটি।

খুবই কড়া নস্যি নিশ্চয়। ঝাঁঝের চোটে জল এসে গেছে ইন্দ্রর চোখে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। বললে মুখটিপে হেসে, "আমার নস্যি নেওয়াটা তোর সহ্য হচ্ছে না বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী করি বল?"

আমি বললাম, "কী করি মানে? নস্যি না নিলেই হল। কেউ তো মাথার দিব্বি দেয়নি।"

"তা দেয়নি। তবে কী জানিস, মাথাটাকে ঝাঁকুনি না দিলে মনে হয় যেন মরেই গেছি। অনেকদিন তেমন অ্যাডভেঞ্চার করাও হচ্ছে না। নস্যিই এখন একমাত্র ভরসা।"

সকালের রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে ইন্দ্রনাথের ফর্সা শরীরে। এতক্ষণ ডনবৈঠক করছিল। এই শীতেও তাই ঘেমে গেছে। হাতের আর বুকের মাস্‌ল আরও ফুলে উঠেছে। দু' চোখের শান্ত চাহনি কিন্তু একই রকম আছে। সুন্দর মুখখানা আর ওই চোখজোড়া দেখলে ওকে কবি অথবা শিল্পী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, বিপদ আর অ্যাডভেঞ্চার শান্ত চেহারার এই মানুষটাকেই একেবারে পালটে দিয়ে যায়। তখন ওর দু' চোখে হিরে ঝকঝক করে, হাতে-পায়ে বনমানুষের শক্তি ভর করে, গলায় বাঘ ডাকে।

খাটের ওপরেই বসে পড়লাম। ইন্দ্রনাথ চেককাটা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বললে, "যা বলছিলাম। লোকটাকে দেখতে একটা ছোটখাট দৈত্যের মতন।"

"এসেছিল কেন?"

"ওর ধারণা, কেউ ওর ওপর তুকতাক চালিয়ে যাচ্ছে।"

"তুই কি পালটা তুকতাকের মন্ত্র জানিস? তোর কাছে কেন? তুই তো গোয়েন্দা।"

"আমিও তাই বলেছিলাম। লোকটা বললে, 'আপনি রহস্য নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন, তাই এসেছি আপনার কাছে। আমার জীবনটাই একটা রহস্য। 'লক্ষ হাতি'র দেশের লোক আমি।' এই পর্যন্ত বলেই এই জানলাটা দিয়ে তাকিয়েই কীরকম যেন হয়ে গেল। চট করে উঠে পড়ে বললে, 'আজ আর নয়। কাল সকালে আসব, রাত হলেই ওদের উৎপাত বাড়ে।' বলেই পাঁই-পাঁই করে এমনভাবে পালাল, যেন ভূতে তাড়া করেছে।"

"ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছিল?"

"অত দেখিনি। তবে ঘটনাটা ঘটে সন্ধের দিকে। চাঁদের আলো আসছিল এই জানলাটা দিয়ে। এখন যেমন আসছে সূর্যের আলো। লোকটা দাঁড়িয়েছিল সামনেই। দেখতেই পাচ্ছিস, এখানে দাঁড়ালে সুভাষ সরোবরের গাছপালা দেখা যায়, লেকের জল দেখা যায়। লোকটা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পড়পড়িয়ে পালিয়ে গেল।"

আমি বললাম, "তা হলে ভূত নয়, কাউকে দেখেই পালিয়েছে।"

ইন্দ্রনাথ বললে, "যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি।"

আমি হেসে বললাম, "ইন্দ্র, তুই উড়োজাহাজে চাপলেই পারিস। ওরকম ঝুঁকি আর অ্যাডভেঞ্চার কোথাও পাবি না—যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে।"

রসিকতার মুডে নেই ইন্দ্রনাথ। অন্য সময় হলে মুখরোচক এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বিরাট গল্পগাছা শুরু হয়ে যেত। সেদিন কিন্তু আনমনা হয়ে রইল, আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ও বলল, "মৃগ, তুই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস না, আমিও করি না। বিশ্বাস না করেও তুই গল্প লিখেছিস তাদেরকে নিয়েই, যাদের দেখা যায় না। তা হলে এরকম অ্যাডভেঞ্চারে দৌড়নোর ডাক যদি আমি পাই, আমিও বা যাব না কেন?"

আমি বললাম, "গল্প লিখি মজা করার জন্য। যারা পড়ে, তারাও মজা পাওয়ার জন্যই পড়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার সেখানে নেই। তবে তোর কেসটা আলাদা। গোয়েন্দা হয়ে তুই যদি ভূতদের পেছনে দৌড়স, লোকে তোর নিন্দে করবে।"

রাগ করে বললে ইন্দ্রনাথ, "লোকের কথার ধার ধারি না। আমার মন যা চায়, তাই করেছি চিরকাল। লোকটার ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তৈরি দানবের মতো

মাথাখানা দেখবার পর থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, অলৌকিক অ্যাডভেঞ্চার আছে এখানে, সেই অ্যাডভেঞ্চার 'ওরে আয়' 'ওরে আয়' বলে ডাক দিচ্ছে আমাকে।"

অট্টহেসে বললাম আমি, "নস্যি নিয়ে-নিয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কোনও কালেই পাত্তা দিতিস না। নিজের পাঁচটা ইন্দ্রিয়র ওপরেই ভরসা রেখেই চিরকাল চলেছিস। আজকের ইন্দ্রনাথ রুদ্র এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই ঠিকমতো খাটিয়েই তৈরি হয়েছে।'

"মৃগ, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই কি সব ?"

"মানে ?" অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি। "কী বলতে চাস, খুলে বল, ইন্দ্র। চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া—এ ছাড়া আবার কী থাকতে পারে মানুষের ? ল্যাজ ? সে তো আমাদের আদিপুরুষ বাঁদরদের ছিল !"

আমি একটু ঝাঁঝালো হয়ে গেছিলাম এই কথাগুলো বলতে গিয়ে। ইন্দ্রনাথ আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "ক্রাইমের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে, আজ পর্যন্ত যেগুলোর কিনারা হয়নি। বিলেত-আমেরিকার দুঁদে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নাকের জলে চোখের জলে হয়েছেন।"

"সব সময়ে সব অপরাধের অপরাধী ধরা পড়ে না।"

"তা নয়, মৃগ, অপরাধী আসলে কে, অনেক সময়ে তাও জানা যায় না। এসব ক্ষেত্রে অপরাধের কিনারা হবে কী করে ? এমন অনেক ঘটনা ক্রাইম হিস্ট্রিতে লেখা হয়ে আছে, যা মাথা ঘুরিয়ে দেয়, ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। আমেরিকায় একজন রজক খুন হয়েছিল তার নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। দরজায় মাথার ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি, বড় মানুষ গলতে পারে না। তাকে গুলি করা হয়েছে, খুব কাছ থেকে। শার্টে বারুদের ঝলসানি লেগেছে। কিন্তু শার্ট বা ভেতরের গেঞ্জি ফুটো হয়নি। শুধু চামড়া ফুটো হয়েছে। রিভলভার পড়ে রয়েছে পাশেই। ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। কী বলবি ? আত্মহত্যা ?"

"অবশ্যই।" বললাম আমি।

"তাই যদি হয়, তা হলে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলার পর রজক কি দানো হয়ে জামাকাপড় পরে নিয়েছিল ?"

"তা হলে কেউ ওকে গুলি করে জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে।"

"পালাল কী করে ? দরজা তো বন্ধ ভেতর থেকে।"

"দরজার ওপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে," কাষ্ঠ হেসে বললাম আমি।

"সেখান দিয়ে বড় মানুষ গলতে পারে না আগেই বলেছি। একটা বাচ্চাছেলেকে তার মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে নামিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। খুনি অত কষ্ট করতে যাবে কেন ? সে তো খুন করে দরজা খুলেই পালাতে পারত ?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা হলে তো রহস্যময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।"

"এরকম রহস্যময় কাণ্ড আরও আছে, মৃগ," বললে ইন্দ্রনাথ, "কথা তুললি বলে

একটা উদাহরণ দিলাম। অজস্র ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। আমরা হাজার মাথা খাটিয়েও সেসবের আদি-অন্ত রহস্য ধরতে পারি না।"

"কিন্তু হঠাৎ এই নিয়ে এত ভাবছিস কেন, ইন্দ্র ? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-মার্কা লোকটাকে দেখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বা সুড়সুড় করে উঠল কেন ?"

খোঁচা মেরে বললে ইন্দ্রনাথ, "হে সাহিত্যিক বন্ধু, তুমি অন্তত এই ভুলটি কোরো না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামটা দানবটার নয়, দানবকে যিনি বানিয়েছিলেন তাঁর নাম। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি হঠাৎ সুড়সুড় করে, আমার কিছু করার নেই। তবে লোকটা এসে গেছে, এখানেই আসছে। কীরকম অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে আসছে, তা জানা যাবে এক্ষুনি।"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম বেঁটেখাট নিরিমিষ চেহারার একটা লোক বেজির মতো খরখর করে ঢুকে পড়ল গেট পেরিয়ে !

যাচ্চলে ! এই লোক বলে কিনা সে, লক্ষ হাতির দেশের লোক !

অজানা শক্তি

লোকটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে আমার দিকেই তাকিয়ে রইল। যেন সে অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে-জানে, এমনি ভাবেই তাকিয়ে রইল। আমাকে এই প্রথম দেখেছে বলে চোখে-মুখে এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

হাতজোড় করে নমস্কার করতে করতে বললে, "মৃগবাবু, নমস্কার। এইমাত্র যার কথা শুনছিলেন, আমিই সেই।"

আমি তো আমি, ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, "বোসবাবু, আপনি কী করে জানলেন এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল ? মৃগকে আপনি চেনেন ?"

"আজ্ঞে না।" ঘরের ভেতর ঘুকতে-ঢুকতে বললেন রহস্যময় লোকটা, "মৃগবাবুকে কখনও দেখিনি। তবে ওঁর নাম শুনেছি। আরও ভাল করে শুনলাম একটু আগে। আমাকে ছোটখাট দৈত্য বলুন আর যাই বলুন, আমি লোকটা কিন্তু একেবারে নিরীহ।"

এইবারে মুখ হাঁ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। আমার মুখের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল কীরকম, তা বলতে পারব না। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেতাম !

বোসবাবু একটা চেয়ারে বসলেন। আমি প্রচণ্ড অবাক হলেও লোকটার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এই ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। পাঁচ ফুট হাইটও হবে কি না সন্দেহ। মাথার গড়নটা অদ্ভুত। খুলির ওপর দিক চ্যাপটা। খুলির পেছন দিকটাও চ্যাপটা, ঠিক যেন একটা চৌকোনা বাক্স। অল্প-অল্প চুল—কাঁচাপাকা। কপালের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। চোখের দু' কোণের চামড়াতেও অনেক ভাঁজ। নাকের দু'পাশের চামড়াও ভাঁজ খেয়ে ধনুকের মতো

বেঁকে নেমে এসেছে দু' ঠোঁটের দুই কোণ ঘিরে। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। গোটা মুখটা যেন তেল-চকচক করছে। তেল বেরোচ্ছে লোমকূপ থেকেই। তাই সারা মুখখানাকে একটু নোংরা-নোংরা মনে হচ্ছে। চোখ দুটো সামান্য কটা, বেড়ালের চোখের মতো একেবারে কটা নয়। চোখের গড়নটা দেখলেই বোঝা যায় চিনেম্যান অথবা মঙ্গোলিয়দের সঙ্গে বংশের পূর্ব-পুরুষদের একটা সম্পর্ক ছিল। এরকম চিনেম্যান-চিনেম্যান চোখ নদী-নালার দেশের বাঙালিদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। গায়ে তাঁর একটা ময়লা ভাঁজখাওয়া সাদা বুশ শার্ট, আর একটা ঢলঢলে তাকিয়ার খোলের মতন নীল প্যান্ট।

আমি ঢোক গিললাম। তারপর নমস্কার করলাম। বললাম, "আপনার নমস্কারটা একটু দেরিতে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ, একটু আগেই আপনার কথা শুনছিলাম ইন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে? আড়ি পেতেছিলেন?"

জিভ বের করে দুই হলদেটে নোংরা দাঁত দিয়ে রীতিমত লম্বা সেই জিভটাকে কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "অত অসভ্য আমি নই। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই লেকের পাড়ে। গাছের তলায়। চেয়ে ছিলাম অবশ্য এইদিকেই। ঠিক তক্ষুনি...কিছু মনে করবেন না সার, আমার এই ব্যাপারটা গোড়া থেকে যদি না শোনেন, বুঝতে পারবেন না, কেন আপনাদের কাছে দৌড়ে এসেছি। আমার ভেতরে আছে একটা অজানা শক্তি। আমি এমন কিছু লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু অদ্ভুত এই ক্ষমতাটা ভগবান আমাকে দিয়েছেন ছেলেবেলা থেকে। এই ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ হয়তো রাজাবাদশা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমি তা হতে চাই না, আমি চাই শুধু শান্তিতে থাকতে। তাও পারছি না। এ তো ক্ষমতা নয়, এ যে অভিশাপ। কী কুক্ষণে আমি গেছিলাম লাওসে, দেখেছিলাম পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তারপর থেকেই শনি লেগেছে আমার পেছনে। ইন্দ্রনাথবাবু, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, দূর থেকেই মারবে, আমার গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না। কিন্তু আমি মরে যাব। ওরা ভয়ানক লোক। ওরাও যে একটা ভয়ঙ্কর শক্তিকে দখলে রেখেছে। বছরের পর বছর আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটা গল্পের বইয়ে আপনার নামটা পড়লাম দু' দিন আগে। লিখেছেন ইনি, মৃগবাবু। প্রকাশকের কাছে গিয়ে আপনার নাম-ঠিকানা জোগাড় করেই দৌড়ে এসেছিলাম কাল রাতে। কিন্তু ওরাও এসে গেছে গন্ধে-গন্ধে। তাই পালিয়েছিলাম। ইন্দ্রনাথবাবু, শুনবেন আমার আশ্চর্য কাহিনী? শুনবেন ব্যাঙ্ককের পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তির রহস্যকথা?"

বোসবাবু হাঁফাচ্ছিলেন শেষের দিকে। ভদ্রলোক খুবই ভয় পেয়ে রয়েছেন। এত কথা একটানা বলে যাওয়ার সময়ে তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের যেরকম আনাগোনা দেখলাম, সেরকমটা ইচ্ছে করেও কেউ মুখে ফোটাতে পারে না।

তবে ওঁর একটা কথা শুনে আমি চেয়ে ছিলাম ইন্দ্রনাথের দিকে, ইন্দ্রনাথও চেয়ে ছিল আমার দিকে। উনি তড়বড় করে বলে গেলেন, ওঁকে মেরে ফেলা হবে দূর

থেকে ; গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না, কিন্তু উনি মরে যাবেন।

ঠিক এই ধরনের কথাই তো একটু আগে বলছিলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ। আমেরিকার সেই রজক খুন হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। জামা ঝলসে গিয়েছিল বারুদে। অথচ শার্ট আর গেঞ্জি ফুটো হয়নি, ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল শুধু বুকের চামড়া। আজও সে-রহস্যের সমাধান হয়নি।

বোসবাবু দেখছি ঠিক এই ধরনেরই সৃষ্টিছাড়া রহস্যের কথা বলছেন!

আমার চোখে-চোখে তাকিয়ে নিয়েই চুপচাপ বাকি কথাগুলো শুনে গেল ইন্দ্রনাথ। তারপর হাতের তালুতে নস্যি ঢালতে-ঢালতে বললে, "বলুন আপনার রহস্য গল্প, আমরা শুনতে চাই।"

হাত বাড়িয়ে বোসবাবু বললেন, কষ্টের হাসি হেসে, "একটু নস্যি দেবেন ?"

দূরের ছবি মনের চোখে

"আমার নাম ভিভিয়ান বোস নয়। আমার বাবা আর মা কোনওকালেই বোস ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পল। মাইকেল পল আমার বাবার নাম। মা শ্যামদেশের মেয়ে ছিলেন জন্মসূত্রে—মায়ের বাবা থাকতেন লাওসে।

"আমি জন্মেছিলাম বর্মার রেঙ্গুন শহরে। আমরা খ্রিস্টান। মাকে আমার মনে নেই। মা মারা যান আমার একুশ দিন বয়সে। তারপর থেকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। বোর্ডিং হাউসে ভর্তি হলাম তারপর। ছুটিছাটার দিনেও বোর্ডি-এ থাকতাম। বাবা এসেও আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন না। যেতে ইচ্ছে করত না।

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন আমার বাবা মারা যান বোমার টুকরোয়। আমি পালিয়ে আসি। কিছুদিন ছিলাম কাঁচরাপাড়ায়। নীলমণি বোসের বাড়িতে। গভর্নমেন্ট আমাকে তিনদিনের মধ্যে ইন্ডিয়া ছেড়ে যেতে বলেছিল একটা মিথ্যে ব্যাপারে। নীলমণি বোস বললেন, 'আজ থেকে তুমি পল নও, বোস হয়ে যাও। তা হলে আর কে ধরবে ? চলে যাও কলকাতায়।'

"সেই থেকে আছি কলকাতায়। খুব কষ্টে। থাক সে কথা। শুনুন, এবার আমার ভেতরকার অদ্ভুত শক্তিটার কথা। আজগুবি মনে হতে পারে।

"মায়ের কথা আমার মনে নেই। মায়ের ছবি পর্যন্ত দেখিনি। মায়ের জন্য মন কেমনও করে না। বাবা একাই মায়ের আদর দিয়ে গেছেন। নিজেকে কক্ষনো একা মনে হত না। এমনকী বাবা যখন আমাকে বাড়িতে রেখে দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যেতেন কাজে, তখনও মনে হত, বাবাকে ডাকলেই দৌড়ে আসবেন। এরকম মনে হওয়ার একটা কারণ আছে। বাবাকে আমি দেখতে পেতাম। প্রথম-প্রথম চোখ বন্ধ করে বাবার কথা ভাবলেই, বাবাকে দেখতে পেতাম কাঠগোলায় কাজ করছেন। কখনও দেখতাম নদীর ধারে কাঠের গুঁড়ি গুনছেন। তারপর থেকে এমনই হল যে, চোখ চেয়ে থেকেই দেখতে পেতাম

বাবাকে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ঠিক যেন ছবি ফুটে উঠত দেওয়ালে।

"আমার তখন এত কম বয়স, এটা যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা, তা বুঝতে পারতাম না। বাবা বাড়ি ফিরে এলে গল্প করতাম। সারাদিন বাবা কী করেছেন, কোথায় ছিলেন, স-ব বলতাম। বাবা অবাক হতেন। ভয় পেতেন। বলতেন, 'আর কাউকে বলিসনি, মাইকেল।'

"কেন অত ভয় পেতেন, তখন বুঝতাম না। পরে জেনেছিলাম। ডাইনি সন্দেহ করে কতজনকে তো পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দূরের জিনিস আমি দেখতে পাই জানাজানি হয়ে গেলে যদি আমাকে মেরে ফেলে? বাবা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন এই কারণেই।

"একদিন আমার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা আর-একটু বেড়ে গেল আমি নিজেই ভয় পাওয়ার পর। বাড়িতে একলা থাকতাম ঠিকই, কিন্তু কোনও অসুবিধে হত না। খাবারদাবার সাজিয়ে রেখে যেতেন বাবা। দরজা বন্ধ থাকত বাইরে থেকে। আমি খেলনা, বই নিয়ে ভুলে থাকতাম।

"একদিন কিন্তু ভয় পেলাম প্রচণ্ড। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলাম বাগানের ফুল আর পাখি। এমন সময়ে একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে এসে পড়ল জানলার গোবরাটে, সেখানে থেকে আর-একটা লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার আগেই ভীষণ বেগে কী যেন একটা ছিটকে এল জানলার দিকে। বাগানের মাটি থেকে জানলার গোবরাট অনেকটা দূরে। এতটা পথ যা ছিটকে এল প্রথমে তাকে দেখতেই পাইনি। মনে হয়েছিল যেন একটা কালো রেখা বাগান থেকে গোবরাট পর্যন্ত আচমকা শূন্যে তৈরি হয়ে শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

"আর তারপরেই ইঁদুরটার আর্তনাদ শুনেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল আমার। এত বড় মাকড়সা জীবনে দেখিনি। আটখানা পায়ে লম্বা-লম্বা কালো লোম। চোখ দুটো চুনি-পাথরের মতো লাল। জানলার দুটো গরাদের মধ্যে যতটুকু ফাঁক, তার চাইতেও বড়। ধড়খানা আমার এই মুঠোর সমান। ইঁদুরটার ঘাড়ে দুটো হুল ফুটিয়ে দিয়ে সে পা দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে।

"আমি মাত্র হাতখানেক দূর থেকেই ভয়ঙ্কর সেই মাকড়সাকে দেখে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মাকড়সা চেঁচানি শুনতে পায় কি না জানি না, কিন্তু আমার চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফ দিয়ে নেমে গেল বাগানে। আমিও দড়াম করে জানলার কপাট বন্ধ করে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম বিছানায় বসে।

"একটু পরেই শুনলাম তালা খোলার আওয়াজ। আওয়াজ শুনেই বুঝলাম, বাবা এলেন। কিন্তু বাবা তো এত তাড়াতাড়ি ফেরেন না। আমি উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বাবা দৌড়ে এলেন। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছিস? আর জানলা খুলিসনি। আজই নির্বংশ করব ওদের।'

"'কাদের?' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল প্রশ্নটা।

"'মাকড়সাদের।'

"'তুমি জানলে কী করে ?'

"'আমি যে দেখতে পেলাম ভীষণ ভয় পেয়েছিস। চোখ বড় বড় করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছিস। ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফিয়ে নেমে গেল বাগানে। ভাগ্যিস তোকে হুল ফোটায়নি।'

"'তুমি দেখতে পেলে ?'

"অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এতদিন জানতাম শুধু তুই একা দেখতে পাস, আজ জানলাম, আমাকেও দেখাতে পারিস দূরের জিনিস।'

"সেইদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম, তাই মনের শক্তি যেন ফেটে পড়েছিল। বাবার মনকে ছুঁয়েছিল অত দূরেও। এমন ঘটনা অবশ্য সবসময় ঘটে না। ইচ্ছা করলেই আমি যা দেখেছি, তা আর-একজনকে দেখাতে পারি না। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে আপনাকে দেখাতে পারছি না একটা যমদূত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি গুলি ছুঁড়তে পারেন ?"

চোখ কুঁচকে বোসবাবুর কথা শুনছিল ইন্দ্রনাথ, জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি বসে ছিলাম ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে সোফার ওপর। বোসবাবু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকেও জানলার দিকে চোখ না তুলে শেষ প্রশ্নটা একটু উদ্বেগের সুরে বলার সঙ্গে-সঙ্গে চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানলার মধ্যে দিয়ে সুভাষ সরোবরের হাওয়ায় উদ্দাম গাছপালার দিকে তাকিয়ে বললে, "কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

বোসবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন। চিনেম্যান টাইপের ছোট কটা চোখ দুটোয় ভয়ের চিহ্ন দেখলাম স্পষ্ট।

বললেন দ্রুত স্বরে, "রিভলভার! রিভলভার! প্লিজ! দূর থেকেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে হবে। চোখের পাতা ফেলবার আগেই..."

অদ্ভুত চেহারার এই লোকের কথায় ইন্দ্রনাথের মতন ডাকাবুকো মানুষ তৎপর হবে ভাবতেও পারিনি। আমি যদি ইন্দ্রনাথের জায়গায় থাকতাম, তা হলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম, রিভলভার-টিভলভার আনতে যেতাম না।

কিন্তু আমার এই বন্ধুটির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দেয়। সেই মুহূর্তেও দেখলাম, চোখের পলক ফেলার আগেই ও হেঁট হয়ে সোফার কুশনের তলা থেকে টেনে বের করল ওর রিভলভার। অথচ রিভলভার রাখার জায়গা ওটা নয়। আগে থেকেই কি তা হলে তৈরি হয়েছিল ইন্দ্রনাথ ? বোসবাবু কি ওঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে স্পর্শ করেছেন ইন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারি সত্তাকেও ?

এত কথা তখন ভাববার অবসর পাইনি। এর পরের ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, ভাল করে দেখতেও পেলাম না। শুধু এইটুকু দেখলাম যে, একটা ধ্যাবড়া কালো মতো কী জিনিস বাইরে থেকে আচমকা আবির্ভূত হল জানলার দুটো গরাদের ফাঁকে এবং পরমুহূর্তেই পিস্তলের গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তা

ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল জানলার বাইরে।

ইন্দ্রনাথ ফুঁ দিয়ে বাকি ধোঁয়া উড়িয়ে দিল রিভলভারের নলচে থেকে। তারপর একটুও না হেসে বোসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, "টিপখানা কীরকম দেখলেন?"

ফের চেয়ারে বসে পড়ে বললেন বোসবাবু, "চমৎকার। এবার নিন আমার শক্তির পরীক্ষা। এইমাত্র যাকে গুলি করে উড়িয়ে দিলেন, সে কে জানেন?"

"আপনিই বলুন," রিভলভারটাকে সোফার কুশনের তলায় রাখতে রাখতে বললে ইন্দ্রনাথ।

"যার ইঞ্চিখানেক লম্বা দুটো হুলের বিষে মানুষ মারা যেতে পারে, চলবার সময়ে যার গায়ের লোমের ঘষাঘষিতে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়, ওজন যার সাড়ে তিন আউন্স...।"

"এবং যার এক ঠ্যাং-এর ডগা থেকে আর-একটা ঠ্যাং-এর ডগা পর্যন্ত মাপলে দাঁড়ায় পাক্কা এগারো ইঞ্চি," এতক্ষণে মৃদু হাসি ভাসল ইন্দ্রনাথের পাতলা সুন্দর ঠোঁটে।

বোসবাবুর কটা চোখ দুটো বড় হয়ে গেল এই কথায়, "ক'টা ঠ্যাং বলুন তো?"

"আটটা।"

"এইটুকু সময়ের মধ্যে দেখলেন কী করে?"

"গোয়েন্দার চোখ দিয়ে," ইন্দ্রনাথের চোখে-মুখে এখন হাসি। এ-হাসি এমনই হাসি, যার মানে আমিও ছাই বুঝি না। এ-হাসি যখনই হাসে ইন্দ্রনাথ, তখনই কিন্তু জবর রহস্যের গোলকধাঁধায় তলিয়ে যায় মনে-মনে। এ-আমি অনেকবার দেখেছি। একটু থেমে ফের বলল ও, "আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েও দেখিয়ে দিতে পারেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই মাত্র যে তেড়ে এসেছিল আমার পিঠে লাফিয়ে পড়বে বলে, সে হয়তো র‍্যাম্‌বো স্বয়ং।"

"র‍্যাম্‌বো!" অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিলাম আমি।

হেঁয়ালির হাসি হাসতে-হাসতে বললে ইন্দ্রনাথ, "ভায়া মৃগাঙ্ক, র‍্যাম্‌বো মানে সিনেমার দাঙ্গাবাজ র‍্যাম্‌বো হিরো নয়। একে বলা যায় মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"টারানটুলা মাকড়সাও এর কাছে শিশু। এর নাম বর্জিয়া। নামটা মনে রেখো মৃগ, বর্জিয়া জামা ফুটো না করেও তোমার চামড়া ফুটো করে ছাড়তে পারে। কলারের ফাঁক দিয়ে বুকে-পিঠে চলে যেতে পারে। সাপকেও যারা সমীহ করে না, তারা আঁতকে ওঠে বর্জিয়ার সামনে। কিন্তু বোসবাবু, দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে যার নিবাস, সে সুভাষ সরোবরের পাশের এই বাড়িতে এল কী করে?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বোসবাবু বললেন, "আশ্চর্য মানুষ তো আপনি? র‍্যাম্‌বোকে না দেখেই এত কথা বলে গেলেন? আমি কিন্তু মনের চোখ দিয়েই আগেই দেখতে পেয়েছিলাম ও আসছে, জানলার দিকে লাফাতে যাচ্ছে..."

"আমিও দেখেছিলাম। আপনার চোখের মধ্যে দিয়ে।" বোসবাবুর কটা চোখের দিকে তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

"আশ্চর্য ! চলুন, গিয়ে দেখা যাক র‍্যাম্‌বোর লাশ।"

কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল বাইরে গিয়ে। র‍্যাম্‌বোর দেহের কিছু অংশ ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে বটে, সাড়ে তিন আউন্স ওজনের বপুটা নেই !

শূন্যে মিলিয়ে গেল নাকি ?

কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সূর্য তখন মাথার ওপর। বোসবাবুর চকচকে মুখে ঘামের ফোঁটা। ধূসর চোখে আতঙ্ক।

বললেন ফ্যাসফেসে গলায়, "দেখলেন সার, দেখলেন কাণ্ডটা। এক্কেবারে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে দিল।"

"কারা মিলিয়ে দিল, মিঃ পল ?" চোখের তারা দুটোকে ছুঁচের মতো সরু করে এনে জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ।

কটা চোখ নাচিয়ে বললেন বোসবাবু, "পল নয়, পল নয়। আমাকে বোসবাবু বলেই ডাকবেন।"

"বেশ তাই হোক, তাই হোক। এখন বলুন, বর্জিয়াকে অদৃশ্য করল কারা ?"

"তারা, যারা পাঠিয়েছিল ওকে।"

"তারা কারা ?"

"সেইটা বলতে দিল কই ? আগেই পাঠিয়ে দিল যমদূতটাকে। এবার বলি ?"

"বলুন।"

"আগেই বলেছি, মা ছিলেন শ্যামদেশের মেয়ে। যে দেশের নামডাক লাখ-লাখ হাতির জন্য। মায়ের বাবা জন্মেছিলেন লাওসদেশে। শ্যামদেশের ঠিক পাশের দেশ। যে-দেশের একদিকে চিন, একদিকে ভিয়েতনাম, আর-একদিকে ব্রহ্মদেশ আর শ্যামদেশ।

"লাওসের আদিবাসীদের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে লাও থিয়াঙ-রা থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে। আমার দাদামশাই ছিলেন লাও থিয়াঙ্। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দারা রাজা সামসেনথাই-এর আমল থেকে রাজাদের সেবা করে এসেছেন। বাবার মুখে শুনেছি, রাজারা এঁদের এত মণিমাণিক্য দিয়েছিলেন, যা এক জায়গায় রাখলে ছোটখাট একটা পাহাড় হয়ে যায়। ওঁরা কিন্তু যত জহরত পেয়েছিলেন, তার বিনিময়ে পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিই সঞ্চয় করে গেছেন। বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত পান্না-বুদ্ধদের মোট সংখ্যা কত, তা সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলে এক হাজার, কেউ বলে হাজার-হাজার। এরই জোরে দাদামশাই রাজা খেতাবও পেয়ে যান।

"পান্না-বুদ্ধরাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। খোদ রাজপরিবারের নজর পড়ল বিখ্যাত এই কালেকশনের দিকে, আমার দাদামশাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিদারুণ অত্যাচার করে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরেও তিনি বলে গেলেন না, কোথায়

রেখেছেন অত পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তাঁর প্রাসাদ তন্ন-তন্ন করে দেখা হল, বলতে গেলে প্রত্যেকটা পাথর খুলে পান্না-বুদ্ধদের খোঁজ করা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকেই।

"এই সব কাণ্ড ঘটবার আগেই আমার মা পালিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে এবং দেশ ছেড়ে। বর্মায় এসে নিজের পরিচয় লুকিয়ে কী কষ্টেই যে দিন কাটিয়েছেন, তা আর বলবার নয়। তারপর ঠাঁই পান একটা খ্রিস্টান মঠে।

"এসব গল্প শুনেছি বাবার কাছে। একটা কথা বেশ মনে আছে, কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। আমার মা মারা যাবার ঠিক আগে এই কথাটাই বিড়বিড় করে বলেছিলেন। স্পষ্ট শুনেছিলেন আমার বাবা। কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন বলতে কী যে বোঝাতে চেয়েছিলেন আমার মা, তা জিজ্ঞেস করার আগেই মা আমার চলে যান পৃথিবী ছেড়ে।

"তারপর থেকেই বাবা হিমশিম খেয়ে গেছেন আমাকে মানুষ করতে গিয়ে। রীতিমত গতর খাটিয়েছেন। পান্না-পাথরের বুদ্ধদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় একেবারে পাননি। তবে বাড়ি ফিরে অনেক রাতে আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে অনেক রূপকথা-উপকথার গল্প বলে যেতেন, ফাঁকে-ফাঁকে বলতেন লাওসের গল্প, শ্যামদেশের গল্প, লক্ষ হাতির গল্প, আর কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুনের গল্প।

"বর্মায় বোমা পড়তেই বাবাও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে। আমি পালিয়ে এলাম কলকাতায়। তারপর গেছে বেশ কয়েকটা বছর। মাঝে ছিলাম দার্জিলিঙের একটা খ্রিস্টান মঠে। সেইখানে দেখা হল শেরপা থুঙ-এর সঙ্গে।

"লোকটা যে পয়লা নম্বরের খুনে-বদমাশ, আগে তা বুঝিনি। এমন মিঠে-মিঠে কথা বলত, এমন মিষ্টি-মিষ্টি চোখে তাকাত যে, তার কাছে মনের আগল খুলে কথা না বলে পারতাম না। এইরকম আলগা মনের আলটপকা কথা বলার সময়েই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল আমার মনের আশ্চর্য ক্ষমতার ব্যাপারটা। আমি দূর থেকে দেখতে পাই, সেরকম বিপদ এলে অন্যকেও দেখাতে পারি, এইসব কথা শুনে শেরপা থুঙ আমাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে নিয়ে গেল শ্যামদেশে, শ্যামদেশ থেকে লাওসে। উদ্দেশ্য ছিল খুবই খারাপ, ওদেশে টহল দিতে-দিতে নিশ্চয় একদিন মনের চোখে দেখতে পাব বুদ্ধমূর্তিদের। পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে, খিদেয় নাড়ি চনচন করেছে, তবুও কিচ্ছু দেখতে পাইনি। শেষকালে বদমাশ শেরপা থুঙ আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। এককালে নিজে ছিল সাউথ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে। সেখান থেকে পেল্লায় মাকড়সাদের ধরে এনে দুটো আলাদা বাক্সে রেখে দিত। একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ। বাচ্চাগুলো বড় করে তুলত আর-একটা বাক্সে। মেয়ে-মাকড়সারা যখন ছেলে-মাকড়সাদের ধরে-ধরে খেত, আমাকে জোর করে দেখাত ভয়ানক দৃশ্য। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু কিছুতেই মনের চোখে দেখতে পেতাম না, কোথায় আছে মামাবাড়ির পান্না-বুদ্ধরা।

"এই সময়ে একটা বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজা প্রথমরাম

ব্যাঙ্ককে নিজের রাজনগরে যে বিশাল বুদ্ধমূর্তিটা বসিয়েছিলেন, সেটা যে আসল নয়, নকল, তা একনজরেই আমি টের পেয়েছিলাম। আচমকা তা মুখ দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল। পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ তা শুনে ফেলে কী অত্যাচারই না চালিয়ে গেল আমার ওপর। আমি কিন্তু জানলেও বলিনি কোথায় লুকনো আছে পান্না-পাথরের আসল বুদ্ধমূর্তি।"

পান্না-পাথরের পাকচক্র

ইন্দ্রনাথের খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়। আমারও পেটে ইঁদুর ডন মারছে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দু'জনের কেউই হেঁশেলের দিকে উঠে যাইনি গল্পে জমে যাওয়ায়। চৌকো মাথা নেড়ে-নেড়ে গল্প বলতেও পারেন বটে বোসবাবু।

তাই দম নেওয়ার জন্য যেই উনি থেমেছেন, অমনি টপ করে উঠে পড়ে হেঁশেল থেকে বিস্কুট আর মাখনের কৌটো এনে নিচু টেবিলে রেখে বললে ইন্দ্রনাথ, "বেড়ে গল্প জমিয়েছেন, বোসবাবু, নিন, দুটো বিস্কুট খেয়ে পিত্তি রক্ষা করুন। পেট চুঁইচুঁই করছে না?"

"নাঃ," বলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "দিন দিন, তবুও খাই। কতদিন কেউ এভাবে খেতে দেয়নি।"

একমুঠো মোটাসোটা বিস্কুট বোসবাবুর হাতে গছিয়ে দিয়ে মাখনের টিনটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "এর পর দেব দুধ। খেতে-খেতেই গপ্পো চালিয়ে যান। ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত পান্না-বুদ্ধ তা হলে আসল নয়?"

"একেবারেই নয়," গায়ে-গতরে ভারী তিনখানা বিস্কুট একসঙ্গে মুখে চালান করে দিয়ে খড়মড় করে চিবোতে-চিবোতে বললেন বোসবাবু। তারপরেই ঘ্যাঁচ করে এক আঙুল মাখন তুলে মুখে পুরে চুষতে-চুষতে শেষ করলেন আধবোজা চোখে, "ওয়াট ফারা কেও বৌদ্ধমঠে যা আছে, তা জাল মূর্তি। বুরবক বনে যাচ্ছে হাজার-হাজার ট্যুরিস্ট।"

"বলেন কী!" ধীরে সুস্থে একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "আসল বুদ্ধ তা হলে গেল কোথায়?"

"কোথায় আবার যাবে," উদাসভাবে চোখ বন্ধ করে ফেলে বললেন বোসবাবু। সারা মুখের অজস্র চামড়ার ভাঁজে অসংখ্য ঢেউ খেলে যেতে লাগল, চোয়াল নেড়ে-নেড়ে বিস্কুট চিবনোর সঙ্গে-সঙ্গে, "আছে শ্যামদেশেই, না, না, সরি, তার পাশেরই একটা দেশে।"

"পাশের দেশে! পাশে তো তিনটে দেশ আছে। বর্মা, লাওস আর চিন। কোনটার কথা বলছেন?"

এবার পুরোপুরি খুলে গেল বোসবাবুর দু' চোখের পাতা। কটা রঙের চোখে নিমেষে খেলে গেল ধূর্ততার ঝিলিক।

বললেন থেমে-থেমে, "এখন বলব না। শেরপা থুঙ ব্যাটা ঠিক শুনতে

পাবে।"

"এখানে সে কোথায় ?"

"আছে, আছে, বদমাশটা সব জায়গায় আছে, সবরকম ভাবে আছে। ওর আকাশে কান আছে, বাতাসে কান আছে। শুনতে চান কেন ? দেখিয়ে দেব।"

"দেখিয়ে দেবেন ? কোথায় ?"

"যেখানে আছে আসল পান্না-বুদ্ধ, যেখানে আছে হাজার-হাজার মামাবাড়ি বুদ্ধ। যাবেন ? নিয়ে যাবেন আমাকে ?"

স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ, "হ্যাঁ যাব।"

পেট-কাটা মেয়েটা

তাই আমরা এসেছি লাওসে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকেই গাঁইগুঁই শুরু করেছিলাম আমি। "যাওয়ার কথা তো শ্যামদেশে, যাচ্ছি কিন্তু লাওসে। কেন ?"

তেতিমেরি গলায় বলে উঠেছিলেন বোসবাবু, "দূর মশাই, অত ফ্যাচ-ফ্যাচ করছেন কেন ? চুপ করে থাকুন না।"

আহত গলায় বলেছিলাম, "আর-একটু ভাল গলায় জবাবটা দিলে হত না ? যাচ্ছি অনেক দূর দেশে। কতদিন একসঙ্গে ঘুরতে হবে আপনি জানেন না, আমিও জানি না। গোড়াতেই মেজাজটা মাটি করে দেবেন না।"

অমনি সারামুখে চামড়ার ভাঁজগুলোয় হাজারখানেক হিল্লোল তুলে হেসে উঠলেন বোসবাবু, "রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। অ্যাংজাইটি আর টেনশনে আমার নার্ভের দফারফা হয়ে গেছে। ওই ব্যাটা শেরপা থুঙ্ যদি শুনে ফ্যালে কোথায় যাচ্ছি..."

"কোনও শেরপারই টিকি দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত।"

"সেইজন্যেই তো ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। ব্যাটা যদি আবার একখানা র‍্যাম্বো ছেড়ে দেয়..."

"এখন আর ছাড়বে না। বুদ্ধমূর্তিদের সামনে পৌঁছলেই কিন্তু বাক্সগুলোই উপুড় করে ধরবে আপনার মুখের ওপর।"

সঙ্গে-সঙ্গে বোসবাবুর মুখের রং পালটে গেল। মুখের ওপর কিলবিলে মাকড়সাদের অনুভব করেই যেন কীরকম হয়ে গেলেন। মনে হল এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ পাশ থেকে গা টিপে দিয়ে বললে নরম গলায়, "ঘাবড়াবেন না, আমি আছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আছেন," ঢোক গিলতে-গিলতে বললেন বোসবাবু, "আপনার গুলি ফসকায় না। দেখলাম তো চোখের সামনেই।"

অনেক রকম কলকাঠি নেড়ে বিদেশ যাওয়ার হাজার বেড়াজাল পাশ কাটিয়ে ইন্দ্রনাথ আমাকে আর বোসবাবুকে এনে ফেলেছে লাওসে। নিদারুণ অ্যাডভেঞ্চারের লোভে আমিও টাকা ওড়াচ্ছি দেদার। মাঝেমধ্যেই এমনই করি আমি। জমানো টাকায় ময়লা জমতে দিই না। টিকটিকি বন্ধু ইন্দ্রনাথও কম যায় না। মাথা খাটিয়ে চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করে রোজগার করে যেমনই, খোলামকুচির মতো টাকাও ওড়ায় তেমনই। তা ছাড়া, বিয়ে-থা করেনি। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবনে কোনও নেশা নেই। তা না হলে মাইকেল পল ওরফে বোসবাবুর পিলে-চমকানো কাহিনী শুনে এতদূর কেউ দৌড়ে আসে ?

টাকা ওড়াচ্ছি শুধু আমরা দু'জনেই, হাত উপুড় করছেন না বোসবাবু। কাটা রেকর্ডের মতো একটা কথাই তিনি বলে যাচ্ছেন বারবার, "সুদে-আসলে সব ফিরিয়ে দেব, মশাই। একবার শুধু নিয়ে চলুন আমাকে পান্না-বুদ্ধদের সামনে।"

"সেটা কোথায় তা বলবেন তো ?"

এ-প্রশ্নটা শুধু আমিই করে গেছি, ইন্দ্রনাথ মুখে চাবি দিয়ে থেকেছে। মুখনাড়া খেয়েছি প্রতিবারেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বিড়াল-চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে বোসবাবু দিয়ে গেছেন একটাই জবাব, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই। আগে দেখি আমার মন যা জেনেছে তা সত্যি কি না, বলব তারপর।"

জ্বালা বটে !

পলকে পলকে মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে আরও একটা কারণে। পুরো ট্যুর প্রোগ্রামটা কনডাক্ট করে যাচ্ছেন বোসবাবু একাই। আমরা দুই বন্ধু কেবল কাঁড়িকাঁড়ি টাকাই খরচ করে যাচ্ছি। কিছু বলতে গেলেই ইন্দ্রনাথ আমার গা টিপে দিয়ে আড়ালে-আবডালে বলেছে, "চুপ করে থাক না ? ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস।"

"ধুত্তোর মিস্ট্রি !" তেড়েমেড়ে জবাব দিয়ে গেছি আমিও, "কেন যাচ্ছি, শুধু এইটুকু ছাড়া কোথায় যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি, কিছুই জানছি না..."

"সেটাও তো একটা মিস্ট্রি," মুচকি হেসে বলেছে ইন্দ্রনাথ, "বোসবাবুর মনের ক্ষমতার প্রমাণ তো পেয়েছিস ? বেশি জানতে চাসনি, আবার র‍্যাম্‌বো তেড়ে আসবে !"

ফলে গজগজ করেই শুরু হয়েছে আমার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার। আশ্চর্য বলে আশ্চর্য ! ইন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়ে প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এরকম রহস্য, এরকম চমক, আর এরকম দিশেহারা কাণ্ডকারখানায় কখনও পড়িনি।

তবে হ্যাঁ, লাওসের কোন অজ পাড়াগাঁ থেকে শুরু হয়নি বিচিত্র এই পর্যটন-পর্ব, প্লেন থেকে নেমেছি এক্কেবারে রাজধানীতে, যার নাম ভিয়েনতিয়ানে। প্রথম প্রথম আমার নিজেরও গুলিয়ে যাচ্ছিল ভিয়েতনাম আর ভিয়েনতিয়ানে নাম দুটোর

মধ্যে। তারপর মুখস্থ হয়ে গেছে ভিয়েনতিয়ানে নামটা। লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে। ভিয়েতনাম দেশটা রয়েছে লাওসের ঠিক পাশে। একডজন বছর ধরে রাশিয়া আর আমেরিকার রাজনীতির লড়াই চলেছিল যে দেশে, আমি এসে দাঁড়িয়েছি সেই দেশের রাজধানীতে।

লাওসে। রাজাদের আমল গেছে, এখন মার্ক্সসিস্ট লেনিনিস্ট রাজত্ব দেশজোড়া মানুষের মনে আশা আর মুখে হাসি এনে দিয়েছে। এতদিন যে দেশ 'মুয়ান' অর্থাৎ স্রেফ আমোদ-আহ্লাদ দিয়ে মশগুল হয়ে ছিল—এখন সেখানে কাজের জোয়ার এসেছে।

মেকং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম, অনেকদিন পর বেরিয়েছি বাংলার বাইরে, ভারতের বাইরে এই প্রথম, কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে রয়েছি ভারতের মাটিতেই। গঙ্গার জল দেখছি মেকং নদীর বুকে!

"সঙ্ কাবোই ?" কানের কাছে হঠাৎ বিদঘুটে দুটো শব্দ শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম বছর নয়েক বয়সের একটি লাও মেয়েকে। পুরু ঠোঁট দুটোয় যেন রাজ্যের অভিমান। ছোট-ছোট দুটো চোখের একটায় পাথরের চোখ বসানো। হলুদ রঙের ফ্রকটা গুটিয়ে পেটের ওপর তুলে রেখেছে বলে দেখা যাচ্ছে তার লম্বালম্বিভাবে কাটা-পেটের সেলাই। চামড়া গুটিয়ে গিয়ে জোড়া লেগেছে। দু' হাতে দুটো নীল রঙের জিন প্যান্ট বাড়িয়ে ধরে আবার সে বললে, "সঙ কাবোই ?"

শাঁ করে কোত্থেকে ছুটে এলেন বোসবাবু। এই মারেন কি সেই মারেন করে বাচ্চা মেয়েটাকে কী যে ছাই বলে গেলেন উনিই জানেন। মুখ চুন করে চলে গেল মেয়েটা। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন আধবুড়ো লাও। ফেরিওলা নিশ্চয়। কাঁধে অনেক জিন প্যান্ট। সবই নীল রঙের। হাত তুলে দেখাল আমাদের। শিকারি বিড়ালের মতো গোঁফ নাচিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুসি পাকিয়ে মেয়েটার হাত ধরে চলে গেল লোকটা।

রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়ালাম বোসবাবুর দিকে, "ছিঃ ছিঃ! একফোঁটা মেয়ের ওপর ঝালটা না ঝাড়লেই পারতেন।"

বোসবাবু হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, "স্পাই! স্পাই! মাকড়সা চালান করতে এসেছিল।"

"মাকড়সা! মাকড়সা দেখলেন কোথায় ?"

"আপনার চোখ থাকলে তো দেখবেন ?"

"সঙ্ কাবোই মানে কি মাকড়সা ?"

"আজ্ঞে না, সঙ্ কাবোই মানে ব্লু জিনের প্যান্ট। লাওসে তৈরি। সব লাও এখন এই প্যান্ট পরে।"

"আমিও না-হয় পরতাম।"

"তার আগেই মরতেন। পকেটে মাকড়সা পুরে সেফটিপিন দিয়ে মুখ আটকে রেখেছিল।"

"অ্যাঁ !" ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিলাম নিশ্চয় ।

বোসবাবু অভয় দেওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন, "ভয় পাবেন না, অত ঘাবড়ে যাবেন না। আমি তো আছি, আর আছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্র। লক্ষ্যভেদী ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গুলি কখনও ফসকায় না। হাঃ হাঃ হাঃ ! মশাই, মেয়েটার পেট-কাটা দেখেই গলে গেলেন ?"

ঢোক গিলে বলেছিলাম, "ওরকম বীভৎস ভাবে পেটটা কাটল কী করে ?"

"বোমায়...বোমায়...আমেরিকান বোমায় একখানা চোখ গেছে, পেটও ফেটেছে। ওরকম কেস এদেশে ঢের দেখবেন। গলে যাবেন না, গুপ্তচরের বেশে এদেরকেই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের পেছনে। পান্না-বুদ্ধর ঠিকানা যে শুধু আমিই জানি। হাঃ হাঃ হাঃ !"

মাথার মধ্যে কীরকম যেন করে উঠল সেই হাসি শুনে। ইদানীং বোসবাবু যখন-তখন এই রকম বিটকেল হাসি হেসে চলেছেন। নদীর পাড়ে জেটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মানুষই ঘুরে দাঁড়াল সেই হাসি শুনে। দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখলাম ইন্দ্রনাথকে।

জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ ? মেকং-এর দু' পাড়েই ঘন সবুজ গাছপালার জটলা বড্ড বেশি। শহুরে মানুষ আমি। আমার কাছে তা জঙ্গল বলেই মনে হয়। অনেক বড় নৌকো ভাসছে তীর ঘেঁষে। নৌকো না বলে সেগুলোকে কাঠের ভাসমান বাড়ি বলা উচিত। লাওসে ঋতু বিপর্যয়ের জন্য মানুষগুলো ডাঙার চাইতে জলে থাকাই অনেক নিরাপদ মনে করে।

ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে এল এইরকমই একটা বড় বজরার সামনের জঙ্গল থেকে। বজরা থেকে একটা কাঠের পাটাতন নেমে এসেছে তীর পর্যন্ত। জঙ্গল শুরু হয়েছে জলের ধার থেকেই। ইন্দ্রনাথ কি ওইখানেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ?

বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকায় প্রথমটা খেয়াল করিনি। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, গাছপালার সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক। গায়ে তার মিলিটারি পোশাক। জংলা পোশাক বলেই পাতা আর ডালের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে তার হাতের অটোমেটিক রাইফেল থেকে। অত দূর থেকেও বুঝলাম লোকটা অনিমেষে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকেই।

মাছপুকুরে বিস্ফোরণ

তুরুক-নাচ নেচে নিয়ে বললেন বোসবাবু, "কোথায় গিয়েছিলেন ?"

পেছনের জঙ্গল দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওখানে..."

"র‍্যাম্‌বো-রা কিন্তু ওত পেতে আছে। একটু আগেই মৃগবাবু স্বর্গে চলে যেতেন।"

বলার ঢঙ শুনে গা চিড়বিড় করে উঠল আমার। বললাম, "অত ক্যাবলা ভাববেন না আমাকে। এক মাকড়সার ভয়েই তো আপনি কুপোকাত। মৃত্যুকে

পায়ের ভৃত্য করেই কাটিয়ে চলেছি বছরের পর বছর।"

অট্টহেসে বললেন বোসবাবু, "সে তো মিঃ রুদ্র আপনার সঙ্গে আছেন বলে। কিছু মনে করবেন না, সার, লেখকরা কলম আর কাগজ নিয়েই শুধু আস্ফালন করে যান। কাজে নামলে..."

বাধা দিল ইন্দ্রনাথ, "বজরায় যাবেন, না গাড়ি নেবেন ?"

থমকে গিয়ে মেকং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন বোসবাবু। একটু একটু করে ঘোলাটে হয়ে এল চোখ দুটো। হাওয়ায় উড়ছে পাতলা সিল্কের মতো রুখু চুল। মানুষটাকে এখন আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

একটু পরে বললেন জড়িত স্বরে, "একটু ভাবতে দিন। মনের ছবি কেন যে ছাই স্পষ্ট হচ্ছে না...।"

মেকং-এর দিকে তাকিয়ে বোসবাবু যখন ধ্যানস্থ, ইন্দ্রনাথ আমাকে টেনে নিয়ে সরে এল একটু তফাতে। বললে, "কী হয়েছিল রে ?"

বললাম সঙ্ কাবোই আর পেট-কাটা মেয়েটার কথা।

সব শুনে বললে, "সঙ্ কাবোই মানে কাউবয় ট্রাউজার্স। লাও জোয়ানরা এখন এই প্যান্ট পরে। বিদেশী দেখে তোকেও পরাতে এসেছিল। বোসবাবু ধরেছেন ঠিকই। লোভে পড়ে এতক্ষণে পরলোকে চলে যেতিস।"

"তার আগে যেতে হত ওয়াট-এ," পেছন থেকে বলে উঠলেন বোসবাবু।

"সেটা আবার কোথায় ?" সকৌতুকে শুধোয় ইন্দ্রনাথ।

"ওয়াট মানে মঠ। পরলোকেই যান আর ইহলোকেই থাকুন—ওয়াটে আপনাকে যেতেই হবে।"

রেগে যাচ্ছিলাম। কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ, "আপাতত যাবেন কোন চুলোয় ?"

"মন ব্যাটা বড় বেগড়বাঁই করছে। চলুন, রুট থার্টিন ধরে রাজধানী ছেড়ে একটু বেরনো যাক। কখন যে ফ্ল্যাশ দেবে মনের ভেতরে তা ভগবান জানেন।"

"চলুন।"

তাই আমরা রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরিয়ে পড়েছি রুট থার্টিন সড়ক ধরে। চলেছি উত্তর দিকে। এখন শুকনো ঋতু। মাস তিনেক আগে থেমেছে বিরামবিহীন বৃষ্টি, বর্ষা আসতে আরও পাঁচ মাস।

"লাওস দেখবার উপযুক্ত সময় এটা," বিড়বিড় করে বললেন বোসবাবু।

"আপনার মনের জ্যোতির ফোয়ারা খুলে দেওয়ারও উপযুক্ত সময় বটে," টিপ্পনী কাটলাম আমি।

কুতকুতে চোখে শুধু আমার দিকে তাকিয়েই ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বোসবাবু। বেশ বুঝছি, ঝড় উঠেছে ওঁর মনের আকাশে। তাই এই অবস্থা। লোকটা একটা সচল রহস্য। যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

খোলা-জিপ হু-হু করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বাদামি রঙের ধানখেত। চষা মাঠ। ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। গোড়াগুলো রোদে জ্বলে বাদামি হয়ে রয়েছে। গাড়ি মেরামতের একটা টিনের চালাও দেখলাম। ইংরেজিতে লেখা রয়েছে সাইনবোর্ডে—'সুইডেন প্রতিষ্ঠিত'। তারপরেই একটা মুরগির খামার। 'অস্ট্রেলিয়ান সরকারের উদ্যোগ'। বোমায় বিধ্বস্ত লাওসকে গড়তে এগিয়ে এসেছে অনেক দেশ। শ্রীবৃদ্ধির ছাপ দু'পাশে দেখতে পাচ্ছি। কিছু বাড়ি লাও কায়দায় তৈরি হলেও থামগুলো কিন্তু আধুনিক কংক্রিটের। কাঠের নয়। খানকয়েক বাড়ি ইট দিয়েও গড়ে উঠেছে। এতক্ষণে দেখলাম একটা সবুজ ধানখেত। নতুন চারা গজাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান উপদেশে একই বছরে দু'বার ফলনের আয়োজন। সাইনবোর্ডের লেখা থেকেই যে-কোনও ট্যুরিস্ট যাতে বুঝতে পারে, সে ব্যবস্থার ত্রুটি নেই কোথাও। খেতের জল আসছে নাম গুম বাঁধের জলাধার থেকে।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম জলবিদ্যুৎ বাঁধে। ট্যুরিস্ট জিপ দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার নিজেই। তড়বড় করে অনেক কথাই বলে গেলেন। এই কিছুদিন হল সুইডেন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন। পাঁচখানা জেনারেটর আর অন্যান্য সরঞ্জাম এসেছে জাপান, পশ্চিম জার্মানি আর ইন্ডিয়া থেকে। সুইজারল্যান্ড দিয়েছে কারিগরি দক্ষতা, বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা।

ম্যানেজারের বক্তৃতা শুনলাম শুধু আমি আর ইন্দ্রনাথ। বোসবাবু সরে গেছেন অনেক তফাতে। বারোশো ফুট লম্বা বাঁধের মাথায় যে রাস্তা, তার ওপর দাঁড়িয়ে উনি আধবোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন উত্তর-পুবের পাহাড়গুলোর দিকে। বিশাল সবুজ সরোবরে ছায়া ভাসছে পর্বতমালার।

ম্যানেজার হাত-পা নেড়ে বললেন, "লেকের জল কত গভীর জানেন?"

"কত?" আনমনা গলায় বললে ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ বোসবাবুর দিকে।

"১৮০ ফুট। রোজ দশ টন মাছ ওঠে জল থেকে। মোট দশ রকমের মাছ। আর ওই যে তিনটে দ্বীপ দেখছেন, ওদের নাম শান্তির দ্বীপ, ছেলে দ্বীপ, মেয়ে দ্বীপ।"

"এরকম নাম কেন?" এবারের প্রশ্ন আমার।

"স্বাধীনতার পর অশিক্ষিতদের ওই তিনটে দ্বীপে রেখে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের আর ছেলেদের রাখা হয়েছিল আলাদা দ্বীপে।"

"আর ওই উঁচু পাহাড়টা? ওর নাম কী?"

"ফৌবিয়া, এদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। হাইট ন'হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ ফুট।"

নীল আকাশের বুকে ঠিক যেন ধোঁয়ায় গড়া চুড়ো লেপটে রয়েছে। চোখ নামিয়ে দেখলাম, বোসবাবুও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন সেদিকে।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্দ্রনাথ এবার এগোল ওঁর দিকে। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম পেছনে। বোসবাবু টের পেলেন না। কান পেতে শুনলাম ফিসফিস করে উনি বলছেন, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন...পান্না-পাথরের

বুদ্ধমূর্তি...ধুস্ ! যোগে মিলছে না !"

ফেরার পথে জিপ দাঁড়াল একটা মাঠের পাশে, বোসবাবু উত্তেজিতভাবে জিপের মধ্যে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন বলেই জিপ দাঁড়িয়েছে।

লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই উনি দৌড়লেন মাঠের মধ্যে। পেছনে আমি আর ইন্দ্রনাথ।

উঁচু রাস্তা থেকে দেখেছিলাম, তেপান্তরের মাঠে অজস্র গর্ত। ঠিক যেন চাঁদের বুকে উল্কাপাতের গহ্বর। কাছে গিয়ে দেখলাম, প্রতিটা গোল গর্তে জল ভর্তি, তাতে ঘাই মারছে অজস্র মাছ।

মাছের পুকুর প্রত্যেকটা গর্ত।

লাফাতে লাফাতে বললেন, "দেখলেন। দেখলেন। আমেরিকান বোমার কাণ্ড দেখলেন!"

হতভম্ব গলায় বললাম, "কী বলছেন, খুলে বলুন।"

"আর কত খুলে বলব মশাই? আকাশ থেকে টপাটপ বোমা ফেলে গর্ত বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বোমারুরা। এখন তাতে হচ্ছে মাছের চাষ। একজন চাষি দুঃখ করেছিল মাছের পুকুর নেই বলে। সেই রাতেই পড়ল বোমা। চাষি পেল পুকুর।"

"আপনি পেলেন কী?" আচমকা পাশ থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ইন্দ্রনাথ।

"আ...আমি! আমি আবার কী পাব?" হকচকিয়ে গেলেন বোসবাবু।

"বোমায় কারও পেট ফেটেছে, কারও চোখ গেছে, কারও বাবা-মা আর সর্বস্ব গেছে, আবার কেউ পেয়েছে মাছের পুকুর, কেউ হয়েছে ফকির, কেউ হয়েছে উজির। বোমায় লণ্ডভণ্ড লাওস-এর মাটি ফেটে পুকুর গজায়, পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিরা কেন উঠে আসে না?"

কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিল বোধ হয় ইন্দ্রনাথ। ওর চোখে-মুখের হাসি তার প্রমাণ। কিন্তু বোসবাবুর মুখটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাঁ দিকে একটা মাছের পুকুর ফেটে উড়ে গেল আকাশের দিকে। কানে তালা লেগে গেল ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজে। ধুলো আর জল আকাশে ছিটকে গিয়ে নেমে এল আমাদের সারা গায়ে।

ধোঁয়া কেটে গেলে বোসবাবুকে আমাদের পাশে দেখতে পেলাম না।

মেকং নদীর সোনার চড়া

বারুদের ধোঁয়ায় কাসতে-কাসতে বললাম, "গেলেন কোথায় বোসবাবু?"

নির্বিকারভাবে আশপাশে তাকাতে-তাকাতে ইন্দ্রনাথ বললে, "ড্রাইভার আগেই বলেছিল, এ-মাঠে বোমার গর্তে এখনও অনেক বোমা পড়ে আছে। আকাশ থেকে পড়েও ফাটেনি।"

"তুই জানতিস ?"

"জেনেশুনেই তো এসেছি," ইন্দ্রনাথের গলার সুরে এবার হেঁয়ালি ফুটে ওঠে, "বোসবাবু নিজে হুজ্জুতি করে নেমে না পড়লে আমিই নামতাম।"

"বোমায় উড়ে যাওয়ার জন্য ?"

"মৃগ, বারো বছর ধরে, যে বোমাগুলো এদেশের নানান জায়গায় পড়ে রয়েছে, খুব জোরে ঘা না মারলে যারা ফেটে যায় না, আচমকা আজ তারা কেন ফেটে উড়ে গেল বল তো ?"

"জবাবটা তুই জানিস মনে হচ্ছে ?"

"আমি ? হয়তো জানি। কিন্তু এখন বলব না। সময় এলে অনেক কিছুই জানতে পারবি, মৃগাঙ্ক। তোর গল্পের ভাঁড়ারে এমন গল্প এর আগে আর জমা পড়েনি। যথাসময়ে বুঝবি, চল, খোঁজা যাক বোসবাবুকে।"

"কোথায় তিনি ?"

"যেখানে বোমা থাকার আশঙ্কা নেই, সেখানে।"

বলে আমার কাঁধ ধরে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে দেখাল ইন্দ্রনাথ। দেখলাম, দূরে উঁচু রুট থার্টিন সড়কের জিপে উঠে বসে আছেন আমাদের রহস্যময় সঙ্গী মাইকেল পল ওরফে বোসবাবু।

কাছে যেতেই দাঁত বের করে হাসলেন ভদ্রলোক। হলুদ দাঁত। উনি যে কখনও দাঁত মাজেন না, সেটা একসঙ্গে বেরিয়ে ইস্তক লক্ষ করছি।

বললেন, "খুব জোর বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস একদম সামনের গর্তে এক্সপ্লোশনটা ঘটেনি।"

"ঘটলেও আপনার কিছু হত না," ইন্দ্রনাথ ওর সেই বিখ্যাত ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, "রাখে কেষ্ট, মারে কে। কেষ্ট এখন আপনাকে দিয়ে পান্না-বুদ্ধ খোঁজাচ্ছেন। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে।"

হাঃ হাঃ করে আবার বিচ্ছিরি হাসি হেসে বোসবাবু বলে উঠলেন, "আপনার কেষ্টকে বলুন আমার ব্রেনে পান্না-বুদ্ধদেব ঠিকানার ছবিটা কেবল ভাসিয়ে দিতে। ব্রেন যে ফাংশন করছে না একেবারেই।"

"এরকম শক্ পেয়েও করছে না ?" বোসবাবুর চোখে-চোখে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ।

সে চোখের চাহনি বড় অসাধারণ। দূরবিনের মতো যেন মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চায়। ইন্দ্রনাথ যখন এভাবে কারও দিকে তাকায়, তখন তার অবস্থা কাহিল না হয়ে যায় না।

বোসবাবু কিন্তু অটল রইলেন। ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেই বললেন, "শক্ ? কিসের শক্ ?" গলার স্বর ঠাণ্ডা।

"এই যে আচমকা আওয়াজ, ধোঁয়া, চারদিক কেঁপে ওঠা..."

"ধুস ! ওতে আমার কিছু হয় না। চলুন, চলুন, ফেরার পথে 'কিলোমিটার

সিক্স' দেখে যাই। যদি ব্রেন খোলে।"

আর কোনও কথা না বলে আমাকে টেনে নিয়ে জিপে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। সেই সময়ে দেখলাম, মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা একদল লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে হনহন করে যাচ্ছে বোমা যে গর্তে ফেটেছে—সেইদিকে।

বোসবাবুও তা দেখে নিয়ে তাড়া লাগালেন ড্রাইভারকে, "কুইক। কুইক!"

কিলোমিটার সিক্স একটা উপনগরী। ভিয়েনতিয়ানে শহরের বাইরে। আমেরিকানরা একসময়ে এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, ইন্দ্রপুরী গড়ে তুলেছিল। এখন সেখানে লাও পিপলস রিভলিউশনারি পার্টির সদর আড্ডা। কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে রাইফেলধারী শান্ত্রীরা।

দূর থেকেই চুপসে গেলেন বোসবাবু, "যাচ্চলে! এখানেও মিলিটারি!"

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওরা তো দুশমনের যম। আপনার নয়।"

"ওদের দেখলেই আমার ব্রেন ফাঁকা হয়ে যায়। চলুন, চলুন।"

"এবার কোথায়?"

"আগের রাজাদের রাজধানীতে।"

তাই এবার উড়ে যাচ্ছি আকাশ-পথে। বিশাল এই প্যাসেঞ্জার প্লেন তৈরি হয়েছে সোভিয়েত দেশে, উড়ছে লাওসের আকাশে। ভিয়েনতিয়ানে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে-যেতে পায়ের তলায় পেরিয়ে এলাম অরণ্যসবুজ পাহাড়-পর্বত। ঠিক যেন সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া উঁচু-নিচু পাহাড়গুলো। পায়ে খোঁচা লাগবে না যদি বিশাল পা নিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় এর ওপর দিয়ে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষজন থাকে না নির্জন এই প্রকৃতির দেশে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। সবুজ আস্তরণ ফুঁড়ে উঠে আসছে নীলচে ধোঁয়া। আগুন জ্বালাচ্ছে লাও থিয়াঙ্ আর লাও সাউঙ্ উপজাতিরা। পাহাড়েই এদের বাস। পাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গল পুড়িয়ে ধানজমি বের করছে চাষ আবাদ করবে বলে। তিরিশ মিনিট পরে এসে গেল মেকং আর জেঙ নদীর সঙ্গম। বেশ কয়েকটা লাল আর সোনালি মঠ রোদ্দুরে ঝকমক করছে। বড় শান্তির দেশ এই লুআঙ্ প্রাবাঙ্। এখানে হাওয়া-গাড়ি নেই বললেই চলে। আকাশ-পথ থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বৌদ্ধমঠ, সোনা আর মরকত দিয়েই তৈরি মনে হচ্ছে অত উঁচু থেকে।

কানের কাছে বোসবাবু ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরেই। অপূর্ব সুন্দর মঠগুলোর দিকে আঙুল নামিয়ে বললেন, "ওই দেখুন ওয়াট জিয়েঙ্ থঙ্। ওদিকে ওয়াট আফে, আর এই এদিকে তাকান, ওয়াট ভিক্সান।"

ভদ্রলোক অনেক খবর রাখেন। ওঁর এই বিরক্তিকর অট্টহাসিটা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু পাক্কা গাইডের মতো যখন কথা বলে যান, তখন মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে হয়। লাওস যেন ওঁর নখদর্পণে।

প্লেন থেকে নেমেও সেই প্রমাণ দিয়ে গেলেন বারবার। ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরোবার আগে উনিই বলেছিলেন, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে রয়্যাল

প্যালেসে ঢোকা যাবে না। ইন্দ্রনাথ তক্ষুনি ফরেন মিনিস্ট্রিতে যোগাযোগ-তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল লুআঙ্ প্রাবাঙে। তাই সহজেই ঢুকতে পারলাম সেখানে। বাইরে থেকে প্রাসাদটা কাঠখোট্টা চেহারার হলে কী হবে, রিসেপশন-রুমে পা দিয়েই বুঝলাম রাজাদের জায়গায় এসেছি বটে। সোনা আর ব্রোকেডের ঝলমলানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর কি। ঘুরে-ঘুরে দেখলাম গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পাঠানো উপহারগুলো। মাও পাঠিয়েছেন একটা চায়ের কাপ, লিনডন জনসন দিয়েছেন মেডেল, শটগান পাঠিয়েছেন ব্রেজনেভ।

গুলি-গুলি চোখ করে বোসবাবু সবকিছুই দেখে যাচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ রয়েছে ঠিক ওঁর পেছনে। ব্রেন যে কখন খুলবে, কখন বায়োস্কোপের মতন পান্না-বুদ্ধদের ছবি ভাসবে মনের পরদায়, সেই আশায় এরকম ঘোড়দৌড় জীবনে করিনি। ইন্দ্রনাথ আমার মতো কল্পনার ফানুস নয়। ও যে কেন হুট করে বোসবাবুর কথায় সায় দিয়ে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে এল, তাও বুঝছি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না ওর এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা, মাঝে-মাঝেই মনের সিন্দুকে ইয়াব্বড় তালা ঝুলিয়ে রাখে!

প্যালেস ঢুঁড়ে গেলাম মার্কেটে। পাহাড়ে চাষকরা আফিং বিক্রি করছিল পাগড়ি-পরা হোমোং মেয়েরা। পাহাড়ের বাড়ি থেকে এই বাজার তাদের কাছে মাত্র একদিনের পথ।

বোসবাবু আফিং-এর গুলিগুলোর দিকে গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে বলেই ফেললাম, "চলবে নাকি? মৌতাতে পান্না-বুদ্ধদেব ছবি এসে যেতে পারে মগজে।"

"ধুস!" বলে রেগে বাজার থেকে প্রস্থান করলেন বোসবাবু। পেছনে আমরা দুই বন্ধু।

পরের দিন ঠাণ্ডা ভোরে উঠে বসলাম নৌকোয়। মেকং নদীর চেহারা এখানে খুবই শীর্ণ। যেন খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। দু'পাশের পাড় খাড়াভাবে উঠে গেছে। উর্বর জমিতে চাষ আবাদ চলছে। মেয়েরা বালতি করে জল নিয়ে যাচ্ছে চাষের মাঠে ঢালবে বলে। গাছগাছড়া নদীর জল থেকেই গজিয়েছে অনেক জায়গায়। কুমড়োর মতন একরকম ঢাউস সবজি শুকোতে দেওয়া হয়েছে পাড় বরাবর।

আঙুল তুলে বললেন বোসবাবু, "ফাক নাম।"

"সেটা আবার কী?" তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম বলে চমকে উঠেছি হঠাৎ বিদঘুটে শব্দ দুটো শুনে।

"ওই সবজিটার নাম। তোফা খেতে মশাই। ওর সঙ্গে বাঁশের টক-ঝোল, আর শুওরের ছক্কা।"

"আপনি খেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"আপনিও চেটেপুটে মেরেছেন। এখান থেকেই সাপ্লাই যায় ভিয়েনতিয়ানে।"

জানি না হোটেলের কোন্ খানায় খেয়েছি ফাক নাম, শুওরের ছক্কা আর বাঁশের ঝোল, এখন কিন্তু গা পাক দিয়ে উঠল কথাটা শুনেই।

আচমকা ফের কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠলেন বোসবাবু, "লৌ লাও।"

"আবার কী হল ?"

"পানীয় মশাই, পানীয়। লাওদের অতি প্রিয় পানীয়। ওই দেখুন ভাত থেকে বানাচ্ছে।"

বাঁ দিকের তীরে খানছয়েক খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল তুলে পানীয়খানাগুলো দেখাতে গিয়েই আচমকা উজান স্রোতের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন বোসবাবু। অস্ফুট স্বরে বললেন শুধু একটাই শব্দ, "সোনা !"

চকিতে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। আমরা তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি নৌকোর ছাদে। উজানে চলেছে নৌকো। কোথায় চলেছে তা জানতে চাইনি। বোসবাবু বলেননি। বললেন এখন।

"সোনা ! সোনা ! মেকং নদীর সোনা !"

কিন্তু কোথায় সোনা ! নদীর ঘোলাটে জলে শুধু দেখছি কালচে রঙের কাদাগোলা কিছু বালি বিভিন্ন রেখায় মিলেমিশে চলেছে। এর নাম কি সোনা ?

বোসবাবুর বিড়াল-চোখ কিন্তু জ্বলছে বললেই চলে। কণ্ঠে জেগেছে তীব্রতা, "ওই তো ! ওই তো ! সোনায় ভরা চড়া উঠে এসেছে জলের ওপর !"

অদূরে দেখলাম সেই দৃশ্য। নৌকো প্রতিকূল স্রোত ঠেলে এগোচ্ছে সেই দিকেই।

মেকং নদীর একদিকে শ্যামদেশ, আর একদিকে লাওস। পশ্চিম দিকে এসে এই নদীই আবার সোজা উত্তরমুখো হয়ে লাওসের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে। নদী এখানে অনেক সরু। পাহাড় থেকে আও আর জেঙ নদী নেমে এসে এক হয়ে গিয়ে যেখান থেকে মেকং শুরু হয়েছে, সোনার চর জেগে উঠেছে ঠিক সেইখানে।

জায়গাটা অপরূপ। একদিকে চুনাপাথরের পাহাড়, নদীর পাড় থেকে খাড়াইভাবে উঠে গেছে হাজার ফুট উঁচুতে। বহুদিন আগে একটা চৈনিক তৈলচিত্রে এইরকম চোখ জুড়নো অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। সাদা পাথরের গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে হাজার হাজার কিরণরেখায়। ডাইনে আর বাঁয়ে সবুজ টিলার পর টিলা।

ঠিক নীচেই জেগে উঠেছে একটা চড়া। হলুদ কাঁকর, কালচে বালি আর এদিকে-ওদিকে অজস্র কাঁটাঝোপ ছাড়া সেখানে কিচ্ছু নেই। অনেক বেতের চুপড়ি উপুড় করে ছড়ানো ছোট্ট চড়াটার নানান দিকে। জলের ধারে খানকয়েক বেতের বাস্কেট। তার পাশে একটা উপুড় করা লোহার কড়াই।

নৌকোর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আরও দূরের সবুজ আর ধূসর পাহাড় আর পাহাড়। নদীর দুই পাড়েই। ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে রয়েছে দূর দিগন্তে।

কিন্তু সোনা এখানে কোথায় ? চিলের মতো বোসবাবু চেঁচিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, এক কণা সোনাও তো কোথাও দেখছি না। কাঁকর, বালি আর কাঁটাঝোপের মধ্যে অত দামি পাথর লুকিয়ে রয়েছে সবার চোখ এড়িয়ে—এটাও তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

দুটি মাত্র প্রাণী নদীর জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোসবাবুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

একজন একটি মেয়ে। লাও মেয়ে। মাথায় খোঁপা। পরনে সায়া-শেমিজের মতো পোশাক। হাতে একটা বেতের চুপড়ি। নুড়ি আর বালি তুলে জল ছেঁকে বের করছে। বদখত চিৎকার শুনে ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে রয়েছে চোখ বড়-বড় করে।

তার পাশের লাও পুরুষটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। লাফ দিয়ে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ছে। সে যে কত গরিব, তার প্রমাণ তার পরনের শতচ্ছিন্ন হাফপ্যান্টখানা, ছিঁড়ে গিয়ে সুতো ঝুলছে হাঁটু পর্যন্ত। গায়ের জ্যাকেটটা ময়লায় কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। মাথায় গোল উলের টুপি। হাতে এক চুপড়ি বালি আর কাঁকর। জল ছেঁকে বের করে দিচ্ছিল এতক্ষণ। আঁতকে উঠেছে বোসবাবুর বাজখাঁই চিৎকারে।

"সোনা ! সোনা ! সোনা !" তখনও লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন বোসবাবু।

মৃদু ধমকের সুরে ইন্দ্রনাথ বললে, "আঃ ! কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল ! পান্না-বুদ্ধ খুঁজতে এসে সোনার জন্য হেঁকে মরছেন কেন ?"

জ্বলজ্বলে বেড়াল-চোখে তাকিয়ে বললেন বোসবাবু, "কে জানে, এখানেই পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না। শুকনো ঋতুতেই তো কেবল ভেসে ওঠে চড়াটা, ডুবে থাকে অন্য ক'টা মাস।"

"এখানে !" ভুরু কুঁচকে যায় ইন্দ্রনাথের।

"অনেক ভেবেই আপনাদের এখানে এনেছি, মিঃ রুদ্র। মরবার সময়ে মা বলেছিল কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। মনে আছে ?"

"আছে..."

"সেরকম উনুন এখানেও তো থাকতে পারে ! বলতে গেলে বারোমাসই জলে ডুবে থাকে, তার মধ্যেই হয়তো আছে..."

"পান্না-বুদ্ধ !"

"রাইট ! রাইট !"

"কিন্তু এটা তো মাঠ নয়। পাহাড় রয়েছে আশেপাশে।"

"কী মুশকিল ! চড়াটাকেই মাঠ বলে ধরে নিন না।"

"ধরে নেব !" সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"আলবত ধরবেন। যদিও আমার মনের পটে স্পষ্ট ছবি এখনও ভাসছে না, তবে চড়ায় নেমে একটা চক্কর মারলেই হয়তো ভেসে উঠবে, ঠিক পিটার হারকোসেরক্ষেত্রে যা ঘটত।"

"পিটার হারকোস !" এতক্ষণে মুখে কথা ফুটল আমার, "নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে ?"

"শুনবেনই তো। আপনি হলেন গিয়ে লেখক মানুষ, জ্ঞানী মানুষ। পিটার হারকোস মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বলে দিত পায়ের তলায় কোথায় আছে সোনার খনি, কোথায় আছে পেট্রল।"

"অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতির খেলা," বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি।

"সে-খেলা আমিও দেখাই, সার, তবে পিটার হারকোসের মতো অত জোরালো সাইকিক আমি নই। এই, কী করছিস তোরা ?" শেষ প্রশ্নটা ঝোঁকের মাথায় খাস্ বাংলাতেই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বোসবাবু হতভম্ব লাও মেয়ে আর পুরুষটার দিকে। পরক্ষণেই লাও ভাষায় তড়বড় করে মাথা নেড়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনেক কথা বলে গেলেন।

মিনমিন করে ওরা জবাব দিয়ে গুটিগুটি সরে পড়বার তালে ছিল। কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন বোসবাবু। তারপর বিকট এক হাসি। হেসে হলুদ দাঁতের নোংরা দেখিয়ে বললেন আমাদের, "দেখবেন ? কাদা আর বালি থেকে সোনা তৈরি হয় কী করে, দেখবেন ? দেখুন, দেখুন, আমি ততক্ষণে এক চক্কর মেরে আসি চড়ায়, পিটার হারকোস, হে পিটার হারকোস, একটু দয়া করো, বাবা !"

নৌকো ঠেকেছে চড়ায়। পাটাতন নামিয়ে দিতেই আগে লাফাতে লাফাতে নেমে পড়ে পাঁইপাঁই করে ছুটে গিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন বোসবাবু।

মাথার ওপর দিয়ে কলবর করে উড়ে গেল অনেক পাখি। তারপর শুধু জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না কাঠের পুতুলের মতো। হেসে-হেসে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে লাও মেয়ে আর পুরুষটা। বড় নির্মল, বড় সরল হাসি। গায়ে ময়লা আছে, কিন্তু মনে ময়লা নেই।

নেমে গেলাম তীরে। ওরা সোনা তৈরি করল আমাদের সামনেই। চুপড়ি দিয়ে জল ছেঁকে বের করে নেওয়া বালি আর কাদা নিয়ে ঢেলে দিল লোহার কড়ায়। একটা বোতল থেকে চকচকে ভারী একটা তরল পদার্থ ঢেলে দিল তার ওপর।

"পারা," মৃদুস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, পারা-ই বটে। বালি আর কাদার মধ্যে সোনার গায়ে লেগে গিয়ে গুটলি-গুটলি বল হয়ে গেল। শুকনো কাঁটাগাছ জড়ো করে আগুন ধরিয়ে তাতে কড়া চাপিয়ে দিল ওরা। তারপর একটা ব্লোপাইপ দিয়ে জোর ফুঁ দিতেই গরম পারা উবে গিয়ে রেখে গেল সোনার ছোট-ছোট গুলি। সাইজ কড়ে আঙুলের নখের সমান। তেলতেলে মসৃণ নয়, অজস্র সোনার কণা যেন চেপে গুলি

পাকানো ।

হাসিমুখে ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে একমুঠো সোনার গুলি তুলে দিলে ইন্দ্রনাথের হাতে ।

না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে কী যেন বলতে যাচ্ছে ইন্দ্র, এমন সময়ে চড়ায় ভেতর দিক থেকে ভেসে এল উৎকট আর্তনাদ, "মেরে ফেললে ! মেরে ফেললে ! ওঃ ! ওঃ ! ওঃ !"

বোসবাবুর চিৎকার

পান্না-বুদ্ধ ! পান্না-বুদ্ধ !

কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বললে, "মৃগাঙ্ক, গোটা দুনিয়ায় মাকড়সা কতরকম জাতের আছে ?"

"প্রায় চল্লিশ হাজার । কিন্তু এখন..."

"এদের বিষে মানুষ কি মারা যায় ?"

"কখনওই না । তবে কামড়ের জায়গায় কোষগুলো বিষিয়ে গিয়ে রক্তকে বিষিয়ে দিতে পারে । ইন্দ্র..."

"তা হলে বোসবাবুর মরণ নেই । কিন্তু ভোগান্তি আছে," এই বলে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ । ওর চোখের সামনে উদ্দাম নাচ নেচে চলেছেন বোসবাবু । তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছেয়ে গেছে কালো কুচকুচে মাকড়সায় । সাইজে এক-একটা কালো ডুমুরের মতন ।

পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছেন ভদ্রলোক । চেঁচানি শুনে লাও মেয়ে আর পুরুষটা চুপড়িটুপড়ি ফেলেই দৌড়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে । ওরাও বোসবাবুর নৃত্য উপভোগ করছে । মিটিমিটি হাসছে ।

"বাঁচান ! বাঁচান ! খেয়ে ফেললে !"

নস্যির ডিবে বের করল ইন্দ্রনাথ । একটিপ নস্যি নিতে-নিতে তৃপ্ত স্বরে বললে, "দূর মশাই, আপনি কি, ও তো মাকড়সা ।"

"মা...মা...মানে ? ওঃ ! ওঃ ! ওঃ !"

"তা আপনার গায়ে উঠল কেন ?"

"পান্না-বুদ্ধ ! পান্না-বুদ্ধ !"

এইবার ইন্দ্রনাথের চোখে ঝিলিক দেখা গেল । লাও মেয়ে-পুরুষটার দিকে তাকিয়ে স্রেফ বাংলায় এক ধমক মেরে বলে উঠল, "হাঁ করে দেখছিস কী ? আগুন জ্বালা !" বলে, নিজেই শুকনো কাঁটাগাছ উপড়ে এনে ফস করে দেশলাই জ্বেলে তাতে আগুন লাগিয়ে আগুন-ধরা কাঁটাগাছে দুলিয়ে গেল বোসবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ।

টুপটুপ করে খসে পড়ল গুটলি-গুটলি কালো মাকড়সাবাহিনী । পোকা নয় বলেই আটঠেঙে এই প্রাণীদের বুদ্ধি নিশ্চয় আছে । তাই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'

নীতি অনুসরণ করে চোঁচা দৌড় মারল মাটির একটা গর্তের দিকে। দেখতে-দেখতে যেন একটা কালো কালির স্রোত নেমে গেল গর্তের ভেতরে। নিঃশব্দে, অবিশ্বাস্য বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গা-ঘিনঘিনে অষ্টপদ ভয়ঙ্কররা।

বোসবাবু ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটিতে। চোখ কপালে তুলে গোঁ-গোঁ করে উঠলেন, "জল ! জল !" প্রথমে বললেন বাংলায়, তারপর লাও ভাষায়। নিশ্চয় জলই চেয়েছিলেন, তাই লাও মেয়ে আর পুরুষটা নক্ষত্রবেগে দৌড়ল জল আনতে।

চোখের আড়ালে ওরা যেতে-না-যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বোসবাবু। চক্রান্তকারীর মতো গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললেন ফিসফিস করে, "পান্না-বুদ্ধ ! পান্না-বুদ্ধ !"

"কোথায় ?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন একটাই।

"মাকড়সাদের গর্তে !"

"আপনি দেখেছেন ?"

"ছবি দেখেছি, মাথার মধ্যে। হাত ঢোকাতেই ব্যাটারা পিলপিল করে বেরিয়ে এসে..."

থেমে গেলেন বোসবাবু। জল নিয়ে দৌড়ে আসছে লাও মেয়ে আর ছেলেটা। কাছে আসতেই ওদের হাত থেকে মাটির কুঁজোটা কেড়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলেন বোসবাবু। কুঁজো বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে, "খাবেন ?"

নীরস স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, "না।"

কুঁজো ফিরিয়ে দিয়ে লাও ভাষায় তেরিমেরি করে বোসবাবু যা বললেন, নিশ্চয় তার বাংলা মানেটা এই, "যা পালা !"

তা পালিয়েই গেল ওরা।

আমরা এখন মাকড়সার গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনজনের হাতেই শুকনো কাঁটাগাছের আঁটি। ইন্দ্রনাথের হাতে দেশলাই।

কাঠি জ্বলল। একে-একে জ্বলে উঠল তিনটে আঁটি। ইন্দ্রনাথ বললে, "এক, দুই, তিন।" তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনজনেই মশাল তিনটে গর্তে মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তিনলাফে সরে এলাম অনেকটা দূরে।

গর্তের মুখটা বেশ বড়। একটা মানুষ গলে যেতে পারে অনায়াসে। ভেতরে কাদামাটি, বালি, কাঁকর, কিচ্ছু নেই। কত গভীর, তা জানতে হলে গর্তের কিনারায় যেতে হবে বলে সে চেষ্টাও কেউ করিনি। তবে বেশ গভীর নিঃসন্দেহে, তিন-তিনটে মশালের ঝপ করে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনলাম সেকেন্ড কয়েক পরে। তারপরেই গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে এল গর্ত দিয়ে। সেই সঙ্গে পিলপিল করে কালো মাকড়সাদের স্রোত।

আরও খানিকটা দূরে সরে গেলাম। দূর থেকেই যখন দেখলাম আর একটাও মাকড়সা বেরোচ্ছে না গর্ত থেকে, প্রথমেই লাফ মেরে এগিয়ে গেলেন বোসবাবু।

ওঁর ট্যাঁকে যে একটা সরু টর্চ গোঁজা ছিল, তা জানতাম না। গর্তের কিনারায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই টর্চ মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যাঃ!"

ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেছি কিনারায়। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দেখছি গর্তের তলদেশ। সেখানে রয়েছে একটা মাটির জালা।

শূন্য জালা। ভেতরে কিছু ছিল, এখন নেই। কিছু অগ্নিদগ্ধ মাকড়সা আট পা গুটিয়ে উলটে পড়ে রয়েছে তলায়।

বজরায় উঠে মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বসে রইলেন বোসবাবু। কথা বলতে গেলেই খ্যাঁক করে উঠছেন দেখে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি সরে এলাম অন্যদিকে। বললাম চাপা গলায়, "খটকা লাগছে একটা ব্যাপারে।"

"যথা?" ইন্দ্রনাথের চোখে নাচছে হাসি।

"চড়াটা জলের তলায় ছিল অ্যাদ্দিন?"

"ছিল।"

"জল থেকে উঠেছে এই কিছুদিন?"

"উঠেছে।"

"গর্তের মধ্যে কাদামাটি, বালি, কাঁকর থাকা উচিত ছিল না কি?"

"উচিত ছিল।"

"কিন্তু তা নেই কেন?"

"কেউ এসে চেটেপুটে রেখেছে বলে।"

"সে কে?"

"চুপ করে যা, মৃগ। আর বকিসনি।"

চুপ করেই গেলাম। শুধু বুঝলাম, বোসবাবু জবরদস্ত সাইকিক। খুঁজে-খুঁজে ঠিক জায়গাতেই এসেছিলেন। গর্তের জালায় নিশ্চয় কিছু ছিল, তার দামও অনেক। তাই আমাদের আগেভাগে কোনও মূর্তিমান এসে মাকড়সাদের তাড়িয়ে মাটি খুঁড়ে জালা সাফ করে রেখে গেছে।

সে কে?

কলসি-মাঠের গুপ্তধন

রোখ চেপেছে বোসবাবুর। চাহনিও যেন কীরকম-কীরকম। চোখের মধ্যে থেকে যেন আর-এক চোখ কটমট করে চেয়ে রয়েছে। এই কি ওঁর অদৃশ্য চোখ?

উনি এখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আমাকে আর ইন্দ্রনাথকে। সোনার চড়া থেকে নৌকো ফিরিয়ে এনে জিপ ভাড়া নিয়েছেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল, সেই রাতেই বেরিয়ে পড়া। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। বিদেশ বিভূঁইয়ে অজানার অভিযানে রাতে বেরনো সমীচীন নয়। ফলে ভদ্রলোক সারারাত ছটফট করেছেন। এ হোটেলে আর ঘর না থাকায়, একটা ঘরেই রাত কাটিয়েছি

তিনজনে। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে উনি চেঁচিয়ে গেছেন লাও ভাষায়, তর্জন-গর্জন করেছেন, এই মারেন কি সেই মারেন করে রাত ভোর করে দিয়েই আমাদের ঠেলে তুলেছেন, "চলুন, চলুন, কলসি-মাঠে এবার হানা দেওয়া যাক।"

কোনওমতে কলঘর থেকে বেরিয়ে ধড়াচুড়া পরতে-পরতেই নেমে এসে উঠে পড়েছি জিপে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে চার চাকার যন্ত্রযান। এবং সেই প্রথম সটান প্রশ্ন করেছে ইন্দ্রনাথ, "মশাই কি এবার বলবেন, কোথায় যাচ্ছেন?"

জুলজুল করে তাকিয়ে বোসবাবু বলেছেন, "বলতে কি বাকি রেখেছি?"

"কিস্‌সু বলেননি। শুধু কলসি-মাঠ, কলসি-মাঠ বলে চেঁচাচ্ছেন।"

"ও হো! মাথার ঠিক নেই সার। পাগল-পাগল মনে হচ্ছে নিজেকে।"

মনে-মনে আমি বললাম, 'খাস পাগল তুমি! বদ্ধ পাগল, উন্মাদ কোথাকার! সাইকিক না ঘেঁচু! খুবই লটঘটে কেস!'

মুখে কুলুপ এঁটে রইলাম ইন্দ্রনাথের দাবড়ানির ভয়ে।

বোসবাবু বলে গেলেন, "ওই জালাটা দেখেই হঠাৎ মাথার মধ্যে খেলে গেল একটা আইডিয়া।"

"কিসের আইডিয়া?"

"ইন্দ্রনাথবাবু, এমন একটা জায়গায় আপনাদের এখন নিয়ে যাচ্ছি যা দু'হাজার বছর ধরে অনেক রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অনেক পণ্ডিতকে ভাবিয়ে তুলেছে, কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত সেগুলোর সমাধান করতে পারেনি। দিন, নস্যি দিন।"

নস্যির ডিবে বাড়িয়ে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "দু'হাজার বছরের রহস্য?"

"আজ্ঞে।" শব্দ করে নস্যি নিলেন বোসবাবু, "লাওসের ঠিক মাঝখানের উপত্যকায় দু'হাজার বছর ধরে রয়েছে অগুনতি জালা। বালিমাটি দিয়ে তৈরি বিশাল-বিশাল কলসি। এত কলসি কারা বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে, তা কেউ হাজার গবেষণা করেও আঁচ করে উঠতে পারছে না। আমরা যাচ্ছি সেইখানেই।"

"কলসি-মাঠে গুপ্তধনের খোঁজে?"

"আজ্ঞে। আমার মন বলছে, পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই কলসিগুলোর মধ্যে," বলতে-বলতে চোখ জ্বলে উঠল বোসব্যাবুর।

পাগলের চাহনি মনে হচ্ছে?

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কলসি-মাঠে।

এ-এক আশ্চর্য প্রান্তর। আমার চোখে তা অপূর্ব। ধু-ধু ধূসরাভা আর সবুজাভা মেশানো মূর্তিমান নির্জনতা যদি কিছু থাকে, তবে তা এই কলসি-মাঠ। মানুষসমান উঁচু-উঁচু ঘাস কোথাও রোদে জ্বলে হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, কোথাও সতেজ সবুজ আকারে মাথা উঁচিয়ে হাওয়ায় দুলছে। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের বহু দূরে ধূসর ন্যাড়া টিলার পর টিলা। গাছপালার চিহ্ন নেই কোথাও। অতিকায় কলসিগুলোকে তাই আরও দানবিক মনে হচ্ছে।

প্রত্যেকটা কলসি আট ফুট উঁচু। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা। হাইটে গরমিল নেই

কোথাও। এ-পর্যন্ত যত কলসির হাইট মেপেছি, সবই পাক্কা আট ফুট উঁচু। মুখের বেড় প্রত্যেকের ছাব্বিশ ফুট। এ-মাপেও হেরফের নেই এক ইঞ্চিও। যে ক'টার মুখের মাপ নিতে পেরেছি কলসির মাথায় চেপে, সবক'টাই পাকা ছাব্বিশ ফুট।

একটা কলসির মাথায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভরা কলসি-সমারোহের দিকে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। এ কী পাগলামি, না, উদ্ভট পরিকল্পনামাফিক অবিশ্বাস্য সৃষ্টির প্রয়াস? যতদূর চোখ যায়, একই মাপের কলসি দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেছে। দেখতে তাদের উনুনের মতো চৌকোনা। গায়ে শ্যাওলা আর রকমারি বুনো ফুল। কোনওটা ভেঙে পড়েছে, কোনওটা আস্ত রয়েছে। দু'হাজার বছরের বিস্ময়কে নিজের বুকে ধরে রেখে অটুট রয়েছে।

চেয়ে থেকেছি অবাক বিস্ময়ে, আর মাথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বোসবাবুর মায়ের শেষ কথাটা, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন—কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন!"

বিমূঢ়ভাবে নেমে এসে ইন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াতেই ও তাকাল বোসবাবুর দিকে, "কোথায় আছে গুপ্তধন?"

বোসবাবু তখন মাথা চুলকোচ্ছেন। অগুনতি কলসি দেখে ঘাবড়ে গেছেন বোঝাই যাচ্ছে। হাঁ করেছিলেন জবাবটা দেবেন বলে, তার আগেই দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। প্রান্তরের ওপর দিয়ে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই আওয়াজ। চমকে আওয়াজের উৎসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, দূরের একটা বিশাল জালার পেট ফেটে চৌচির। পাকসাট খেতে-খেতে কী একটা জিনিস তার ভেতর থেকেই ঠিকরে যাচ্ছে ওপর দিকে। অনেক উঁচুতে উঠেই আবার সেটাও ফেটে গেল দমাস্ করে। একতাল সাদা ধোঁয়া আর আগুনের ঝলক থেকে চারপাশে ছড়িয়ে গেল কুচো কাগজ।

জালার ভূত

"শেরপা থুঙ! শেরপা থুঙ!" কানের কাছে অকস্মাৎ বিকট চিৎকারে ভয়ানক চমকে উঠলাম। বোসবাবু তখনও উন্মাদের মতোই চোখ ঠেলে বের করে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, "শেরপা থুঙ! বদমাশ, এখানেও ঠিক এসেছে। লুটে নিয়ে গেল...লুটে নিয়ে গেল আমার পান্না-বুদ্ধ!"

আমি তক্ষুনি ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঘুরে-ঘুরে চেয়ে ছিলাম শেরপা থুঙ নামক সেই বিভীষিকাময় প্রাণীটির সন্ধানে। যাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি, কিন্তু যার অবর্ণনীয় পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার অনেক বর্ণনা শুনেছি বোসবাবুর মুখে।

কিন্তু কোথায় সেই আপদ? নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে কুচো কাগজ, উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

চোখ পড়ল ইন্দ্রনাথের চোখের ওপর। দু'হাত পেছনে মুঠি পাকিয়ে ধরে সে

নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে ফেটেফুটে যাওয়া দানবাকার কলসিটার দিকে। হাওয়ায় তার কোঁচা লটপট করছে, পাঞ্জাবির কোণ উড়ছে, মাথার লম্বা চুল চোখে-মুখে-কপালে লেপটে যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ সুপুরুষ, ইন্দ্রনাথ নিখাদ বাঙালি, ইন্দ্রনাথ সুপ্ত বলিষ্ঠতার রহস্যময় আধার। কলসি-মাঠের খাঁ-খাঁ প্রান্তরে ওকে আজ আরও সুন্দর, আর ব্যক্তিত্বময় লাগছে।

আমি বললাম, "ইন্দ্র, ও কী ?"

"দো-বোমা, একটু বড় সংস্করণ," স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"কে ফাটাল ? শেরপা থুঙ ?"

চোখের স্বপ্ন কেটে গেল নিমেষে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল ইন্দ্রনাথ। বললে, "বোসবাবু এখন সর্বত্র শেরপা থুঙকে দেখছেন।"

অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন বোসবাবু, "বললেই হল ? বললেই হল ? বলুন, তবে কে ফাটাল দো-বোমা ? কে উড়িয়ে দিল কলসি ?"

কথা শেষ হতে-না-হতেই ডান দিকে আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। রাশিরাশি মাটি আর ঘাস ছিটকে গেল শূন্যে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল ডান দিকে।

এবার আর কলসি ফাটছে না, মাটির মধ্যে বোমা ফাটছে !

ভয় পেলাম প্রচণ্ড। আমার চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছেন বোসবাবু। কাঁপছেন ঠকঠক করে।

ঠিক এই সময়ে জিপের ড্রাইভার দৌড়ে এল ওপরে। তাকে নীচে অনেক দূরে রেখে এসেছিলাম। হাউমাউ করে সে যা বললে, বোসবাবুর তর্জমায় তার মানেটা এই : গত যুদ্ধের অনেক বোমা এখানও রয়েছে আ-ফাটা অবস্থায়। একটার পর একটা ফেটে চলেছে সেইগুলোই।

পায়ের চাপেই ফেটে যেতে পারে...সুতরাং...সুতরাং আমরা পালিয়ে এলাম।

রাত নিশুতি। সারাদিনের অভিযানে জিপের নাচুনি আর ঝাঁকুনিতে জান কয়লা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গায়ে-গতরে ব্যথা। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তক্ষুনি।

ঠেলে তুলে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ঘর অন্ধকার। চোখ মেলে অন্ধকারেই বুঝলাম, ইন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপর।

কানের কাছে বললে আস্তে-আস্তে, "উঠে পড়, বেরোতে হবে।"

আচমকা ঘুম ভাঙলেও এসব পরিস্থিতিতে চমকে না-ওঠাটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি আমার এই পাগলা বন্ধুটির সঙ্গে। সহজভাবেই তাই বললাম, "কেন ? কোথায় ?"

ও বললে, "বোসবাবু এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।"

এবার কিন্তু ধড়মড় করে উঠে বসলাম, "সে কী !"
"চলে আয়, চলে আয়, চটপট !"

একটা ঘরেই পাশাপাশি তিনটে খাটে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল এই হোটেলে, আগেই তা বলেছি। একটা খাট খালি, বোসবাবু উধাও হয়েছেন।

কোনওরকমে ধড়াচূড়া এঁটে দৌড়ে নেমে এলাম ইন্দ্রনাথের পেছন-পেছন। একতলার রিসেপশন কাউন্টারের ক্লার্ক একটা পেপারব্যাক উপন্যাস পড়ছিল। ইংরেজিতে শুধোল ইন্দ্রনাথ, "মিঃ বোস এক্ষুনি বেরোলেন ?"

"ও ইয়েস।"

"কোথায় ?"

"টুওয়ার্ডস দ্য প্লেন অব জার।" অর্থাৎ কলসি-মাঠের দিকে।

"কোন গাড়ি নিয়ে গেলেন ?"

"হোটেল-জিপ।"

"আর একটা জিপ হবে ?"

"ও ইয়েস।"

আমরা রাত্রি-নিশীথে চলে এলাম কলসি-মাঠের নির্জনতায়।

কলসি-মাঠ জায়গাটা রাস্তা থেকে ভেতর দিকে পাহাড়ি উপত্যকার ওপর। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। তারপর পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠতে হয়। দিনের বেলাতেই কালঘাম ছুটে গেছিল। রাতের অন্ধকারে এ-কাজ করতে হবে ভেবেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের শক্ত চোয়াল আর কঠোর চোখ দেখে ট্যাঁ-ফুঁ করিনি।

বিশাল একটা গোল পাথরের আড়ালে হোটেলের আগের জিপটা দাঁড়িয়ে ছিল। একগাল হেসে ড্রাইভার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোন পথ দিয়ে গেছেন বোসবাবু।

আমরাও গেলাম সেই পথে।

জালার পর জালাগুলো অতিকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দিগন্ত পর্যন্ত। তারার আলোয় এ-মাঠের দৃশ্য যে এত স্পষ্ট দেখা যাবে, তা তো ভাবিনি। প্রত্যেকটা দানবিক কলসিকে এক-একটা জমাট নিরেট ছায়া বলেই মনে হচ্ছে। নিঝুম রাতে তাদের বিদঘুটে আকৃতিগুলোই গা কাঁপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

জোর হাওয়া বইছে। মানুষ-সমান পেল্লায় ঘাসগুলো নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে প্রান্তর জুড়ে অপার্থিব খসখস মড়মড় আওয়াজ হয়েই চলেছে। মাথার ওপরে কোটি-কোটি ঝকঝকে নক্ষত্র বোবা বিস্ময়ে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কলসি-মাঠের অজানা বিভীষিকাকে।

অজানা বিভীষিকা নিঃসন্দেহে। কেননা, আমরা দুই মূর্তি বেড়ালের মতো

নিঃশব্দে পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠে আসতেই স্পষ্ট শুনলাম ডান দিকে একটা অমানুষিক অট্টহাসি। বুকটা ধড়াস করে উঠতেই অনেক দূরে প্রান্তরের শেষের দিকে একটা পৈশাচিক আকৃতি আলোর দেহ নিয়ে ভেসে উঠল শূন্যে। শূন্যেই একটু-একটু করে অন্ধকারে ভরে গেল তার আলোর দেহ।

আর তার ঠিক পরেই সামনের বড় কলসিটার মাথার ওপরে ঝলসে উঠল একটা আলো, উঁকি দিল একটা মুণ্ড। নরমুণ্ড নিঃসন্দেহে, আলোর আভায় সেটুকু দেখেছি স্পষ্ট, পরক্ষণেই তার পাশের জালার বিশাল পেট থেকে একটা প্রকাণ্ড দানো দুলে-দুলে উঠে এল বাইরে। তার বিশাল পেট, চর্বিঝোলা ইয়াব্বড় মুখ ও লিকলিকে হাত আর পা থেকে টস্‌টস্‌ করে ঝরে পড়ছে তরল আগুন!

আবার সেই অমানুষিক অট্টহাসি। প্রান্তরের দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই রক্তজলকরা হাসি। হাসির দমকে-দমকে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠল কলসির মাথায় পিশাচমূর্তি।

আর বুকফাটা আর্তনাদ করে এদিককার কলসির মাথা থেকে ঠিকরে এল নরমুণ্ডের মালিক!

আমাদের বোসবাবু! হাতে তাঁর জ্বলন্ত টর্চ!

সাপের বিছানা

আবার আমরা উড়ে চলেছি আধুনিক পুষ্পকরথে চেপে। গোমড়া মুখে জানলার পাশেই বসেই আছেন বোসবাবু। তাঁর দিকে খরনজর রেখেছি আমি। লোকটাকে আর বিশ্বাস নেই। উড়ন্ত প্লেন থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারেন। মাথায় ছিট আছে, এ-বিশ্বাস আমার মাথায় আরও গেড়ে বসেছে কলসি-মাঠের লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার পর থেকেই।

খলখল হাসি শুনে আর শূন্যে ভাসমান পিশাচমূর্তির গায়ে গড়িয়ে পড়া তরল আগুন দেখে, বোসবাবু চেঁচাতে-চেঁচাতে হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে পড়েছিলেন কলসির মাথা থেকে। ভাগ্যিস আমরা দৌড়ে গিয়েছিলাম, তাই আট ফুট ওপর থেকে পড়ে গিয়েও মাথা ভাঙেননি ভদ্রলোক। লুফে নিয়েছিলাম আমরা।

তারপরেই তাঁকে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে এসেছিলাম নীচে। আসতে কি চান? কী চিৎকার! কী চিৎকার! চিৎকারের বিষয় একটাই, ভূত-প্রেতরা আগলে রেখেছে পান্না-পাথরের বুদ্ধদের! ভয়ের চোটে পালিয়ে এলে লাভ হবে অষ্টরম্ভা!

পায়ের তলায় বোমা ফাটলে যে কী হবে, সেটাই আমরা ওঁর মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। হোটেলে এনে ফেলে সারারাত দুজনে পাহারা দিয়েছি। যেরকম পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন আর লাফাচ্ছেন, বারান্দা থেকেও ছিটকে পড়তে পারেন। ভোরের দিকে ঘুমে নেতিয়ে পড়তেই ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুই ভূত-প্রেত মানিস?"

হেঁয়ালি করে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আমার মানা আর না-মানায় কার কী এসে

যায় ?”

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, “সোজা কথার সোজা জবাব দে। কলসির মাঠে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা সব সত্যি ?”

“কী ঝামেলা ! প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবিশ্বাস করা যায় ?”

ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে উঠেই গোঁ ধরেছিলেন বোসবাবু, “এবার দক্ষিণে।”

“সেটা কোন চুলোয় ?” বলেছিলাম কাঠখোট্টা গলায়।

“কথার ধরন শুনলে গা জ্বলে যায়,” খ্যাঁক করে উঠেছিলেন বোসবাবু, “দক্ষিণ মানে যমের দক্ষিণ দুয়ারে নয় মশাই, লাওসের দক্ষিণে।”

“কেন ?”

“আঃ গেল ! এসেছি কেন এখানে ? বুদ্ধ...বুদ্ধ...পান্না-বুদ্ধ রয়েছে দক্ষিণে...পষ্ট টান অনুভব করছি মনের মধ্যে !”

“শিকেয় তুলে রাখুন আপনার মনের টানকে,” তিড়বিড়িয়ে উঠেছিলাম আমি, “রাত-বিরেতে ভূতের মাঠে মরতে গেছিলেন কি মনের টানে ?”

“তা ছাড়া আবার কী ? কে যেন মনের মধ্যে বললে, ‘ওরে আয় ! ওরে আয় ! ওরে আয় !’ তাই তো ছুটলাম।”

“তারপর কলসির মাথা থেকে লাফিয়ে পড়লেন ?”

“লাফিয়ে তো পড়িনি !”

“তবে...”

“ঠেলে ফেলে দিল।”

“কে ?”

চোখ-মুখ কেমন যেন হয়ে গেল বোসবাবুর, “তাদের দেখা যায় না মৃগাঙ্কবাবু !”

আমরা এসে গেছি এখন লাওসের দক্ষিণ অঞ্চলে। কেন যে এই অঞ্চলকে নিয়ে কবিরা এত কলম চালনা করেন, আকাশ থেকেই তা মালুম হচ্ছে আমার। গোটা চাম্পাসাক প্রদেশটাকে প্রকৃতিদেবী যেন নিজের হাতে মনের মতো করে সাজিয়েছেন। এত সৌন্দর্য বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রুট থার্টিন সড়কের সেতুগুলো যে নতুন তৈরি, তা এত উঁচু থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। বোসবাবুর মনমরা ভাবটাও কমেছে। বিড়বিড় করে জ্ঞান দিয়ে গেলেন আমাকে, “সোভিয়েত দেশ আর পুব জার্মানির টাকায় তৈরি সেতু মশাই। এই গেল আপনার রুট থার্টিন। ওই দেখুন রুট নাইন। দুটো ভাগ হয়ে গেছে, দেখেছেন ?”

“দেখতেই তো পাচ্ছি,” মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম।

“একটা রাস্তা গেছে সোজা পুব দিকের ভিয়েতনামে, আর-একটা দক্ষিণ চিন সাগরে।”

“রাস্তায় পিচ ঢালাই চলছে এখনও ?”

“চলছে গত-বছর থেকেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মৃগাঙ্কবাবু। রাশিয়া থেকে

পেট্রল আসছে এই রাস্তায়। লাও কাঠের গুঁড়ি যাচ্ছে রাশিয়ায়।"

"মেকং নদী এখানে এত চওড়া?"

"পাক্কা এক মাইল চওড়া। ভাবতে পারেন?"

ভাবাটা সত্যিই শক্ত। মেকং যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে সোনার চড়া দেখে এসেছি। সেখানে তার এক রূপ। ক্ষীণ, কিন্তু বন্য। এখানে বিশাল এবং ঢলঢলে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই মেকং নদীর বুকেই শুরু হল আমাদের শেষের অভিযান। এবং সেই অভিযানের শেষে যে এত পিলে চমকানো ব্যাপার ছিল, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

নৌকোয় চাপার আগে থেকেই বোসবাবুর মাথার পোকা নতুন করে নড়ে উঠেছিল। প্লেন থেকে নেমেই চিংড়ি মাছের মতো লাফাতে লাগলেন, "জলদি! জলদি! শেরপা থুঙের আগেই পৌঁছতে হবে।"

"কোথায় আপনার শেরপা থুঙ?" কড়া গলায় বলেছিলাম আমি, "প্লেনে কোনও শেরপাকে দেখিনি।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে চেনা দেবার জন্য শেরপা থুঙ শেরপার চেহারা নিয়ে প্লেনে উঠেছিল? সে ছদ্মবেশী বহুরূপী।"

"আপনি চিনেছেন?"

"চিনতেই যদি পারব, তা হলে তাকে বহুরূপী বলব কেন?"

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কোথায় যাবেন?"

"যাব যেখানে, সেখানে সোজা পথে যাব না।"

"মানে?'

"মানে, একটু ঘুরে যাব।"

"তাই ঘুরুন না, কিন্তু দয়া করে বলুন, কিসে চাপবেন?"

"হাতিতে।"

হ্যাঁ, হাতিতেই চেপেছি আমরা। মেকং নদীর দক্ষিণ তীরে যে বিশাল জঙ্গল, হাতি চলেছে সেই পথে। মাহুতকে বোসবাবুই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোথায় যেতে হবে। গদাইলশকরী চালে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হাতি মহাশয় চলেছে সেই দিকেই। একই হাওদায় পিঠে পিঠ দিয়ে বসে আছি তিনজনে। খুশিতে বোসবাবুর প্রাণ এখন গড়ের মাঠ। তিনি বলছেন, "জানেন মৃগাঙ্কবাবু, এই জঙ্গলে অনেক ভাল-ভাল খাবার পাওয়া যায়।"

"খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে?" দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম। হাতি চললে যে এত দোলে, তা জানলে হাতির পিঠে আমাকে কেউ তুলতে পারত না। বমি না করে ফেলি!

"খিদে ? পেলেও সে খাবার আপনি-আমি খেতে পারব না।"

"আমি না পারলেও আপনার অখাদ্য কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! তা যা বলেছেন। হাজার হলেও এইসব অঞ্চলেই আমার মা বড় হয়েছেন। শূকর আর হরিণ তবুও গিলতে পারি ; পাইথন পেটে ঢোকে না।"

"পাইথন ?"

"এখানকার লোকের বড় প্রিয় খাদ্য, দেদার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। ওই এসে গেছে হাতিদের গ্রাম।"

"হাতিদের গ্রাম ?" দূর থেকে খানকয়েক পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। "হাতিদের তৈরি ঘর নাকি ?"

"দূর মশাই ! হাতি কি ঘর বানায় ? হাতি যারা ধরে, কাঠ বইতে ট্রেনিং দেয়, তারপর চড়া দামে বেচে দেয়, এ-ঘর তাদের তৈরি।"

"ও ! নাম কী গ্রামটার ?"

"ফাফো।"

"খাসা নাম। চলুন, হাতি-ধরিয়েদের মুখেই হাতি ধরার গল্প শোনা যাক। পিঠের শিরদাঁড়াটাকে একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

"আজ্ঞে না। দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ওরা এখন জঙ্গলে। বাচ্চা হাতি ধরে এনে যখন বড় করবে, তখন আসবেন'খন। এই...এই..." বলেই মাহুতকে গড়গড় করে লাও ভাষায় কীসব বলে গেলেন বোসবাবু। হাতি অমনি বাঁয়ে ঘুরে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে মড়মড় করে ডালপালা ভেঙে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল এক টুকরো খোলা জমির সামনে।

হাওদায় বসে আমরা দেখলাম, রোদ এসে পড়েছে মাটির ওপর। সেখানে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে বিশালকায় এক পাথরের বুদ্ধ। মূর্তির বুকে, হাতে, পায়ে, কপালে এবং চারপাশে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ।

সবই কিন্তু পাথরের সাপ !

"নামুন ! নামুন ! নেমে পড়ুন !"

চমকে উঠেছিলাম বোসবাবুর চিৎকারে। মাহুতও হাতিকে বসাচ্ছে মাথায় ডাঙস মেরে। তাল সামলাতে না পেরে আর একটু হলে ঠিকরে যাচ্ছিলাম।

শক্ত হাতে ইন্দ্রনাথ চেপে ধরল আমাকে পেছন থেকে। হাতি ততক্ষণে নাগরদোলা দুলুনি বন্ধ করে বসে পড়েছে।

সড়াত করে হড়কে নেমে গিয়ে পাথরের সাপেদের দিকে দৌড়তে দৌড়তে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন বোসবাবু, "আছে...আছে...এখানেই আছে...আমার মন বলছে এখানেই আছে !"

আমাকে ধরে হাতির গড়ানে পিঠ থেকে নেমে এসে ইন্দ্রনাথ বললে, "কোথায় আছে ?"

এই প্রথম শুনলাম জলদগম্ভীর গলায় কথা বলছে ইন্দ্রনাথ। ভোজবাজির মতো

শুধু ওর কণ্ঠস্বরই পালটায়নি, পালটেছে চোখ-মুখের চেহারাও। চোখে যেন হিরে জ্বলছে, চোয়াল হয়েছে শক্ত।

নিস্তব্ধ জঙ্গল গমগমে গলার আওয়াজের অদ্ভুত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন বোসবাবু। আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই চোখ আশ্চর্য প্রদীপ্ত। সুস্থ লোকের চোখে এমন চাহনি তো দেখা যায় না।

উনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন ইয়া মোটা একটা সাপের পিঠে পা তুলে দিয়ে। সাপের পিঠে পা ঠুকতে-ঠুকতে বললেন দাঁত কিড়মিড় করে, "এর তলায়...এদের তলায়...মাটি খুঁড়লেই..."

অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। নড়ে উঠল পাথরের সাপ।

তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রনাথ, "পাইথন ! পালান, বোসবাবু !"

পাইথনই বটে। ময়লা পাথরের পাইথনদের সঙ্গে গা মিলিয়ে অসাড়ে পড়ে ছিল একটা জ্যান্ত পাইথন। বোসবাবুর পায়ের আঘাতে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

পর-পর তিনবার গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা গেল পরমুহূর্তেই। করাল ময়ালের মাথা উড়ে গেল তিন-তিনটে বুলেটে।

আচ্ছন্নের মতো শুধু দেখলাম, ধূমায়িত রিভলভার হাতে হরিণের বেগে বোসবাবুর দিকে ছুটে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

গুলতির দানো

তরতরিয়ে নৌকো ছুটছে তীরের দিকে। মেকং নদী এখানে আরও চওড়া। এপার থেকে ওপার ঠাহর করা যায় না। তাই ওপার থেকে নৌকোয় চেপে বুঝতে পারিনি এপারের রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়েছি অক্ষত দেহে। গুলিবর্ষণের পরেও মৃত পাইথনের পাকসাটের মধ্যে নির্ঘাত মারা যেতেন বোসবাবু। মরা সাপ যে এত আছাড় খায়, কুণ্ডলি পাকায়, তা না-দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। ধুলো উড়ছে, ঘাস টুকরো-টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, লেজের ঝাপটায় ঠিকরে পড়েছেন বোসবাবু। পাথরের বুদ্ধ তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল বলেই রক্ষে। ঝপ করে জ্ঞানহীন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এঁকেবেঁকে পালিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ।

তারপর হাতির পিঠে চেপে এলাম নদীর ধারে। ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন বোসবাবু। বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন, "শয়তানে টেনেছিল...ওঃ ! পাথরের সাপও জ্যান্ত হয়ে গেল ?"

ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল ইন্দ্রনাথ, "আপনার ছোঁয়া পেয়েই জ্যান্ত হয়ে গেল। পান্না-বুদ্ধদের পাহারাদার তো !"

"কচু পাহারাদার ! পান্না-বুদ্ধ ওখানে নেই।"

"তখন যে বললেন, ওখানেই আছে !"

"ভুল, ভুল, শয়তানে ভুল করিয়েছে। পেছনে ভূত লেগেছে মশাই।"

"তা হলে, এবার দেশে ফেরা যাক ?"

"পাগল !"

"মানে ?"

"ওয়াট ফু, ওয়াট ফু, নদী পেরোলেই ওয়াট ফু।"

"হুঁ ! সেখানে কী ?"

চোখ কপালে তুলে বললেন, বোসবাবু, "সে কী মশাই ? ওয়াট ফু সম্বন্ধে এত গাওনা গাইলাম, সব ভুলে গেলেন ?"

বিচিত্র হেসে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার গাওনা কিনা—মনে রাখা কঠিন। ফুঁ যাবেন ?"

"ফুঁ নয়, ফুঁ নয়, ফু, মানে মঠ। ওয়াট ফু লাওসের সবচেয়ে নামী মঠ। রাজার তৈরি বৌদ্ধ মঠ, দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে মশাই।"

"তাই নাকি ? কোন রাজার তৈরি ?"

"খমির রাজা, খমির রাজা, এখান থেকে ১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজত্ব ছিল যাঁদের।"

"১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে !" ভুরু কুঁচকোয় ইন্দ্রনাথ, "সেখানে তো আঙ্কোর রাজ্য।"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ ! ঠিক জানেন, কিন্তু জানেন না মৃগাঙ্কবাবু। বলেছিলাম না, ওইখান থেকেই যত গণ্ডগোল ? কী কুক্ষণে বলে ফেলেছিলাম, ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধ ব্যাঙ্ককে নেই, আছে ওয়াট ফু-তে। সেই থেকে লাইফটাকে হেল করে ছাড়ল ব্যাটা শেরপা থুঙ।"

"তা হলে তো সেখানে যেতেই হয়।"

ওয়াট ফু মঠের ভগ্নদশা দেখলাম নদীর বুক থেকে। রাজাদের নজর ছিল বটে। এলাহি কাণ্ড করে ছেড়েছেন পাথর দিয়ে। আঙ্কোরভাটের মন্দির এখন জগদ্বিখ্যাত। সেই দেশের রাজারাই নাকি রাশিরাশি পাথর এনে নদীর ধার থেকে গড়ে তুলেছিলেন প্রকাণ্ড এই মঠ। বৌদ্ধ মঠ। আঙ্কোরভাটের হিন্দু মন্দিরের বিশালত্বকে ম্লান করার জন্য কী ?

ভেঙে-ভেঙে পড়ছে অতীতের বিস্ময়, কিন্তু আজও তা বিপুল বিস্ময় হয়ে জেগে রয়েছে চোখের সামনে। সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে জলের কিনারা থেকে। দু' পাশে সারবন্দী অজস্র রঙিন ফুলের গাছ। সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল মন্দিরের পাদদেশে। মাঝে পড়ছে পটমণ্ডপ। তাদের গঠন এত সুন্দর যে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। নদীর বুক থেকে বিরাট এই সৃষ্টি দেখে স্তম্ভিত হয়ে শুধু ভেবেছি, এত মেহনত করেও তো শেষরক্ষা করা গেল না। মহাকাল কুটিল হাসি হেসে ভেঙেচুরে একশা করে দিচ্ছে প্রতিটি পাথরকে।

আচমকা আমার দিবাস্বপ্ন খানখান হয়ে গেল বোসবাবুর ভাঙা কাঁসি বাজনার

মতো খ্যানখেনে চিৎকারে। কানের কাছে বিশ্রী বিকটভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন তিনি, "না, না, না !"

গোটা ওয়াট ফু তখন যেন দুলছে। আসলে দুলছে আমাদের নৌকো। আমি আধবোজা চোখে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম সেই অপরূপ শোভার দিকে। এমন সময়ে কানের পরদা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল বিতিকিচ্ছিরি চিৎকারে।

"না ! না ! না !"

এতক্ষণে এবং এতদিনে কড়া ধমক শুনলাম ইন্দ্রনাথের গলায়, "না মানে ?"

"ওখানে না ! ওখানে না ! ওখানে না !"

"ওয়াট ফু যাবেন না ?"

"না !"

"কেন যাবেন না ?"

"শেরপা থুঙ ! শেরপা থুঙ !"

"বাজে বকছেন কিন্তু !"

"অন্ধ নাকি আপনি ? দেখতে পাচ্ছেন না ? ওই দেখুন...ওই, ওই, শেরপা থুঙ !"

সবিস্ময়ে আমি এবং আমার বন্ধুটি দু'জনেই চেয়ে ছিলাম বোসবাবুর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে। তর্জনী তুলে সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটিকে দেখাচ্ছিলেন। সাদা পাথরের বুকে লম্বমান কালো মূর্তিটাকে প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। বিশাল মঠের বিশালতায় তন্ময় হয়ে গেছিলাম বলে। এখন তাকে দেখতে পেলাম। অস্পষ্টভাবে হলেও বেশ বুঝলাম, সাদা সোপানে কালো আলখাল্লা মুড়ে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে মানুষ। তার মাথাতেও কালো টুপি, নেপালিদের মাথায় দেখা যায় এমনিই টুপি। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। চোখে কালো চশমা। গায়ের রং ময়লা বলেই মনে হল।

সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। সাতশো ফুট লম্বা সাদা সোপানে আর কোনও প্রাণী নেই, শুধু সে। নড়ছে না একটুও, হাওয়ায় উড়ে-উড়ে যাচ্ছে কালো আলখাল্লার কোণগুলো।

হঠাৎ সে হাত দুটো টেনে আনল আলখাল্লার তলা থেকে। ডান হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতটা ভাঁজ করে টেনে আনল পেছন দিকে।

খুব মৃদু একটা আওয়াজ শুনলাম, ফট্ !

সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম, গুলতি ছুঁড়ল কালো মূর্তি। নদীর বুকের ওপর দিয়ে আমাদের নৌকোর দিকে ধেয়ে আসতে-আসতে গুলতি-নিক্ষিপ্ত বস্তুটা আচমকা ফুলে-ফেঁপে উঠে ভাসতে লাগল শূন্যে। হাওয়ার ধাক্কায় উড়ে এল আমাদের দিকেই। একটা বিকটাকার দানো-মুখ !

"আঁ...আঁ...আঁ !" অজ্ঞান হয়ে গেলেন বোসবাবু।

বিরক্তমুখে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এক গুলিতেই ভাসমান দানো-মুখকে ফুটিফাটা করে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "হাইড্রোজেন-ভর্তি বেলুন।

বোসবাবুও দেখেছিলেন তাদের। দেখার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একদম স্থির হয়ে গেলেন। চকচক করে উঠল দুই চোখ। বললেন নিজের মনেই, "ঠিক দিকেই যাচ্ছি। ওরাও দেখতে পেয়েছে।"

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "আপনি তো জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই খালি বলছেন, আরও আগে...আরও আগে। খোনেফাফেঙ জলপ্রপাতের কাছে।"

"এসে গেছে খোনেফাফেঙ। ডান দিকে দেখুন না মশাই, অন্ধ নাকি!"

হাওয়া উলটো দিকে বইছিল বলে এতক্ষণ জলের গজরানি কানে ভেসে আসেনি। বোসবাবুর নাচানাচি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে সেদিকে খেয়ালও করিনি। এখন দেখলাম।

ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না সেই দৃশ্যকে। ডান দিকে বেশ খানিকটা দূরে উঁচু-উঁচু পাথর আর পাহাড়ের মাথা টপকে টানা লম্বা লাফ মেরে ছিটকে আসছে সাত-সাতটা জলের ধারা। জলপ্রপাত অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম জলপ্রপাত তো কখনও দেখিনি। সপ্তপ্রপাতের এ-হেন মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে তো বিশ্বাস

কিন্তু শেরপা থুঙ গেল কোথায়?"

তাকে আর দেখা গেল না সিঁড়ির ওপরে।

চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায়

বোসবাবু জ্ঞান ফেরে পেয়েছেন বটে, কিন্তু আর তো তাঁকে রোখা যাচ্ছে না। পাগলের মতো ছটফট করছেন, চোখ গুলি-গুলি করে দশ দিকে তাকাচ্ছেন। যেন শেরপা থুঙ ভূত-প্রেতদের পাঠিয়ে দেবেন যে-কোনও দিক থেকে।

আরও দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা এই নৌকোয় চেপে। মোটরবোট বলেই এত তাড়াতাড়ি আসা গেল। তাও রাশিয়ার উপহার। জল তোলপাড় করে ছুটছে জলকন্যার মতো। বোসবাবুর উদ্বেগ আর আতঙ্ক যেন মোটরবোটকেও পেয়ে বসেছে।

মেকং নদী এখানে পাঁচ মাইল চওড়া। আশেপাশে অগুনতি পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জলের ভেতর থেকে। এ দেশে আসবার আগে লাওস সম্বন্ধে একটা বই পড়ে নিয়েছিলাম। তাতে পড়েছিলাম একটা কবিতা—'চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরি হায় রে...।'

এই সেই চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধা। জলে ডোবা পাথরগুলোর দৌরাত্ম্যে স্রোত দুর্বার হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর বেগে এঁকেবেঁকে অজস্র চোরাঘূর্ণি ছুটে চলেছে খ্যাপা ঘোড়ার মতো। মোটরবোট বলেই রক্ষে, নইলে স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে হত কোনকালে।

কাম্পুচিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। নদীর পাড়ে একটা কংক্রিটের মঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট সেখানে দাঁড়িয়ে দূরবিন চোখে কী যেন দেখছে।

করতে পারতাম না।

জলের টান সেদিকে বিপজ্জনক। পাক খেতে-খেতে ফুলে-ফুঁসে লক্ষ ফণা নাচিয়ে ধেয়ে চলেছে। ফেনা আর জলবাষ্পের মেঘে এর বেশি আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবছা কুহেলির আড়ালে মনে হচ্ছে যেন আরও বিস্ময়,আরও চমক লুকিয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে।

আপন মনে বলে চলেছেন বোসবাবু, "এইবার...এইবার দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।"

"কাদের দেখতে পাচ্ছেন, বোসবাবু?" কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

"দূরবিন দিয়েও ওরা যা দেখতে পাচ্ছে না, আমি তা দেখতে পাচ্ছি আমার মনের চোখ দিয়ে, ...মানিখোট! মানিখোট!"

"মানিখোট! কী বস্তু?"

"একটা গাছ।"

"গাছ?"

"ম্যাজিক-গাছ। দেখতে আহামরি কিছু নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, প্যাঁকাটির মতো হাড় বের করা। পাতার বালাই নেই বললেই চলে। ওই তো, ওই তো ঝুলছে ফল, একটাই ফল।"

"ফল!"

"ম্যাজিক-মানিখোটের ফল। যে ফল খেলে বাঁদরও মানুষ হয়ে যায়। মানুষ খেলে কী হবে? হাঃ হাঃ হাঃ! ওই ফল এবার খাব আমি।"

"খাবেন...খাবেন...। কিন্তু পান্না-বুদ্ধরা..."

"আছে, আছে। ম্যাজিক-মানিখোটের গোড়ায় একটা গর্ত, তার মধ্যে শোয়ানো রয়েছে রাশিরাশি পান্না-বুদ্ধ। দেখেছি, এবার দেখেছি তোমাদের। শেরপা থুণ্ডকে এবার দেখিয়েছি কলা। জয়বাবা পান্না-বুদ্ধ!"

"মৃগাঙ্ক, ধর, ওঁকে..."

কাকে ধরব? ইন্দ্রনাথের চিৎকার শুনে আমি খানিকটা হাওয়া খামচে ধরেছিলাম। বোসবাবু বানরের মতো বিরাট লম্ফ দিয়ে মোটরবোটের রেলিং টপকে গিয়ে পড়লেন পাকসাট খাওয়া জলের মধ্যে। দেখতে দেখতে ফেনা আর জলকণা-বাষ্পের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

পান্না-বুদ্ধর রহস্য

লোকটাকে যে এত ভালবেসে ফেলেছিলাম, তা যদি আগে বুঝতাম, তা হলে এত দুর্ব্যবহার করতাম না। অনেক মুখঝামটা দিয়েছি, অনেক কড়া কথা বলেছি, কে জানত মরীচিকার পেছনে ছুটে এইভাবে তিনি প্রাণটা খোয়াবেন?

বোসবাবুর প্রাণহীন দেহটাও পাওয়া যাচ্ছে না। কোন্ চোরাপাহাড়ের খাঁজে আটকে রয়েছে, অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এখনও পান্না-বুদ্ধদের স্বপ্ন দেখে চলেছে...।

খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম এবং দেশে ফেরার জন্য বায়নাও ধরেছিলাম। কিন্তু

বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। ওর নাকি এখনও কী কাজ বাকি আছে।

শেষকালে রেগেমেগে বলেছিলাম, "কিসের কাজ ? কার কাজ ? যিনি তোকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি তো সরে পড়লেন।"

"তুই কি বোসবাবুর কথা বলছিস ?"

"তবে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার কথা বলছি ?"

"খুব রেগেছিস দেখছি। এখনও বুঝলি না কেন এসেছি এদেশে ?"

"এসেছিস তো পান্না-বুদ্ধদের উদ্ধারে।"

"উদ্ধারও করেছি।"

"অ্যাঁ !"

"অত লাফাসনি মৃগ, বারান্দার রেলিং নিচু, তিরিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়লে..."

"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! পান্না-বুদ্ধদের ছায়াও দেখিনি আমি !"

"আমিও দেখিনি।"

"তবে যে বললি..."

"উদ্ধার করেছি তাঁদের। লুকনো জায়গা থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা !"

"ইন্দ্র ! আমার মাথা ঘুরছে, আর হেঁয়ালি সইতে পারছি না।"

"বন্ধু মৃগাঙ্ক, তুমি এখন রয়েছ কোথায় ?"

"হোটেলে।"

"হোটেলটা কোন শহরে ?"

"ভিয়েনতিয়ানে শহরে।"

"কিলোমিটার সিক্স এখান থেকে কি বেশি দূরে ?"

"কিলোমিটার সিক্স !"

"ছোটখাটো ক্যালিফোর্নিয়া শহর রে, আমেরিকানদের তৈরি। এখন ফেলে পালিয়েছে। এই তো সেদিন দেখে এলি।"

"তা দেখেছি। কিন্তু কিলোমিটার সিক্সে যাবি কেন ?"

"পান্না-বুদ্ধরা সেখানে এসে উঠেছেন বলে।"

"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! আবার আমার মাথা ঘুরছে !"

"খবরদার ! অজ্ঞান হয়ে যাসনি। পান্না-বুদ্ধদের দেখতে হবে না ? ওই যে এসে গেছে গাড়ি।"

রেলিং-এ কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। তিন তলার বারান্দা থেকে দেখলাম, হোটেলের ফটক পেরিয়ে কাঁকর বিছানো পথ মাড়িয়ে একটা ভীষণ দামি বিদেশী গাড়ি ঢুকল এবং ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল পোর্টিকোয় ঢুকে। দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দও শুনলাম। কিন্তু আরোহীকে দেখতে পেলাম না।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে রহস্যময় হাসি হেসে, "হে বন্ধু, এইবার দেখতে পাবে এই অ্যাডভেঞ্চারের সব থেকে রোমাঞ্চকর নায়ককে।" বলেই কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল লাউঞ্জে।

এখন যেসব ঘরকে কেতাদুরস্ত ভাষায় বলা হয় লাউঞ্জ, আগে তার নাম ছিল 'পারলার', ইংরেজি ভাষায়। আমরা বাঙালিরা সোজাসুজি যাকে বলি বৈঠকখানা, আসলে তাই। আমাদের এই লাউঞ্জখানা এমনই ঝকমকে কায়দায় সাজানো যে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ ভাবতেও পারবে না, এই হোটেলেই বোমা পড়েছিল মাত্র আট বছর আগে।

কাচের দরজার এপারে দাঁড়িয়ে আমি উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রয়েছি পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ওপারে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ইন্দ্রনাথ। পুরু কার্পেট মাড়িয়ে কোঁচা দুলিয়ে ওদিককার দরজার সামনে যেই পৌঁছেছে, অমনি দরজা গেল খুলে।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকল একজন বেঁটে পুরুষ। তার পরনে কালো আলখাল্লা। মাথায় নেপালি টুপি। চোখে কালো চশমা।

শেরপা থুঙ ! এই মূর্তিকেই তো দেখেছিলাম ওয়াট ফু বৌদ্ধমঠের পাথরের সিঁড়িতে। বাচ্চাছেলের মতো গুলতি ছুঁড়ে ফানুস-দানো ছুঁড়ে দিয়ে পিলে চমকে দিয়েছিল বোসবাবু বেচারির !

শেরপা থুঙ ! এরই ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছেন বোসবাবু। হিল্লি-দিল্লি পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অপঘাতে মারা গেলেন শেষকালে।

শেরপা থুঙ ! পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ ! কিন্তু ইন্দ্রনাথ ওর সঙ্গে অত হেসে-হেসে করমর্দন করছে কেন ? আবার হাত তুলে দেখাচ্ছে আমাকে !

মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল বলেই কাচের পাল্লা ঠেলে ঢুকতে পারিনি। তবে আমার টলায়মান অবস্থা দেখেই ছুটে এল ইন্দ্রনাথ। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে শুধু বললে স্নেহাক্ত গলায়, "বোকা।"

হাত বাড়িয়ে শেরপা থুঙ আমার মুঠো খামচে ধরে বললে খাঁটি ইংরেজিতে, "এতটা চমকে দিতে চাইনি, মিঃ রয়। দায়ী আপনার এই বন্ধু। উনিই বললেন একটা নাটক করা যাক। থ্রিলার-লেখক বন্ধুটাকে থ্রিল দিতে হবে শেষকালে। ভেরি সরি, ভেরি সরি..."

"বা-বা-বাট, হু আর ইউ ?" নাটকের ক্লাইম্যাক্সে এতটা কুপোকাত হব, ভাবতেই পারিনি।

"আই অ্যাম শেরপা থুঙ।"

"শেরপা থুঙ ! ভিলেন শেরপা থুঙ !"

এইবার অট্টহাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। ওর সেই বিখ্যাত অট্টহাসি। দু'হাতে আমাকে আর শেরপা থুঙকে জড়িয়ে ধরে লম্বা ডিভানে বসতে-বসতে বললে, "তোর পিলে চমকে দেওয়ার জন্য আমিও ক্ষমা চাইছি। হ্যাঁ, ইনিই শেরপা থুঙ। এল.পি.আর.পি. মহলে ইনি এই নামেই বিখ্যাত। তবে ভিলেন হিসেবে নন, হিরো হিসেবে।"

মুচকি হেসে বললে শেরপা থুঙ, "রং চড়াবেন না, মিঃ রুদ্র।"

"রঙের তাস আপনি, জ্যান্ত টেক্কা। মৃগাঙ্ক, ওরকম বোকার মতন তাকালে তোকে বিচ্ছিরি লাগে।"

ঢোক গিলে বললাম, "এল.পি.আর.পি. মানে ?"

"লাও পিপলস্ রিভোলিউশনারি পার্টি।"

"অ !"

"মৃগ, আদি কথা এবার খোলসা করা যাক। বোসবাবু যা কিছু বলেছেন, সবই ঠিক। কিছু-কিছু বেঠিক কথা আছে, যা তিনি মনে-মনে কল্পনা করে নিয়েছেন এবং সত্যি বলেই ধরে নিয়েছেন। হ্যাঁ, ওঁর মামার বাড়ি ছিল শ্যামদেশে। ওঁর মা সত্যিকারের রাজকুমারী। দাদামশাই দেদার পান্না-বুদ্ধ সংগ্রহ করেছিলেন এবং সব ক'টাই লুকিয়ে রেখেছিলাম শ্যামদেশের বাইরে, এই লাওসে। কোথায়-কোথায় লুকনো আছে, তাও বোসবাবুর মা জানতেন এবং ঠিকানাগুলো বলে গিয়েছিলেন বোসবাবুর বাবাকে। বাবার মুখে সব শুনেছিলাম বোসবাবু। কিন্তু শেলশক্ খেয়ে সব ভুলে গিয়েছিলেন, শুধু কলসির মাঠের কথা ছাড়া।"

"শেলশক্ ?"

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন ওঁর বাবা মারা যান। অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বোসবাবুকে। লোকে বলে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। কিন্তু দূরের জিনিস চোখে দেখার ক্ষমতাটাও অর্জন করেন মাথায় চোট পাওয়ার পর থেকে।"

"সে কী !"

"মৃগ, বোসবাবু একটা চলমান বিস্ময়। মামাবাড়ির পান্না-বুদ্ধদের ঠিকানা ভুলে মেরে দিলেও তাই নিয়ে মুখ ফসকে কথা বলে ফেলতেন। দার্জিলিং থাকার সময়ে যাঁর কাছে বলেছিলেন, তিনিই এই শেরপা থুঙ। দেশের কাজে গিয়েছিলেন সেখানে। বোসবাবুর রকমসকম দেখে ওঁর সন্দেহ হয়, ওঁকে নিয়ে লাওস ঘুরলে হয়তো পান্না-বুদ্ধদের খুঁজে পাওয়া যাবে। অত টাকার জিনিস পেলে দেশের সম্পদ বাড়বে, এই আশায় ওঁকে নিয়ে আসেন এখানে। কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকেই নিপাত্তা হয়ে যান বোসবাবু। সেই থেকেই উনি ওঁকে খুঁজছিলেন। কলকাতায় এসে আমাকে যেদিন ভার দিয়েছিলেন বোসবাবুকে খুঁজে বের করার, ঠিক সেইদিন বোসবাবু নিজেই এলেন আমার কাছে। একেই বলে কাকতালীয়, যা লাখে একবার ঘটে কি না সন্দেহ।"

দম বন্ধ করে শুনছিলাম। এবার বললাম, "সারা পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শেরপা থুঙ কলকাতায় তোর কাছে এলেন কেন ?"

"কারণ উনি খবর পেয়েছিলেন বোসবাবু এখন কলকাতায়। তাই ছুটে এসেছিলেন নিজেই। বোসবাবুর ফ্যাঙ্কেনস্টাইন সিনেমা মার্কা করোটি দেখলেই লোকে শনাক্ত করে ফেলতে পারবে এই আশায় কাগজে-টিভিতে-রেডিওতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারও দিতেন আমাকে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। বোসবাবু নিজেই হেঁটে ঢুকেছিলেন আমার ঘরে। উনি আসার ঠিক আগেই। তাই কথা বলতে বলতে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পালিয়েছিলেন বোসবাবু। ওঁর মনে শেরপা থুঙ-এর ছবিই ভেসে উঠেছিল।"

"বোসবাবু তা হলে বুজরুক নন ?"

"একেবারেই নন ! শুধু যা মাথার স্ক্রুগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। বোমাফাটার সাঙ্ঘাতিক আওয়াজে। তাই ওঁকে বারবার বোমা ফাটার আওয়াজ শোনানো হয়েছে, যাতে পালটা শক্ খেয়ে স্মৃতিশক্তি সব ফিরে আসে।"

"খুলে বল, ইন্দ্র, খুলে বল।"

"মৃগ, ওঁর মাকড়সা-ভীতি আছে ছেলেবেলা থেকেই। তাই ওঁকে মাকড়সার ভয় দেখিয়ে ধাতস্থ করতে চেয়েছিলেন শেরপা থুঙ, যদিও ওঁর এই ভয় দেখানো ট্রিটমেন্টের বিরোধী আমি। কিন্তু উনি মনে করেন, বিষে বিষক্ষয় নীতি মানসিক রোগেও কাজ দেয়।"

"আলবত দেয়," বলে উঠলেন শেরপা থুঙ।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই বলে বর্জিয়ার মতো ধেড়ে মাকড়সাকে ঘরে ঢুকিয়ে বোসবাবুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেওয়ার মানে হয় না।"

"ওরকম দামি মাকড়সাটাকে আপনিই বা গুলি করে উড়িয়ে দিলেন কী হিসেবে ?"

"কী আশ্চর্য ! যমদূতকে গুলি করব না তো কি রাবড়ি খাওয়াব ?"

"আরে মশাই, ওর ঠ্যাং-এ সুতো বাঁধা ছিল। যথাসময়ে টেনে বের করে নিতাম। কিন্তু এমন গুলি করলেন..."

"লাশটা টেনে নিয়ে গেছেন ?"

"অগত্যা," ঘাড় নাচিয়ে বললেন শেরপা থুঙ।

শুনছিলাম আর মনের মধ্যে লিস্ট তৈরি করছিলাম পরের পর ঘটে যাওয়া রহস্যগুলোর। দুই মক্কেল নিস্তব্ধ হতেই ছুঁড়ে দিলাম প্রশ্নগুলো। ফটাফট জবাব দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

আমি : মাছের পুকুরে বোমা ফাটল কি আপনা হতেই ?

ইন্দ্রনাথ : না। ইলেকট্রিক ডিটোনেটর দিয়ে ফাটানো হয়েছিল দূর থেকে। শেরপা থুঙ ছায়ার মতো ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ওঁর লোকজন কলকাঠি নেড়ে গেছে আগে থেকেই।

আমি : সোনা-চড়ায় জালার মধ্যে অত মাকড়সা এল কীভাবে ?

ইন্দ্রনাথ : রেখে দেওয়া হয়েছিল আগে থেকেই। বোসবাবু মনের মধ্যে ঠিক ছবিই দেখেছিলেন, বিশেষ ওই জালার মধ্যে লুকনো ছিল সাতটা পান্না-বুদ্ধ। চড়ায় আমরা পৌঁছনোর আগেই তন্নতন্ন করে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল জালাটা। সোনা খুঁজছিল যে ছেলে আর মেয়েটি, ওরা শেরপা থুঙ-এর চর।

আমি : বটে ! বটে ! কিন্তু কলসির মাঠে দো-বোমা ফাটল কেন ?

ইন্দ্রনাথ : মাঠ জুড়ে তখন তল্লাসি চলছে প্রতিটি কলসির মধ্যে। বোসবাবু যাতে বাগড়া দিতে না পারেন, তাই ভয় দেখানো হয়েছিল দো-বোমা ফাটিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি মনের টানে ফের গেলেন রাতে। তখন হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি বেলুন ওড়ানো হয়েছে শূন্যে। তাতে ফসফরাস রং দিয়ে আঁকা দিল

দানো-মূর্তি। নীচ থেকে আলো ফেলায় তা অত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। বিকট হাসি হেসেছেন শেরপা থুঙ নিজে।

আমি : বিটকেল বুদ্ধির আধার উনি। ওয়াট ফু মঠে গুলতি ছুঁড়ে দানো ভাসানোর প্রয়োজন ছিল কি ?

ইন্দ্রনাথ : ওখানে বোসবাবুর নামবার আর দরকার ছিল না। ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মঠের পাতালঘরে। তাই গুলতি করে হাইড্রোজেন ক্যাপসুল ছুঁড়েছিলেন উনি। বেলুন ফুলে উঠতেই...

আমি : তুই বিরক্ত হয়ে গুলি করেছিলি। ওইভাবে বোসবাবুকে অজ্ঞান করাটা ঠিক হয়নি। ম্যাজিক-গাছের তলায় নাকি পান্না-বুদ্ধ আছে, বোসবাবুর এই কথাও কি সত্যি ?

ইন্দ্রনাথ : নির্জলা সত্যি। বিষে বিষক্ষয় ঘটেছিল নিশ্চয়। আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ওঁর মনের ছবি ! ম্যাজিক-গাছের ফল সম্পর্কে গল্পটা লাওসের কিংবদন্তি। ইচ্ছে করলেও কেউ ও দ্বীপে যেতে পারে না। তাই বোসবাবুর দাদামশাই বারোটা পান্না-বুদ্ধ পুঁতে রেখেছিলেন গাছের গোড়ায়।

আমি : মাই গড ! সাপের বিছানায় শোয়া বুদ্ধর তলাতেও কি পাওয়া গেছে পান্না-বুদ্ধ ?

ইন্দ্রনাথ : নিশ্চয় ! মোট কুড়িটা।

আমি : পাইথনের মাথা উড়ে গেল কার বুলেটে ? তোর, না, শেরপা থুঙের ?

ইন্দ্রনাথ : তিনটের দুটো বুলেট আমার, একটা শেরপা থুঙের।

আমি : কোথায় আছেন তাঁরা ?

ইন্দ্রনাথ : পান্না-বুদ্ধরা তো ? সেখানে তোকে নিয়ে যেতেই এসেছেন শেরপা থুঙ। চলুন...

উঠে দাঁড়ালেন শেরপা থুঙ, "হ্যাঁ চলুন।"

শেরপা থুঙ-এর শেষ কৌশল

ক্যালিফোর্নিয়া শহর জীবনে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, কিলোমিটার সিক্স শহর দেখে মাথা ঘুরে গেল। এশিয়ার বুকে আমেরিকান ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানকার পথেঘাটে, মাঠে-বাড়িতে। তাক লেগে যায়।

সব ফেলে রেখেই দেশে ফিরেছে আমেরিকানরা। এখন তাকে কাজে লাগিয়েছে এল.পি.আর.পি.। সদর ঘাঁটি সেখানেই, সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন পথের মোড়ে-মোড়ে, বাড়িতে-বাড়িতে।

পরিত্যক্ত একটা হাই স্কুল জিমনাশিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল আমাদের ঝলমলে গাড়ি।

শেরপা থুঙের খাতির দেখলাম বটে সেখানে। গাড়িতে বসেই কালো আলখাল্লা আর মাথার টুপি খুলে ফেলেছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে এলেন খাঁটি বিলিতি

পোশাকে।

তারপর শেষ ম্যাজিক দেখালেন রহস্যময় এই ভদ্রলোক।

কত গলিখুঁজি পেরিয়ে যে যেখানে পৌঁছেছিলাম, তা বলা সম্ভব নয়। ঘুরতে-ঘুরতে যখন আমার মাথা ঘুরছে, তখন আমরা থমকে দাঁড়ালাম একটা সোনালি দরজার সামনে।

বিশাল পাল্লা। দু'মানুষ সমান উঁচু। দু'পাশে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রক্ষী।

পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় লাগালেন শেরপা থুঙ। মোচড় মেরে পাল্লায় আলতো চাপ দিতে ফাঁক হয়ে গেল এক ইঞ্চির মতো।

ফাঁক দিয়ে ঠিকরে এল নীলাভ আলোর ছটা। অপূর্ব সেই নীলদ্যুতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। চোখ ধাঁধায় না, চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু এ-শুধু বৈদ্যুতিক দ্যুতি নয়...এর সঙ্গে মিশে রয়েছে পান্নার আভা। মুহ্যমানের মতো চেয়েছিলাম এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসা আলোর ঢেউ-এর দিকে। পেছন থেকে আলতো ঠেলা মেরে মৃদু কোমল স্বরে বললেন শেরপা থুঙ, "ভেতরে যান।"

যেন স্বপ্নের ঘোরে ঢুকলাম নীলাভ দ্যুতির মধ্যে দিয়ে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। আমি দেখলাম তাঁদের।

বড় ঘর। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে নীলাভ ঝাড়বাতি। ঘরের তিন দিকে গ্যালারি। তিনটে তাক। প্রতিটি তাকে সারিসারি পান্না-বুদ্ধ। রকমারি তাঁদের সাইজ। হরেকরকম তাঁদের ভঙ্গি। কিন্তু প্রতিটিই অনন্য, অপূর্ব, শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন।

আমি বিহ্বল চোখে যখন দেখছি এঁদের, এই পান্না-বুদ্ধদের, এমন সময়ে কে যেন হাত রাখল আমার কাঁধে। বললে ফিসফিস করে, "আমি ভাল হয়ে গেছি মৃগাঙ্কবাবু।"

চেনা গলা। তাই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যের মতো ঘাড় কাত করে হা-হা হেসে বলেছিলেন তিনি, "আরে ! আরে ! চোখ কপালে তুলছেন কেন ? আমি ভূত নই, ভূত নই, জ্যান্ত বোসবাবু। মরিনি মেকং-এর জলে। শেরপা থুঙ-এর চরগুলো এত ওস্তাদ আগে যদি জানতাম। যাচ্চলে !"

তারপর আর কিছু মনে নেই !

ভাইকিংদের গুপ্তধন

ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার বেলেঘাটার বাড়িতে ইজিচেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে আর পাইপ খাচ্ছে মনের আনন্দে,এমন সময় কড়া নড়ে উঠল দরজার।

বাড়িতে চাকর-বাকরের বালাই নেই। একা থাকতেই ভালবাসে ইন্দ্রনাথ। গোয়েন্দাগিরিটা এখন সত্যি সত্যিই নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুচখাচ অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ভারত জোড়া সুনাম আর বিপুল অর্থ উপার্জন করার পর অত্যন্ত আনন্দের এই নেশাটিকে নেশার পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। সূক্ষ্ম জটিল কেস হলে গা ঝাড়া দেয়, মাথা খাটায়—নইলে ইজিচেয়ারে বসে পা নাচায়, পাইপ খায় আর বই পড়ে।

দরজার কড়া নড়ে উঠতেই ভাবল নিশ্চয় নতুন কোন আপদ এসেছে। চৌকাঠ থেকেই বিদেয় করা কর্তব্য। তাই পাইপটা দাঁতে কামড়েই উঠে গেল।

দরজা খুলতেই দেখল, তালঢ্যাঙা এক সাহেব দাঁড়িয়ে। লম্বা লিকলিকে চেহারা। কিন্তু পেটান লোহার মত পেশীর ওপর সবুজ দড়ির মত শিরা দেখা যাচ্ছে বাহুতে। পরনে খাকী হাফ সার্ট আর ব্লু জীনস-এর প্যান্ট। গালে চাপ দাড়ি।

কাকে চাই?—ইংরেজিতেই প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে—জবাব দেয় সাহেব খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে।

আমিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

তাই নাকি? গ্ল্যাড টু মীট ইউ।—বলে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে সাহেব।—কিন্তু ডিটেকটিভ এত হ্যান্ডসাম হয় জানতাম না তো।

এ রকম ধারণার কারণ?—চোখ নাচিয়ে বলে ইন্দ্রনাথ।

আমাদের শার্লক হোমসের চেহারাটা খুব সুরৎ ছিল না। কোনকালেই।

শার্লক হোমস ছিলেন ফিকশান-এর ডিটেকটিভ, আমি প্র্যাকটিক্যাল ডিটেকটিভ। তাই বোধহয় ভগবান আমাকে একটু সুন্দরভাবেই গড়েছেন। বিশ্বাস

করুন, আগে জানলে ভগবানকে বলতাম শার্লক হোমসের মতই কদাকার করে যেন গড়েন আমাকে। ডিটেকটিভ প্রফেশনটাই শ্রীহীন—শ্রীহীন মানুষদেরই মানায় সেখানে, কি বলেন ?

অট্টহাসি হাসল সাহেব। ইন্দ্রনাথের হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, আফ্রিকার লেক চাড অঞ্চলে বিরাট এক গুপ্তধনের সন্ধানে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।

শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। ছাপোষা বাঙালির বাড়ি বয়ে এসেছে এক খাঁটি সাহেব আফ্রিকায় গুপ্তধনের গোয়েন্দাগিরির অফার নিয়ে।

নাঃ, এ মক্কেলকে চৌকাঠ থেকে বিদায় করা যায় না। ইন্দ্রনাথ তাকে এসে বসাল ঘরে।

বলল, আপনার নাম।

হেনরিক ওবার জোহান।

নিবাস ?

লন্ডন।

সোজা লন্ডন থেকে আসছেন আমার কাছে ?

এক রকম তাই বলতে পারেন। আমার এক ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড কলকাতা থেকে লন্ডনে গিয়ে ক্লাবে আপনার খুব প্রশংসা করছিল। আপনি নাকি বিপদকে ভালবাসেন, যেকোন অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন।

বাড়িয়ে বলেছে। যেকোন অ্যাডভেঞ্চারে আমি নাক গলাই না। অ্যাডভেঞ্চারের মত অ্যাডভেঞ্চার না হলে—

ভাইকিংদের গুপ্তধনের সন্ধান করাটা কি বিরাট অ্যাডভেঞ্চার নয় ?

ভাইকিং !

ইয়েস মিঃ রুদ্র, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগেই যারা উত্তর আমেরিকায় পা দিয়েছিল, ইউরোপ আর এশিয়া তছনছ করেছিল, যাদের নামের মানে হল জলদস্যু সওদাগর—আমি সেই ভাইকিংদের কথাই বলছি।

ইন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম চোখে ভাল করে দেখল হেনরিক ওবারজোহানকে। পাগল বলে তো মনে হচ্ছে না। চাহনি বেশ তীব্র। বুদ্ধি উজ্জ্বল চোখ, চোখা নাক আর শক্ত চিবুক-চোয়ালে কঠোর মনোবলের ছাপ। রোদে পোড়া চামড়ায় যেন দুর্গম গিরি কান্তার মরু পেরিয়ে যাওয়ার ইতিহাস।

নীরবে পাইপে ফের তামাক ঠাসল ইন্দ্রনাথ। আগুন ধরাল। বেশ কয়েকটা সুখটান দিতেই হেনরিক ওবারজোহানও প্যান্টের হিপ পকেট থেকে পাইপ আর টোব্যাকো পাউচ বার করে ধূমপান আরম্ভ করে দিলে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে। কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই চোখে দেখে মনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নিচ্ছে কার ভেতরে কতটা সত্যি আর শক্তি আছে।

অবশেষে পাইপ নামিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—আমার পেশাটা ক্রাইম ডিটেকশন।

জানি। আমার এই অফারের মধ্যেও ক্রাইম ডিটেকশন আছে।

তার মানে ?

গুপ্তধনের নকশাটা নিয়ে যে রাস্কেলটা পালিয়েছে তাকে না ধরতে পারলে গুপ্তধন তো পাব না।

তার নাম ?

পল সুপারম্যান।

এ আবার কি নাম ?

সুপারম্যান তার উপাধি—পদবী নয়। ভাইকিংদের মত সে-ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মানুষ। অতিশয় দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর, লোভী—অবিকল পূর্ব পুরুষদের মতই। তাই ইংল্যান্ডের মানুষ তাকে সুপারম্যান উপাধি দিয়েছে।

দেখুন মিঃ ওবারজোহান, ঐসব সুপারম্যান-টুপারম্যানের কারবারে আমি নেই। ঘরকুনো বাঙালি আমি, বেশ আছি ঘরে। আফ্রিকায় বুনো হাতির পেছনে ছুটতে চাই না।

কি বললেন ?—মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অবাক হয়ে বললে হেনরিক ওবারজোহান, নিজে সুপার হিরো হয়ে বুনো হাতির পেছনে ছুটতে চান না ? সুপারম্যানকে নাস্তানাবুদ করতে চান না ?

আজ্ঞে না। তাছাড়া আমি সুপার হিরো নই। শুধু হিরোও নই—ধুতি পাঞ্জাবী পরা সামান্য বাঙালি। অত ধকল আমার পোষাবে না।

আমার সেই ইন্ডিয়ান বন্ধুটি কিন্তু বলেছে, আপনার কবি কবি ঐ চেহারার ভেতরে নাকি আকাশের বাজ লুকিয়ে থাকে, মনটা স্টীল দিয়ে তৈরি, আপনার—

আপনার বন্ধু—

ঝুঁকে বসল ওবারজোহান, আধাআধি শেয়ার হবে গুপ্তধনের। কাম উইথ মি।

দূর মশায়! গুপ্তধনের লোভ আমার নেই। আপনি ইংল্যান্ডের কোন ডিটেকটিভকে ধরুন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তো রয়েছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সে সুনাম আর নেই, মিঃ রুদ্র। তাছাড়া ইংল্যান্ডের কাউকে জানাতে চাই না আমি গুপ্তধনের সন্ধানে আফ্রিকা যেতে চাই।

আমি পারব না।

পারতে আপনাকে হবেই, মিঃ রুদ্র,—স্মিত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললে ওবারজোহান।

ইন্দ্রনাথের ভুরুজোড়া উঠে গেল ওপর দিকে, জোর করে নিয়ে যাবেন নাকি ?

আপনি নিজেই যাবেন—আমার সব কথা শোনবার পর।

ইন্দ্রনাথ কিছু বলল না, শুধু চেয়ে রইল।

ওবারজোহান লম্বা হাতটা বাড়িয়ে পাইপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললে, আমি ফিরে যাব বলে লন্ডন থেকে কলকাতা আসিনি। লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে আপনার সুনাম শুনেছি, এমন কি শুনলে অবাক হবেন—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোপন ফাইলে ইন্ডিয়ার নামী ডিটেকটিভদের নামের মধ্যে আপনার নামও আছে। আপনার চরিত্র থেকে আরম্ভ করে কীর্তিকলাপ পর্যন্ত, সব সেখানে লেখা আছে।

সত্যিই এবার হবাক হয় ইন্দ্রনাথ, বলেন কি ?

আপনার ফোটো আছে।

আশ্চর্য খবর দিলেন। মৃগাঙ্ক আর ওর স্ত্রী শুনলে—

আপনার কীর্তিকাহিনী যিনি লিখেছেন ? মৃগাঙ্ক রায় ?

তার নামও আছে নাকি ?

আছে। আপনি যে খেয়ালী, চিরকুমার, নির্লোভি এবং পরোপকারী—এ সবই লেখা আছে সিক্রেট ডোসিয়ারে।

স্ট্রেঞ্জ !

মিঃ রুদ্র, সবচেয়ে বড় গুণটা জানতে পেরেছিলাম বলেই এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে আমার সঙ্গে আপনি আফ্রিকার বুনো হাতির পেছনে যেতে দ্বিধা করবেন না।

আমার সবচেয়ে বড় গুণ ?

আপনি অত্যন্ত সেন্টিমেন্ট্যাল।

সেটা তো আমার সবচেয়ে বড় দোষ।

নট অ্যাট অল। ঐটাই আপনার সবচেয়ে বড় গুণ। ম্যাডনেস না থাকলে কৃতী পুরুষ হওয়া যায় না। এই ম্যাডনেস আসে সেন্টিমেন্ট থেকে। আমি একটা মূর্খ। সব জেনেও আপনার এই সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে ফেলেছি—গুপ্তধনের আধাআধি বখরা দেওয়ার লোভ দেখিয়েছি। আসলে আমি দেখছিলাম, সত্যিই আপনি নির্লোভি কিনা। যদি রাজী হয়ে যেতেন তক্ষুনি, আপনাকে অন্তত সঙ্গে নিতাম না। কারণ তো জানেনই—সিক্রেসি ইজ দ্য কী টু সাকসেস—গোপনতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। গুপ্তধন উদ্ধার করতে যারা যায়, তারা লোভের বশে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই মারামারি করে মরে।

একটু চুপ করে থেকে ফের বলল ওবারজোহান, গুপ্তধনের প্রলোভন নয়, এই সেন্টিমেন্টই কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবে আমার সঙ্গে।

কিভাবে ?—একটু একটু করে কৌতূহলী হয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ। ওবারজোহান ভাল বক্তা। চোখ দেখে যা বোঝা গেছিল, তাও ঠিক। অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

ওবারজোহান বললে, গুপ্তধনে আমারও লোভ নেই। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন হাতি শিকারী। আমার বাবা ছিলেন সবরকম বুনো জন্তুর শিকারী। কিন্তু আমি হয়েছি পশুপ্রেমিক। ছেলেবেলা থেকেই জন্তুজানোয়ার এনে পুষতাম। ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও বানিয়ে ফেলেছিলাম। উনিশ বছর বয়স থেকে হাতি সম্পর্কে আমার কৌতূহল মাথা চাড়া দেয় সবচেয়ে বেশি।

বেশ ?—নড়েচড়ে বসে ইন্দ্রনাথ।

ইন্ডিয়া আর আফ্রিকা, এই দুই দেশেই এখন ডাঙার বৃহত্তর স্তন্যপায়ী জীব হাতিদের নিবাস। কখন এবং কবে থেকে এরা দলে দলে গভীর জঙ্গলে আর প্রান্তরে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, কেউ তা সঠিক জানে না। কিন্তু এরা টিকে থাকবে দীর্ঘকাল শুধু একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে। প্রাকৃতিক পরিবেশ পালটে

গেলে, মানুষের সান্নিধ্যে থাকবার অবস্থায় পড়লে, এরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে খুব সহজেই।

কিন্তু ভাইকিংদের গুপ্তধনের সঙ্গে হাতিদের সম্পর্ক—

বলছি। সব বলব। উনিশ বছর বয়স থেকে হাতিদের স্বভাবচরিত্র পর্যবেক্ষণ করেছি বন্য পরিবেশে। লক্ষ্য করেছি, পোষ মানলেই এদের সহজাত অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়ে যায়, মানুষের মত কপট হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাধীন পরিবেশে এই ম্যাজেস্টিক এনিম্যালদের সম্বন্ধে যা জেনেছি, তা আমার অসীম কষ্ট আর অসুখবিসুখের উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছে। আফ্রিকার চাড অঞ্চলে হাতিদের ডেরায় অভিযান চালানোর মতলব ছিল অনেকদিন থেকেই। পারছিলাম না টাকার অভাবে। সে সুযোগ একদিন এল কার্লো হ্যাগেনবাক-এর কৃপায়।

তিনি আবার কে?

জীবন্ত জন্তু সংগ্রাহক। ইউরোপ জোড়া তাঁর নাম। তিন পুরুষ ধরে আমরা বুনো জন্তুজানোয়ার নিয়ে আছি, তা তিনি জানেন। বাপঠাকুর্দার মত তাদের বধ করি না, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি—তাও তিনি জানেন। তাই একদিন নিজে থেকেই অফার দিলেন। চাড অঞ্চলে যাওয়ার সব খরচ তিনি বহন করবেন। বর্তে গেলাম আমি। এক ঢিলে দু পাখি মারব ঠিক করলাম।

এক ঢিলে দু পাখি মানে?

চাড অঞ্চলে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যটা কাউকেই আমি ফাঁস করিনি। কিন্তু কিভাবে জানি না রাস্কেল পল সুপারম্যান খবর পায় এবং লোপাট করে নকশাটা।

গুপ্তধনের নকশা?

হ্যাঁ। বাবার কাছে শুনেছিলাম, আমার ঠার্কুদা আফ্রিকার পাহাড় জঙ্গলেই কাটিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। বোম্বেটে ভাইকিংদের একটা দল যে আফ্রিকাতেও যেত লুঠের সম্পদ লুকিয়ে রাখতে আর সেখানকার হীরের খনিতে হামলা চালাতে, এ ইতিহাস ইউরোপের কেউ জানে না। কিন্তু ঠাকুর্দা জানতেন। অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করেছিলেন। গুপ্তধনের কিংবদন্তী বিশ্বাস করেছিলেন—খোঁজখবরও নিয়েছিলেন। অভিযান, অনুসন্ধান বৃথা হয়নি—হদিশ পেয়েছিলেন অকল্পনীয় সেই রত্ন আর স্বর্ণ ভাণ্ডারের।

সত্যি?

একটা অক্ষরও বানিয়ে বলছি না, মিঃ রুদ্র। কিন্তু আপনার মতই তিনি ছিলেন নির্লোভ। গুপ্তধনের নকশাটাই কেবল সঙ্গে এনেছিলেন—কাণাকড়িও আনেননি। মৃত্যুকালে সেই নকশা দেন বাবাকে—কিন্তু একটা শর্ত। মানুষ বড় লোভী—নকশার কথা যেন পাঁচকান না হয়। আর—

বলে থামল ওবারজোহান।

প্রশ্ন করল না ইন্দ্রনাথ। শুধু চেয়ে রইল। শর্তের বাকি আধখানার মধ্যেই রয়েছে ওবারজোহানের লন্ডন থেকে কলকাতা ছুটে আসার মূল রহস্য—এটা যেন বুঝল ইন্দ্রিয় দিয়ে। মোক্ষম জায়গাটিতে এসেই তাই যতি দিয়ে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি

করতে চাইছে বিচিত্র এই পশুপ্রেমিক।

সেকেন্ড কয়েক পরে নিজেই বললে ওবারজোহান, নকশা নিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারেন আমার বাবা। তবে সেই পাপের ঐশ্বর্য নিজের ভোগে লাগান চলবে না। অভিশাপ লাগবে বংশে।

কি করতে হবে গুপ্তধন নিয়ে?

জনগণের কল্যাণে লাগাতে হবে। পৃথিবীর যে কোন দেশের গরীব মানুষরা যাতে উপকৃত হয়, সেই ব্যবস্থা যদি করতে পারেন আমার বাবা—তবেই যেন নকশা নিয়ে অভিযানে যান চাড অঞ্চলে।

গেছিলেন তিনি?

না। ঐশ্বর্যের মোহ তাঁর ছিল না—কিন্তু ভয় ছিল অভিশাপের। অভিশপ্ত সম্পদ শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র সন্তান হেনরিক ওবারজোহানের জীবন বিষময় করে তুলুক, তা তিনি চাননি।

কিন্তু আপনি সে ভয় করেন না?

একেবারেই না। কারণ, আমার কোন বংশধর নেই। আপনার মত আমিও চিরকুমার। আপনার মত আমিও চাই মানুষের উপকার করে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে—পশুপ্রেমের ফাঁকে ফাঁকে।—মিঃ রুদ্র, ইন্ডিয়ার মানুষকে আমি ভালবাসি। কেন জানেন? আমার মা ছিলেন এই কলকাতার মেয়ে।

ইন্দ্রনাথ এবার হতবাক।

ওবারজোহান বললে, হিন্দুর মেয়ে। বাঙালি। কিন্তু দেহ রেখেছেন লন্ডনে। ইন্ডিয়া তাই আমার মাতৃভূমি বলতে পারেন—ইন্ডিয়ানরা আমার ভাইবোন। ঠাকুর্দার স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে চাই এই ইন্ডিয়ার মাটিতেই।

তার মানে, গরীব ভারতীয়দের জন্যে কল্যাণমূলক কাজ করতে চান এখানে?

হ্যাঁ। স্কুল, কলেজ আর হাসপাতাল গড়ে দিতে চাই ভারতের সর্বত্র। গভর্নমেন্টের ট্যাক্স? মকুব করার ভার আমার ওপর। মানুষের মঙ্গলের জন্যে যে গুপ্তধনকে কাজে লাগান হবে, তাকে ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখার জন্যে যা করতে হয় আমি করব।

কিন্তু আফ্রিকান গভর্নমেন্ট গুপ্তধন নিয়ে যেতে তো দেবেন না।

হাসল ওবারজোহান।

বললে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, পথটা বেআইনী হলেও কিছু এসে যায় না

স্মাগলিং করবেন নাকি?

আলবৎ করব। কিন্তু রাস্কেল পল সুপারম্যান বুঝি আর তা হতে দিল না।

পল সুপারম্যান কি স্মাগলার?

কিং অফ স্মাগলার্স।

গুপ্তধন স্মাগলিং তাকে দিয়েই করাতে চেয়েছিলেন?—সটান প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

কাষ্ঠ হেসে অপ্রস্তুতমুখে ওবারজোহান বললে, হ্যাঁ। আপনার ডিটেকটিভ ব্রেন

ঠিক পয়েন্টেই ধরেছে আমাকে। অপরাধটা আমারই। আপনার মত সেন্টিমেন্টাল অপরাধবিজ্ঞানীর কাছে ছুটে এসেছি সেই কারণেই।

চুপ করে জানলা দিয়ে সুভাষ সরোবরের সবুজ গাছপালার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

তারপর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললে মুখ ঘুরিয়ে, বেশ, আমি যাব।

ন্যাংটো খোকার কাণ্ড

হেনরিক ওবারজোহান গটমট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

যাওয়ার আগে বলে গেল, কাল-পরশু আবার আসছি।

উঠেছেন কোথায় ?—ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

হাহা করে হেসে দুহাত ঘুরিয়ে আকাশ-পাতাল আর সারা পৃথিবীটাকে দেখিয়ে বললে ওবারজোহান, যেখানে সস্তা পাই, সেখানে।

বলে, আর দাঁড়াল না।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। জানলার সামনে। দেখল, সদর দরজা দিয়ে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে যাচ্ছে লিকলিকে তালঢ্যাঙা ওবারজোহান।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি। ওবারজোহান যাচ্ছে সেইদিকেই। ট্যাক্সিটার মিটার নামানো রয়েছে। থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কিপটেমি করলে কি হবে, গাড়ি চড়ার ব্যাপারে সাহেবের হাত খুব উদার।

রাস্তার ওপারে ডাংগুলি খেলছিল একটা ন্যাংটো ছেলে, বাগদিদের ছেলে। জামাকাপড়ের বালাই নেই। তার জন্যে তিলমাত্র বিকার নেই। পরমানন্দে ডাং দিয়ে লম্বাটে কাঠের গুলির একদিকে মারছে, গুলি লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, সঙ্গে সঙ্গে তেড়েমেড়ে ডাং চালাচ্ছে গুলি লক্ষ্য করে—ফসকে যাচ্ছে প্রতিবারেই।

আচমকা ডাং গিয়ে লাগল গুলির ঠিক মাঝখানে।

আহা ! কি মার ! কি মার ! তারিফভরা চোখে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। আঁৎকে উঠল পরক্ষণেই।

কেননা, সাঁ-সাঁ করে গুলিখানা উড়ে এসে সটান লেগেছে ওবারজোহানের মুখে।

ভীষণ চমকে দুহাতে গাল খামচে ধরে দাঁড়িয়ে গেছে ওবারজোহান। পেছন থেকে দেখছে ইন্দ্রনাথ। গুলিটা চোখে লাগল, না নাকে লাগল, তা বুঝছে না। শুধু শুনতে পাচ্ছে ওবারজোহানের ইংরিজি গালাগাল। দুহাতে গাল খামচে ধরে তেড়েই যাচ্ছিল ন্যাংটো খোকার দিকে। সে বেচারী হাঁ করে সাহেবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই এমন দৌড় লাগাল যা অলিম্পিকের সোনার মেডেল পাওয়া দৌড়বাজও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

গাল খামচে ধরে নক্ষত্রবেগে ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসল ওবারজোহান। উধাও হল ট্যাক্সি। জানলার সামনে দিয়ে গেলে সাহেবের মুখ কতখানি কেটে গেছে,

সেটা লক্ষ্য করার সুযোগ পেত ইন্দ্রনাথ। তা আর হল না।

আফশোষটা কিন্তু নিশ্চয় রয়ে গেছিল মাথার মধ্যে। নইলে জানলার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? একটু পরে ন্যাংটো খোকাটা ছিটকে যাওয়া গুলির খোঁজে গুটিগুটি ফিরে এলে কেনই বা গেল তার সামনে? মিষ্টি হেসে খোকার হাতে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে মিনিট দশেক ধরে অত গল্পই বা করবে কেন?

ফিরে এল কিন্তু খোশমেজাজে। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসিটা দেখা যাচ্ছে অনেকদিন পরে। এ বড় সর্বনেশে হাসি। ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে যারা হাড়ে হাড়ে চেনে, 'বনমানুষের হাড়' কেসে তার বুদ্ধির ভেল্কির কাণ্ডকারখানা জানে, তারা ঐ হাসি দেখেই বুঝত কুবুদ্ধি চাড়া দিয়েছে ইন্দ্রনাথের মাথায়।

তাই খোশমেজাজে ঘরে ফিরে অনেক দিন পরে ড্রয়ার থেকে বার করল ডানহিল নাম্বার ফোর পাইপখানা। বড় প্রিয় পাইপ। যখন তখন আগুন লাগাতে ইচ্ছে যায় না। সেদিন মেজাজ ভারি শরিফ। ওবারজোহানের পাইপ খাওয়া দেখেই বোধহয় বিলিতি পাইপের নেশা চাগাড় দিয়েছে মাথার মধ্যে। তামাক বার করে ঠাসল পাইপের গহ্বরে। দেশলাই ধরিয়ে তামাকে আগুন দিয়ে বসল ইজিচেয়ারে। খাটের ওপর পা তুলে দিয়ে (এবং নাচাতে নাচাতে) ফুসফুস করে টানতে টানতে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

বুনো হাতির পেছনে ছোটার কথাই ভাবছিল কিনা কে জানে। তবে এর পরের দিন দশেক তার আর টিকি দেখা গেল না। একদম নিপাত্তা!

এই দশদিনে দশ দুগুণে বিশবার ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল হেনরিক ওবারজোহান। দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে দেখে মুখ গোমড়া করে ফিরে গেছে প্রতিবার।

এগার দিনের দিন দেখা গেল ইন্দ্রনাথকে খোজমেজাজে পাইপ টানছে ইজিচেয়ারে বসে।

গটমট করে ঘরে ঢুকেই কটমট করে চেয়ে রইল ওবারজোহান।

আর মিটিমিটি চেয়ে ফিকিফিকি হাসতে লাগল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

দেখে গাপিত্তি আরো জ্বলে গেল ওবারজোহানের—রীতিমত দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ইউ ইন্ডিয়ানস! কোন কথার দাম নেই আপনাদের?

একদম রাগ করল না ইন্দ্রনাথ। করবেই বা কেন? সত্যিই তো সে কথা রাখেনি। তাই ফিকিফিকি হাসি হেসেই বললে, একদম উল্টো বললেন মিঃ ওবারজোহান। কথার দাম আছে বলেই ঘুরে আসতে হল একচক্কর।

কোথায়? কোন চুলোয়?

'কোন চুলোয়' শব্দ দুটোর যে ইংরিজিটি বললে ওবারজোহান, সেটা এমনি বিদঘুটে যে তার সোজা বাংলাটাই লেখা হল এখানে।

ইন্দ্রনাথ বলল, ঝুটোনগরে।

ঝুটোনগরে? কেন?

আর বলেন কেন! সেখানকার মহারানীর সিঁদুর কৌটো হারিয়ে গেছিল—খুঁজে দিয়ে আসতে হল। জরুরী তলব। মোটা দক্ষিণা। টাকারও দরকার তো—বুনো

হাতির পেছনে ছোটার খরচটা তুলে আনলাম।

আপনার আবার খরচ কী ? খরচ তো আমার। মায় আপনার টোব্যাকোর খরচ পর্যন্ত। পাইপটা তো খাসা—পেলেন কোথায় ?

পি সি সরকারের নাম শুনেছেন ?

ম্যাজিশিয়ান ?

হ্যাঁ। তার উপহার। আমি নাকি ম্যাজিক দেখালে তার ভাত মারা যেত, তাই ম্যাজিক দেখিয়ে উপহার পাওয়া পাইপটা গছিয়ে দিয়েছে আমাকে।

অট্টহাসে হিপ পকেট থেকে নিজের পাইপখানা বার করতে করতে বললে ওবারজোহান, দেখব আপনার ম্যাজিক লেক চাডের হাতির দলের সামনে।

দেখব আপনারও—ভাইকিংদের গুপ্তধন পাওয়ার পর।—বলে ওবারজোহানের চাইতেও জোরে অট্টহাসি হাসল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

জব্বর ঘোড়া শু

মাঝখানের পথ পরিক্রমার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন বলে বাদ দেওয়া গেল।

নাইজিরিয়ার পৌঁছেই বনবিভাগ দপ্তরে গেল ওবারজোহান। সঙ্গে ইন্দ্রনাথ।

অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে ওবারজোহান বললে—আমিই হেনরিক ওবারজোহান।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার মশায়ের চোখ জোড়া যেন কপালে উঠে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরক্ষণেই বললে শশব্যস্তে, আরে ! আপনি !

আজ্ঞে, আমি। এসেছি হাতি ধরার লাইসেন্স নিতে।

বসুন, বসুন। লাইসেন্স নিশ্চয় পাবেন—শুধু হাতি ধরার কেন, মারারও।

নেহাৎ দরকার না হলে মারব না। কয়েকটা খোকা হাতি ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এসেছি।

ধরুন না। মারতেও পারেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলছি—মারুন। যত খুশি মারুন। দেদার হাতি মশায়—মেরে শেষ করতে পারবেন না।

জানি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাতি তো এই লেক চাডেই।

সবচেয়ে ধড়িবাজ হাতিও বটে।—মুচকি হেসে বললে লালমুখো অফিসার।

এবং প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বটে—সায় দিয়ে বললে ওবারজোহান। ততক্ষণে তার চেয়ারে বসা হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথকেও পাশে বসিয়েছে। দুজনেই বার করেছে তামাকের পাইপ এবং শুরু হয়ে গেছে ধূম উদ্গীরণ।

জুল জুল করে তাকিয়ে বললে অফিসার, জানেন দেখছি।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ওবারজোহান বললে, জানি বলেই তো এলাম। দেখা যাক ধড়িবাজি আর অলৌকিক ক্ষমতায় কে হারে, কে জেতে।

কিন্তু পৌঁছতে পারবেন কী ?

কেন ?

বড় অসময়ে এসেছেন। একে তো জায়গাটা সাংঘাতিক দুর্গম, তার ওপর এখন বর্ষার শেষ। কাদা আর জল পেরোতেই প্রাণটা যাবে, হাতিদের ল্যাজের ডগাও দেখতে পাবেন না।

দাঁত খিঁচিয়ে হাসল ওবারজোহান, লেক চাড অঞ্চলে যারা থাকে, এমনি কয়েকজনকে যোগাড় করে দিতে পারেন ?

একজনকে এখুনি দাঁড় করাচ্ছি আপনার সামনে—বলেই বেল টিপল অফিসার। আর্দালী ঘরে ঢুকতেই বললে, নুমুমুকে পাঠিয়ে দাও।

মিনিটখানেক পরেই ঘরে ঢুকল নুমুমু। জাঁদরেল কান্ত্রী। পুরু ঠোঁট। মিশমিশে কালো রঙ। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দানব বললেই চলে। পরনে খাকী হাফ প্যান্ট আর হাফ সার্ট।

ওবারজোহানকে বললে অফিসার, নুমুমু আমার হেডকুক। রাঁধে ভাল। জঙ্গলে যাওয়ার আগে ওর হাতের রান্না খেয়ে যাবেন। এখন জিজ্ঞেস করে জেনে নিন কি জানতে চান।

নুমুমু—মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললে ওবারজোহান, লেক চাডে যেতে চাই।

চমকে উঠল নুমুমু। কালো মুখে ঝলসে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি, ইয়া আল্লা ! এ সময়ে লেক চাডে কেউ যায় ? মারা পড়বেন।

নির্বিকার মুখে ওবারজোহান বললে, বাইশজন কুলি আর একজন হেডম্যান চাই। যোগাড় করে দাও।

চোখ পিট পিট করে অকুতোভয় ওবারজোহানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে সংক্ষেপে বললে নুমুমু, যো হুকুম।

বেরিয়ে যাচ্ছে নুমুমু, পেছন থেকে বললে ওবারজোহান, দুটো ঘোড়াও চাই। যত টাকা লাগে, দেব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সাদা দাঁতের ঝলক দেখিয়ে একগাল হেসে ফেলল নুমুমু।

ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে এসে গেল বাইশজন কুলি আর একজন হেডম্যান। সেইসঙ্গে দুটো ঘোড়া।

ঝটপট কুলিদের কাজ ভাগ করে দিলে ওবারজোহান। ষোলজনের প্রত্যেককে বইতে হবে পঁয়ত্রিশ পাউন্ড ওজনের মালপত্র। ফাই-ফরমাস খাটার জন্য রইল বাকি দুজন আর হেডম্যান।

এবার ঘোড়া দুটোর পালা।

বন দপ্তরের লাগোয়া মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল উচ্চৈঃশ্রবার মত তেজিয়ান দুটো ঘোড়া। একটার রঙ ঘোর কালো। আর একটার রঙ ঘোর লাল। মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দানবাকার নুমুমু। সামলাতে পারছে না কিছুতেই।

ওবারজোহানকে দেখেই বললে দর্শনীয় দেঁতো হাসি হেসে—গুড হর্স।

সংশয়ভরা চোখে তাকিয়ে ওবারজোহান বললে, গুড হর্স তো বুঝলাম। পিঠে

বসতে দেবে তো ? মিঃ রুদ্র, আপনার কি মনে হয় ?

প্রশংসাভরা চোখে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। মুচকি হাসল এখন। বলল, পরখ করে দেখলেই হয়। কালো ঘোড়াটা আমার, লালটা আপনার।

কালোটাই সবচেয়ে পাজি স্যার—তড়বড় করে বলে ওঠে নুমুমু, ওর নাম শু। পাজির পাঝাড়া।

তাই নাকি ? তাহলে তো চেপে দেখতে হয়।—বলেই নুমুমুর হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে শু-এর কানে কানে কি যেন বলল ইন্দ্রনাথ। কালো কেশরে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘাড় চাপড়ে টপাং করে উঠে বসল পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ লাফ দিল শু। ঠিকরে ফেলা গেল না ইন্দ্রনাথকে।

শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল শু। কিন্তু গড়িয়ে পড়ল না ইন্দ্রনাথ।

তারপরেই তিড়িং মিড়িং নাচ আরম্ভ করে দিলে শু। কিন্তু ঘাড় খামচে ধরে অটল হয়ে বসে রইল ইন্দ্রনাথ।

পরক্ষণেই শুরু হল দৌড়। যতরকমভাবে হেনস্থা করা যায়, নতুন মালিকের ওপর সবকটা প্রক্রিয়াই প্রয়োগ করে গেল শু। কিন্তু সব চেষ্টাই বানচাল করে দিয়ে টগবগিয়ে মাঠের ধুলো উড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

টপ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে বললে ওবারজোহানকে ভারি মিষ্টি হাসি হেসে, গুড হর্স, মিঃ ওবারজোহান। ভেরি ইনটেলিজেন্ট।

ইনটেলিজেন্ট না কচু !—চোখ বড় বড় করে বলে ওবারজোহান, যেভাবে লাফাচ্ছিল, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যায়নি আপনার, এই রক্ষে।

ইনটেলিজেন্ট বলেই তো ইনটেলিজেন্ট মনিবকে চট করে চিনে ফেলেছে—ইন্দ্রনাথ যেন বিনয়ের অবতার।

সূক্ষ্ম খোঁচাটা কিন্তু ওবারজোহানকে ঘায়েল করল বেশ ভালোভাবেই। কটমট করে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথের পানে। কিন্তু মধুর হাসি ছাড়া সুশ্রী মুখাবয়বে গোপন শ্লেষের আভাসটুকুও দেখতে না পেয়ে বেশ রেগেই গেল মনে হয়।

বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, মিঃ রুদ্র মনে হচ্ছে আমার ইনটেলিজেন্সকে কটাক্ষ করছেন ?

আকাশ থেকে পড়ল যেন ইন্দ্রনাথ রুদ্র, সেকী ! আপনার ইনটেলিজেন্সকে কটাক্ষ করতে যাব কেন ?

জন্তুজানোয়ার নিয়ে কারবার করি বলে ভেবেছেন বুদ্ধিটাও আমার জন্তুজানোয়ারের মত ?

ভীষণ বিব্রত হল যেন ইন্দ্রনাথ, কী মুস্কিল ! কথা হচ্ছে ঘোড়া নিয়ে—

আজ্ঞে না, ঘোড়সওয়ার নিয়ে—ওবারজোহান যেন ক্ষ্যাপাশিরোমণি হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে, এলেম দেখতে চান আমার ? দেখুন তবে।

সত্যিই দেখিয়ে দিল বটে ওবারজোহান। ঝাঁ করে ছুটে গিয়ে নুমুমুর হাত থেকে লাগাম কেড়ে নিয়ে আশ্চর্য লাফমেরে সটান উঠে পড়ল লাল ঘোড়ার পিঠে।

তারপরেই যেন সার্কাস শুরু হয়ে গেল মাঠময় ! লাল ঘোড়া বনাম হেনরিক ওবারজোহান। কেউ কম যায় না। সমান দুঁদে দুজনেই। ধুলোর ঝড় উড়ে গেল রোদ্দুরে জ্বলা মাঠে। হাঁ করে চেয়ে রইল নুমুমু।

সেই ফাঁকে টুক করে শু-এর পিঠে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। লাল ঘোড়াকে সামাল দিতেই বুঝি ছুটে গেল মাঠের মধ্যে।

কিন্তু একী কাণ্ড ! শু হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন ? বজ্রকঠিন ইন্দ্রনাথও যে সামাল দিতে পারছে না কালো বিদ্যুতের মত শু-কে ! দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে দূরের বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল শু !

তারপরেই যে কাণ্ডটা ঘটল, তার সাক্ষী রইল না কেউই।

জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে আচমকা চিঁ-হিঁ-হিঁ রব করে শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল শু। পিঠ থেকে পিছলে মাটিতে খসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। সামনেই একটা পেল্লায় বাবলা গাছের দিকে দৌড়ে গেল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে।

গুঁড়ির গায়ে বোর্ডপিন দিয়ে সাঁটা একটা কাগজ। তাতে পরিষ্কার বাংলায় লেখা শুধু একটা শব্দ :

সাবাস !

হাজার হাজার বছরেও চেনা যায়নি হাতিদের

জ্ঞান দিচ্ছিল ওবারজোহান রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর। নুমুমু সত্যিই রাঁধে ভাল। বেগুন পোড়ার মত কাঠের আঁচে মুরগী পোড়া। অপূর্ব ! জীবনে এরকম সুখাদ্য খায়নি ইন্দ্রনাথ।

ভরপেট খেয়ে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে, কিন্তু ফুক ফুক করে পাইপ খেতে খেতে সমানে বকেই চলেছে ওবারজোহান।

মিঃ রুদ্র, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

অতি কষ্টে চোখ মেলে পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে বললে ইন্দ্রনাথ, কই না তো ?

পাশের খাটে মশারির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে বললে ওবারজোহান, যাচ্ছেন লেক চাডে হাতিদের মোকাবিলা করতে। হাতি সংবাদ কিছু শুনে নিন এই বেলা।

হাতিরা তো উপলক্ষ। আসল উদ্দেশ্য তো ভাইকিংদের গুপ্তধন,—ঘুমজড়িত স্বর ইন্দ্রনাথের।

আরে মশাই, হাতিদের ঠিকুজী-কোষ্ঠী না জানলে গুপ্তধনের হদিশ পাবেন না। ভারি ধড়িবাজ ছিল এই ভাইকিংরা।

হাতিদের সঙ্গে গুপ্তধনের সম্পর্ক !—ঘুম ছুটে যায় ইন্দ্রনাথের চোখ থেকে।

আছে, আছে—গূঢ় হাস্য করে ওবারজোহান, গুপ্তধনের নকশাটা আছে এই শর্মার ব্রেনে, আর নকশামত পথ চলতে গেলে যা যা জানা দরকার, সবই আছে হেনরিক ওবারজোহানের পেটে।

বাংলায় একেই বলে পেটে পেটে বুদ্ধি—বাংলাতেই বললে ইন্দ্রনাথ।

কি বললেন ?

বললাম যে আপনার মগজটা মাথার খুলিতে নেই, পেটের থলিতে আছে।

রসিকতা করছেন ? জানেন একজন আমেরিকান অভিযাত্রী হাতিদের সম্পর্কে কি বলেছিল ?

শুনতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, মিঃ ওবারজোহান।

বলেছিল, হাজার হাজার বছর ধরে চিনে আসছি হাতিদের। অথচ ওদের সম্বন্ধে কিছুই এখনো জানি না বলা যায়।

ফালতু কথা।

হোয়াট ?

একদম বাজে কথা। চিড়িয়াখানায় গেলেই হাতিদের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

আজ্ঞে না, জানা যায় না। হাতিরা আজও একটা রহস্য। আপনার মত রহস্যভেদীও এই জীবন্ত প্রহেলিকাদের বুঝে উঠতে পারবে না সারা জীবনেও।

বলছেন ?—বেশ কৌতুক বোধ করে ইন্দ্রনাথ। কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় শুনতে থাকে ওবারজোহানের বক্তিমে।

বই পড়লেও তো জানা যায়—

আজ্ঞে না, যায় না। বই-টই যা লেখা হয়েছে হাতিদের নিয়ে, তার বেশিরভাগই নেটিভদের মুখে শোনা অবিশ্বাস্য গল্প। হাতির দাঁতের লোভে জঙ্গলে গেছে যারা অথবা ধর্ম প্রচার করতে বনে জঙ্গলে টো-টো করেছে যারা—এসব গল্প তাদেরই। বৈজ্ঞানিক অভিযান হয়েছে খুবই কম।

এবার সোজা হয়ে না বসে পারল না ইন্দ্রনাথ।—অদ্ভুত কথা বলছেন মিঃ ওবারজোহান। বৈজ্ঞানিক অভিযান চাঁদ-ফাঁদ ছাড়িয়ে সৌজগতের বাইরে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, হাতিদের নিয়ে হয়নি ?

হবে কি করে ? একজন অভিযাত্রী বড়জোর পঞ্চাশ বছর অভিযান চালাতে পারে সারা জীবনে। কিন্তু হাতিরা বাঁচে একশ বছরেরও বেশি। ফলে কোন অভিযানেরই শেষ ফলাফলটা দেখে যেতে পারছেন না বৈজ্ঞানিকরা।

একজনের সারাজীবনের অভিজ্ঞতা যদি লেখা থাকে, আর একজন তা পড়ে নিয়ে বাকিটুকু করে ফেললেই হল।

অট্টহেসে বললে ওবারজোহান, মিস্টার, অত সোজা নয়। বিশেষ করে লেক চাড অঞ্চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাতিরা যে থাকে এখানেই।

কিন্তু ভাইকিংদের গুপ্তধনের সঙ্গে হস্তীরহস্যের সম্পর্কটা যদি একটু খোলসা করে বলতেন—

বলব, বলব মিঃ রুদ্র, সবই বলব। হাতেনাতে দেখিয়েও দেব। তারপর কল্পনাতীত সেই গুপ্তধনের অধীশ্বর হব আপনি আর—

আমি।

একই সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল দুজনে।

এবং ঘুমিয়েও পড়ল একটু পরে।

কাক ডাকার আগেই চিরকাল ঘুম ভাঙা অভ্যেস ইন্দ্রনাথের। কিন্তু কি জানি কেন পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল একটু দেরিতেই। বালিশের তলায় পেল একটা চিরকুট। পরিষ্কার বাংলায় লেখা—'হস্তীমূর্খ !'

নলখাগড়ার বন পেরিয়ে

পাঁচ ফুট গভীর জল। তার মধ্যে ঘন সবুজ দানবিক ঘাস মাথা তুলে রয়েছে আট ন' ফুট ওপর পর্যন্ত। মাইলের পর মাইল এই সবুজ ঘাস সমুদ্র। জল ঠেলে চলেছে অভিযাত্রীবাহিনী। ঘোড়ার পিঠে শুধু দুজন—ইন্দ্রনাথ আর ওবারজোহান। কুলিরা চলেছে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে—মাথায় মোট নিয়ে।

নিরেট পাঁচিলের মত ঘাস বনের ওদিকে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর রোদের তেজও টের পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোড়া দুটো চলেছে ওদের জান্তব অনুভূতি দিয়ে পথ চিনে।

বিশেষ করে শু-এর ক্ষমতাটা যেন এ ব্যাপারে একটু বেশি।

চাপ দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে ওবারজোহান তো একসময়ে বলেই ফেলল, মিঃ রুদ্র, আপনার ঘোড়াটা অলৌকিক ক্ষমতা ধরে দেখছি।

কেন বলুন তো ?—সবার আগে যেতে যেতে বললে অশ্বারূঢ় ইন্দ্রনাথ। কুলিরা মোট মাথায় নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারধারে। কিন্তু দলছাড়া হয়নি কেউই। দুর্ভেদ্য এই ঘাস-জঙ্গলে একবার পথ হারালে আর পথ খুঁজে ফিরে যেতে হবে না বলেই ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ শুনে শুনে ঠিক চলেছে ঘোড়া দুটো ঘিরে।

ওবারজোহান বললে, আশ্চর্য ক্ষমতা বটে। চারদিন ধরে দেখছি ওর ক্ষমতা। যতই দেখছি, ততই চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে।

চারদিনই বটে। জলজমি আর ঘাসজমি ঠেলে চারদিন ধরে চলছে এই অভিযান। এরকম জঘন্য জায়গা যে পৃথিবীতে কোথাও থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রথম দুদিন দু ফুট গভীর জল পেরোতেই প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল প্রত্যেকেরই। শু কিন্তু নির্বিকার। লম্বা লম্বা ঘাসের তলায় লুকনো হায়নার গর্ত আর উইয়ের ঢিবি পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে গেছে। দরকার হলে লম্বা লাফ মেরে ছোটখাট গর্ত পেরিয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথকে কিচ্ছু বলতে হয়নি।

তাই বললে ইন্দ্রনাথ, তা যা বলেছেন। বাহন বটে একখানা। কিন্তু মিঃ ওবারজোহান, দু ফুট জল বেড়ে দাঁড়িয়েছে এখন পাঁচ ফুট। জল কি আরও বাড়বে ?

আরে না। লেক চাডের ভেতরের ছোট লেক অঞ্চলে একবার পৌঁছতে পারলেই রেহাই পেয়ে যাবেন।

ভেতরের লেক মানে? এটা কি তবে বাইরের লেক?—শু-এর পিঠে বসে ব্যালেন্স রাখতে রাখতে বলে ইন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, ভেতরের লেকের চেয়ে তিনগুণ বড় এই বাইরের লেক।

বলেন কী!

আঁৎকে উঠলেন দেখছি? আরে মশাই, আমার মা ছিলেন বাঙালি—আর আপনার মা-বাবা দুজনেই বাঙালি। অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

না, না, ঘাবড়ানোর তো কিছু নেই,—কাষ্ঠ হেসে বললে ইন্দ্রনাথ—আপনিও বিয়ে থা করেননি, আমিও করিনি। পটল তুললে কাঁদবার কেউ নেই। কিন্তু এইরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় মরতে হবে বলেই দুঃখ হচ্ছে।

মরবেন না, মরবেন না, হেনরিক ওবারজোহান যখন সঙ্গে আছে—মরবার কথাও মাথায় আনবেন না। ন' হাজার বর্গমাইলের লেক তো প্রায় পেরিয়ে এলাম।

ন' হাজার বর্গমাইল!

বাইরের লেকের ক্ষেত্রফল। মাঝের লেকটা তো মোটে তিন হাজার বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে।

চারদিনে ন' হাজার বর্গমাইল পেরোন যায়?

মিঃ রুদ্র, আপনি লেক চাড সম্বন্ধে কিসসু জানেন না।

তা তো জানিই না।

ন' হাজার বর্গমাইল জুড়ে বাইরের লেকটা তো আংটির মত ঘিরে রয়েছে মাঝের লেক চাডকে। আমরা সবচেয়ে কম চওড়া জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি কিংঘাবা গ্রামের দিকে।

কিংঘাবায় গেলেই গুপ্তধন পাবেন তো?

একেবারে ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন, মিঃ রুদ্র। কিংঘাবা হবে আমার হেড কোয়াটার্স—ওখান থেকেই অভিযান চালাব গুপ্তধন যেখানে আছে, সেখানে।

ও—ঢোক গিলল ইন্দ্রনাথ, কিন্তু সূর্য যে অস্তাচলে। অন্ধকার হয়ে গেলে কিংঘাবা খুঁজে পাবেন কি?

হোক না অন্ধকার। মাথার ওপর তারা তো রয়েছে—বুক পকেট থেকে পাইপ বার করতে করতে বললে ওবারজোহান। পেটাই বপু তুড়ুক তুড়ুক করে নাচছে লাল ঘোড়ার পিঠে—কিন্তু তামাকের নেশা মাথা চাড়া দিচ্ছে ঠিক-ঠিক সময়ে।

আকাশের তারা দেখে পথ চলবেন?—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে শুধোয় ইন্দ্রনাথ।

নিশ্চয়, চিরকালই তো তাই হয়েছে। সেকালে মরুভূমিতে লোকে পথ চিনে নিত তারা দেখে, সমুদ্র পথ চিনত নাবিকরা—জঙ্গলেও পথ চিনতে হয় ঐভাবেই।

ও—বলে চুপ মেরে গেল ইন্দ্রনাথ।

একটু পরেই সূর্য ডুবল। অন্ধকার নামল। আর ঠিক সেই সময়ে সামনে পড়ল নিরেট দেওয়াল।

নলখাগড়ার প্রাচীর !

শিউরে উঠল ইন্দ্রনাথ ভয়াবহ সেই দেওয়াল দেখে। এক একটা নলখাগড়া বাঁশের চাইতেও মোটা—প্রায় ইঞ্চি দুয়েক পুরু। বছরের পর বছর জলের মধ্যেই বেড়েছে, আয়ু ফুরোলে জলের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে। আবার ফাঁক দিয়ে গজিয়েছে। জমাট দেওয়াল। পাথরের দেওয়ালও হার মেনে যায়।

পেছন থেকে চিৎকার শোনা গেল ওবারজোহানের, মিঃ রুদ্র, আর এগোবেন না।

এগোব কি করে ?

ইব্রাহিম যাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুন।

ইব্রাহিম ওদের হেডম্যান। বাইবেল থেকে নেওয়া নাম। নামের মতই সাচ্চা আদমী। বিচিত্র এই অ্যাডভেঞ্চারের শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম ওর কাছে কাছেই থেকেছে—সঙ্গছাড়া হয়নি একবারও।

এই ইব্রাহিমই এগিয়ে এল সামনে। কালো পাঁচিলের মত নলখাগড়ার বনে ঢুকে পড়ল জোর করে।

কাম ! কাম !—পেছন ফিরে ডাক দিয়ে গেল ঘোড়সওয়ার দুজনকে।

কালো মানুষ ইব্রাহিমের সাহস দেখে ইন্দ্রনাথ তো অবাক। বীরত্বে আর দুঃসাহসে সেও তো কম যায় না। কিন্তু এতদিন মরণের ডংকা বাজিয়েছে সভ্যদেশে—এবার দেখাতে হল অসভ্য দেশে।

তেড়েফুঁড়ে ঢুকে পড়ল নলখাগড়ার বনে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু নলখাগড়া। মাথার ওপর তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—সাত ফুট উঁচু নলখাগড়া চাঁদোয়া রচনা করে রেখেছে সেখানেও।

ইব্রাহিম কি তাহলে স্রেফ আন্দাজে এগোচ্ছে ? মনে তো হয় না। পুরো দলটাই আসছে পেছন পেছন। এ জঙ্গলে ঘোড়া চলবে না ! তাই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগাম ধরে এগোল ওরা। দু হাতে নলখাগড়া ঠেলে প্রাণের পরোয়া না রেখে চলেছে ইব্রাহিমের পেছন পেছন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে কি ভয়ঙ্কর এই জঙ্গল ছেড়ে ?

নিকষ অন্ধকার। শুধু নলখাগড়া সরানোর শব্দ। বুটের শব্দ। চলার শেষ নেই। মাঝরাতে শোনা গেল হায়নার অট্টহাসি।

গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের।

কিন্তু আশ্চর্য লোক বটে ওবারজোহান। হায়নার অট্টহাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন একখানা অট্টহাসি ছাড়ল সেই মুহূর্তে যে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হবার উপক্রম হল ইন্দ্রনাথের।

মিঃ ওবারজোহান !

অনেক পেছন থেকে ভেসে এল ওবারজোহানের জবাব, ভয় নেই মিঃ রুদ্র।

হায়না হাসছে যে !

হাসুক। তার মানেই ডাঙা আছে সামনে।

ডাঙা ! সামনে ? কিন্তু এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগিয়ে আর বেশি দূর যাওয়া যাবে কি ? হাঁটু যে ভেঙে পড়তে চাইছে !

মিঃ রুদ্র !

জবাব নেই।

মিঃ রুদ্র ! কোথায় আপনি ? শক্ত জমি পেয়ে গেছি। বেরিয়ে আসুন।

নিস্তব্ধ নলখাগড়ার জঙ্গলের ওপর দিয়ে হাহাকারের মত ডাক ভেসে গেল দিক হতে দিকে।

সাড়া এল না।

সাড়া দেওয়ার মত অবস্থায় ছিল না ইন্দ্রনাথ। আচমকা নলখাগড়ায় হোঁচট খেয়ে ঠিকরে পড়েছিল সামনে। শক্ত নলখাগড়ায় মাথা ঠুকে যাওয়ার পর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরল ভোরের আলোয়।

ওবারজোহান, ইব্রাহিম ঝুঁকে বসে রয়েছে। চোখে মুখে উদ্বেগ।

ইন্দ্রনাথ চোখ মেলতেই খেঁকিয়ে ওঠে হেনরিক ওবারজোহান, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেই জ্ঞানটা হারালেন ? খুঁজে খুঁজে হয়রান আমরা।

আস্তে আস্তে মাথার মধ্যেকার গোলমাল ভাবটা কেটে যায় ইন্দ্রনাথের। মনে পড়ে তমিস্রাময় রজনীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। দুর্ভেদ্য নলখাগড়ার জঙ্গলে আচমকা হোঁচট খাওয়া—তারপর আর কিছু মনে নেই।

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে তো সে বেরোয়নি ?

ওবারজোহানও তাকে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে আসেনি—কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে।

তবে কে তাকে নিয়ে এল বাইরে ?

আফ্রিকান ম্যাজিক টেলিকাইনেসিস

কিংঘাবা গ্রামটা বেশ উঁচু জমির ওপর।

উঁচু টিলা বললেই চলে। ঢালু হয়ে চারদিকে নেমে গিয়ে মিশেছে জলজঙ্গলে। একদিকে শুধু নলখাগড়ার জঙ্গল। তারও ওদিকে দিগন্তবিস্তীর্ণ দানবিক ঘাসের সবুজ জঙ্গল। এই ঘাসের জঙ্গল দিগবলয় ঘিরে দেখা যাচ্ছে চারদিকই। বড় গাছ কোথাও নেই।

ঢালু জমির ওপর অসংখ্য কুঁড়েঘর। যেহেতু জলা জায়গা চার দিকে, তাই কিংঘাবা গ্রামটা গড়ে উঠেছে উঁচু জমিতে। গোলাকার কুঁড়েঘরগুলো নলখাগড়া দিয়ে তৈরি। চালও নলখাগড়ার চাটাই দিয়ে ছাওয়া। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন অগুন্তি উইয়ের ঢিপি।

এই রকম একটা কুঁড়েঘরে আস্তানা নিয়েছে ইন্দ্রনাথ আর ওবারজোহান।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথের। ওবারজোহানকে বলতেই হেঁকে ডাক দিল ইব্রাহিমকে—

বলল, কেভো আবিনটশি।

টো বাটুর—বলেই সরে পড়ল ইব্রাহিম।

আফ্রিকান ল্যাংগুয়েজটা ভালই জানেন দেখছি,—টিপ্পনী কাটল ইন্দ্রনাথ।

তা জানি বইকি,—নিত্যসঙ্গী তাম্রকূট সেবনের নল বের করতে করতে বললে ওবারজোহান।

হুকুমটা কি দিলেন ?

বললাম,—আন খাবার। ও বললে,—আনতেই যাচ্ছি।

ফাইন। আফ্রিকান কালচার আপনার অস্থি মজ্জায় রক্তে ঢুকে বসে আছে।

কালচার ? চোখ তুলল ওবারজোহান, আলটপকা কথাটা বললেও সাচ্চা কথাই বলেছেন, মিঃ রুদ্র। আফ্রিকা একটা রহস্যময় দেশ। এক সময়ে একে বলা হত কালো মহাদেশ। আজও এই মহাদেশের কালো রহস্য সাদা মহাদেশগুলোর কাছে একটা রহস্য।

যেমন ?—ঘাসের বিছানায় টান-টান হয়ে শুতে শুতে বললে ইন্দ্রনাথ।

কালো জাদুবিদ্যার নাম নিশ্চয় শুনেছেন ?

ব্ল্যাক ম্যাজিক ?

ইয়েস স্যার। আদিম যুগ থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা চলে আসছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। ইংল্যান্ডে এই ব্ল্যাক ম্যাজিক ডাকিনীতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। শয়তান পুজো চলে নারকীয়ভাবে। আইন করে তা বন্ধও করা হয়।

জানি। অনেক ডাইন আর ডাইনীকে পুড়িয়ে মারার পর। ইউরোপের অনেক রাজামহারাজাও তো ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করে গেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এখন কেন মিঃ ওবারজোহান ?

জবাব দিল না ওবারজোহান। বেশ কয়েকবার টান মারল জ্বলন্ত পাইপে। কড়া তামাকের ধোঁয়ায় ভরে উঠল ছোট্ট কুঁড়েঘর।

কনুইয়ে ভর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দাড়িওলা সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। কি বলতে চায় ইংরেজ-তনয় ?

কটা চোখে বেড়ালের দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওবারজোহান।

তারপর বললে পাইপ নামিয়ে, মিঃ রুদ্র, প্রসঙ্গটা টেনে আনলাম কেন, আপনি কি তা জানেন না ?

চোখ ছোট হয়ে আসে ইন্দ্রনাথের, কি বলতে চান ?

ঠোঁটের কোণ বেঁকিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসল ওবারজোহান। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে ঘর করেই বলেই বোধহয় হাসিটা ঐ ধরনেরই মনে হল—অন্তত ইন্দ্রনাথের কাছে—সেই মুহূর্তে।

বললে জোর করে ফুটিয়ে তোলা উদাস গলায়, হায় রে ! আপনাকে এত লোক থাকতে বেছে নিলাম কেন গুপ্তধন খোঁজার অভিযানের সঙ্গী হিসেবে, তা কি

আপনি জানেন না ?

আপনি বলেছেন যেটুকু, সেইটুকু জানি। ভারতের দরিদ্রদের সেবায় টাকাটা কাজে লাগাতে চান।

সে তো একশবার। কিন্তু আপনি রহস্যসন্ধানী অপরাধবিজ্ঞানী। গুপ্তধনের খোঁজে কেন আনলাম ?

আপনার মুখেই শোনা যাক।

আবার সেই জানোয়ারি হাসি হাসল ওবারজোহান, ফাইন ! আমার মুখ থেকেই শুনতে চান। কেমন ?

আজ্ঞে।—শ্লেষতীক্ষ্ণ স্বর ইন্দ্রনাথের।

আপনাকে বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোপন ফাইলে আপনার সবকথা লেখা আছে ?

ভুলে যাওয়ার মত স্মৃতিশক্তি এখনো অর্জন করিনি।

সাধু ! সাধু ! সেই ফাইলেই পেয়েছিলাম আপনার সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা খবর।

যথা ?

আপনি ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান নন, ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাসও করেন না—কিন্তু ব্ল্যাক কন্টিনেন্ট এই আফ্রিকার একজন ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান ওঠবোস করে আপনার হুকুমে।

বটে !

আপনার চোখমুখ দেখেই বুঝলাম, কথাটা সত্যি,—পাইপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ওবারজোহান। বেশ মোটা পাইপ। বিশেষ করে নলটা। তাই কাৎ হয়ে গেল না।

ইন্দ্রনাথ চেয়ে রইল সেইদিকে। অন্যমনস্ক চাহনি। স্বপ্নিল দুই চোখে অতীতের স্মৃতিচারণ।

বললে বেশ কিছুক্ষণ পরে, আপনি টিমাটুর কথা বলছেন ?

রাইট। টিমাটু। ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান টিমাটু। এক মহাবিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। আপনার ব্রেনের ম্যাজিক দিয়ে। প্রতিজ্ঞা করেছিল সে, যদি কখনো সুযোগ আসে—তার ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়ে উপকার করবে আপনার।

ইন্দ্রনাথের মনের চোখে তখন ভাসছে অতীতের সেই ছবি।...

কেরালা।

বিখ্যাত গুরুবায়ুর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ। সারি সারি দাঁড়িয়ে চল্লিশটা হাতি। সবই মানতের হাতি। মানত রাখতে গুরুবায়ু মন্দিরে হাতি দান করার প্রথা অনেকদিনের। এ প্রথা সারা ভারতের আর কোথাও নেই।

সবচেয়ে বড় হাতিটার নাম পদ্মনাভন। দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। ভক্তরা স্তূপাকারে সামনে রেখে গেছে ফল, গুড় আর ভাত। কারণ, তার খাতির চল্লিশটা হাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শোভাযাত্রার সময়ে থিদাম্বু অর্থাৎ বিগ্রহ বহন করার

সৌভাগ্য একমাত্র তারই। আকারে বিশাল—চল্লিশটা হাতির কোনোটাই তার মত এরকম পেল্লায় বপুর অধিকারী নয়।

দূরে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভনকে দেখছে ইন্দ্রনাথ। দেখছে আর উদ্বিগ্ন হচ্ছে। শঙ্কা আর উদ্বেগের থির থির কাঁপুনি একটু একটু করে বেড়েই চলেছে মনের মধ্যে।

হাতিরা অতিশয় ভোজনপ্রিয় হয়। বিশাল কলেবরকে সুস্থ রাখতে গিয়ে ক্রমাগত খেয়েই যায়। মুখের বিরাম থাকে না। শুঁড় দিয়ে গাছপাতা ক্রমাগত চালান করে মুখগহ্বরে।

পদ্মনাভনের সামনে রাশিকৃত সুখাদ্য। কিন্তু সে তা খাচ্ছে না।

ল্যাজ আর শুঁড়ের অস্থিরতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

অর্থাৎ, হাতিদের স্বভাব অনুযায়ী মত্ততা দেখা দিচ্ছে পদ্মনাভনের মধ্যে। এখনো কেউ তা টের পায়নি। অথচ এখুনি ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলা উচিত। নইলে ক্ষ্যাপা হাতির পায়ের তলায় মারা যাবে প্রাঙ্গণের অগণিত ভক্তের অনেকেই।

ইন্দ্রনাথ শঙ্কিত সেই কারণেই।

কেরালায় এসেছিল একটা কুটিল জটিল কেসের সুরাহা করতে। কাজ শেষ হয়েছে। অপরাধী ধরা পড়েছে। চোরাই মালও উদ্ধার হয়েছে। কলকাতায় ফেরার আগে এসেছিল শ্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন করতে।

কিন্তু পদ্মনাভনের আসন্ন লক্ষণ দেখে বিচলিত হয়েছে বিলক্ষণ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মাহুতের আশায়। একমাত্র সেই পারবে এখুনি পাগলা হাতির পায়ে শেকল পরাতে।

ঠিক তখনি চোখে পড়ল ভয়াবহ দৃশ্যটা।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা ন্যাংটো কালো খোকা এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মনাভনের দিকে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল ফল, গুড় আর ভাতের সামনে। কচি হাতে খাবলা বসালো গুড়ের বারকোসে।

চঞ্চল হল পদ্মনাভনের শুঁড়।

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এ সময়ে হাতির সামনে যাওয়া যে বিপজ্জনক, সে খেয়ালও রইল না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ধেয়ে গেল পদ্মনাভনের সামনে। এবং একটুও না থেমে হেঁট হয়েই কৃষ্ণকায় শিশুটিকে মাটি থেকে তুলে নিয়েই ঠিকরে গেল সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণ কেঁপে উঠল পদ্মনাভনের বৃংহিত গর্জনে।

টনক নড়ল মাহুতের। গর্জন শুনেই বুঝেছে পাগলা হতে চলেছে পদ্মনাভন। এখুনি শুরু হবে তাণ্ডবলীলা দৌড়ে এল ভিড়ের মধ্যে থেকে। পদ্মনাভন যেই ইন্দ্রনাথের পেছনে তাড়া করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশে এসে প্রাণের পরোয়া না করে পায়ের শেকল টেনে নিয়ে লাগিয়ে দিল খোঁটায়।

আবার বৃংহিতগর্জন। রক্তচক্ষু পদ্মনাভনের সেই মূর্তি দেখেই নিমেষে খালি হয়ে গেল মন্দির প্রাঙ্গণ।

দাঁড়িয়ে রইল শুধু এক কৃষ্ণকায় নিগ্রো। প্রৌঢ়। দুই চোখে জল।

পরিচয় হল ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। শিশুটির পিতা সে। নাম, টিমাটু। কেরালার অনেক মন্দিরে এখনো অথর্ববেদের তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা আছে খবর পেয়ে এসেছিল সুদূর আফ্রিকা থেকে কিছু শিখে যেতে।

পেশায় সে ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান, ওঝা।

স্বপ্নায়ত চোখে ওবারজোহানের দিকে ফিরে তাকায় ইন্দ্রনাথ। বলে, আশ্চর্য! টিমাটুর কথাও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফাইলে উঠে গেছে?

বিজ্ঞের হাসি হাসল ওবারজোহান, ইয়েস, মিঃ রুদ্র। সব খবরই রাখতে হয় আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরকে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ার।

তা তো বটেই। দুশ বছর ধরে পদানত করে রাখার পরেও ইন্ডিয়াকে ভোলা সম্ভব হচ্ছে না বলেও রাখতে হয় নাড়িনক্ষত্রের খবর।—বিদ্রূপ ঝরে পড়ে ইন্দ্রনাথের গলায়।

ওবারজোহান যেন তা গায়ে মাখে না। বলে নিস্পৃহস্বরে, মিঃ রুদ্র, টিমাটু এখন রয়েছে এই গ্রামেই।

নিমেষে ঘাসের বিছানায় সটান উঠে বসে ইন্দ্রনাথ,—এই গ্রামে?

হ্যাঁ। আপনি এসেছেন খবর পেয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাইরে কেন? ভেতরে ডাকুন—বলে নিজেই ডাক দিল চড়া গলায়, টিমাটু!

সেকেন্ড কয়েক নীরবতা। খসখস শব্দ শোনা গেল বাইরে। ইন্দ্রনাথের উদগ্রীব চাহনি দরজার দিকে। ওবারজোহানও সকৌতুকে তাকিয়ে সেইদিকে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মাটির ওপর রাখা পাইপের দিকে।

অঘটনটা ঘটল ঠিক তক্ষুনি!

মাটির শয্যা ছেড়ে ভারী পাইপটা আপনা থেকেই ভেসে উঠল শূন্যে!

টিমাটুকে কেন দরকার ওবারজোহানের

মেঝেতে হাত বুলিয়ে পাইপ না পেয়ে চোখ নামিয়েছিল ওবারজোহান। পাইপ শূন্যে ভাসছে দেখেই ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল সেইদিকে।

ভাসমান পাইপ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তার ঠোঁটের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে অট্টহেসে উঠল ওবারজোহান, মিঃ রুদ্র, দেখুন আপনার টিমাটুর কাণ্ড!

চোখ ফিরিয়ে শূন্যে ভাসমান পাইপ দেখেই তো চক্ষু স্থির ইন্দ্রনাথের।

আর ঠিক তখনি শূন্যবিহার স্থগিত রেখে ঝপ করে পাইপটা আশ্রয় নিল ধরণীতে।

দোরগোড়া থেকে ভেসে এল স্খলিত কণ্ঠস্বর—ইউ? ইনদ্রোনাথ?

দরজায় দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ নিগ্রো। পরনে কৌপিন। খালি গা। মিশমিশে

কালো রঙ। মাথার চুল সব পেকে গেছে। মুখের চামড়া গোল হয়ে ঝুলছে।

টিমাটু!—সহর্ষ স্বর ইন্দ্রনাথের।

হোয়াই কাম?—সঙ্কুচিত চোখে শুধোয় টিমাটু।

যেন আকাশ থেকে পড়ে ইন্দ্রনাথ, খুশি নও তুমি আমি এসেছি বলে?

ইয়েজ। বাট হোয়াই হি?—ওবারজোহানের দিকে আঙুল তুলে দেখায় টিমাটু।—হি ওয়ান্ট ব্ল্যাক ম্যাজিক। তাই তো দেখালাম। আর নয়। গো হোম।

কেন টিমাটু? তোমার ম্যাজিক দেখতে বিলেত থেকে সাহেব এসেছেন, আমাকে টেনে এনেছেন ইন্ডিয়া থেকে—তোমার তাতে রাগ কেন?

চোখ পিট পিট করে চেয়ে রইল টিমাটু। জবাব দিল না।

দিল ওবারজোহান নিজেই, মিঃ রুদ্র, এইমাত্র যে ম্যাজিকটা দেখলেন, আধুনিক বিজ্ঞান এর নাম দিয়েছে টেলিকাইনেসিস। মনের শক্তি দিয়ে দূর থেকে যেকোন জিনিসকে নড়িয়ে-চড়িয়ে সরিয়ে রাখার নামই টেলিকাইনেসিস। আদিম অসভ্য মানুষদের মধ্যেই এ ক্ষমতা রয়ে গেছে আজও। টিমাটুর মধ্যে রয়েছে একটু বেশিমাত্রায়।

ইয়েজ। আই নো মেনি ব্ল্যাক ম্যাজিক—ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে টিমাটু।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—অমায়িক স্বর ওবারজোহানের, সেই জন্যেই ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে। এক সময়ে তোমার ছেলেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল—বলেছিলে না ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়ে উপকার ফিরিয়ে দেবে?

চোখ জ্বলে উঠল টিমাটুর, হোয়াই ইউ?

আমি?—ওবারজোহান যেন বিনয়ের অবতার, আরে আমিই যে জানি গুপ্তধনটা কোথায় আছে।

আমিও জানি,—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে টিমাটু।

তুমি জান?—এবার সত্যি সত্যিই অবাক হয় ওবারজোহান। শুধু অবাক হওয়া নয়—সন্দেহের কালো ঝিলিকও দেখা যায় দুই চোখে। কটা চোখে যেন বৈদূর্যমণির ঝলক দেখা যায়।

নির্নিমেষে তাকিয়ে বললে টিমাটু, নকশাটা কোথাও তাও জানি।

জান?—সোজা হয়ে গেল ওবারজোহানের শিরদাঁড়া।

ক্লান্তকণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, টিমাটু, আমিও জানি নকশাটা কোথায়। সন্দেহ আগেই হয়েছিল। টেলিকাইনেসিস দিয়ে পাইপটাকে যেই শূন্যে ভাসিয়ে দিলে—আর কোন সন্দেহই রইল না।

ক্রূর হাসল ওবারজোহান। পাইপটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে মোচড় দিতেই দুভাগ হয়ে গেল। যেদিক তামাক ঠাসা হয়, সেইদিকের অংশটা হাতে নিয়ে ভেতরকার রিংয়ের মত গোপন চেম্বার থেকে টেনে বার করল ভাঁজ করা একটা টিসু পেপার।

বললে থেমে থেমে—হ্যাঁ, এই সেই নকশা।

অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, আপনি কিন্তু বলেছিলেন পল সুপারম্যান চুরি করেছে নকশাটা।

ভাঁওতা দিয়েছিলাম—অম্লানবদনে বলে গেল ওবারজোহান, নইলে আপনাকে আনা যেত না। আপনাকে না আনলে টিমাটুকে পাওয়া যেত না। টিমাটুকে না পাওয়া গেলে গুপ্তধন উদ্ধারও সম্ভব নয়। কারণ, টিমাটু শুধু টেলিকাইনেসিসই জানে না—টেলিপ্যাথিও জানে—দেখলেন তো দূর থেকেই আমার মনের কথা জেনে নিয়ে ঠিক ধরে ফেলেছে নকশাটা কোথায় আছে। জানে আর একটা বিদ্যে। ইংরেজীতে যার নাম ডাওজিং—

ডাওজিং!

হ্যাঁ, মিঃ রুদ্র। ই-এস-পি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ জন্মগতভাবেই অত্যন্ত প্রখর টিমাটুর মধ্যে। যাকে বলে সাইকিক পাওয়ার। টিমাটুর তা আছে। পিটার হারকোসের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

রঙের মিস্ত্রি? দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পাওয়ার পর থেকেই ই-এস-পি ক্ষমতা পেয়েছিল যে?

হ্যাঁ। বিশ্বের তাবড় বৈজ্ঞানিকরা হতভম্ব হয়েছে তার কাণ্ডকারখানা দেখে। মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সে বলে দিত মাটির তলায় কোথায় সোনা আছে, কোথায় তামা আছে, কোথায় কয়লা আছে। মিঃ রুদ্র, টিমাটুও জানে সেই বিদ্যে। হাতিদের কবরখানায় ও এক চক্কর ঘুরে এসেই বলে দেবে ঠিক কোথায় কাদা আর হাতিদের কঙ্কালের তলায় লুকোনো আছে ভাইকিংদের গুপ্তধন।

আপনার নকশায়—

নকশায় শুধু বলা আছে, গুপ্তধন আছে হাতিদের কবরখানায়। যুগ যুগ ধরে হাতিরা যেখানে গিয়ে দেহ রাখে—সেইখানে। কিন্তু সে তো বিরাট অঞ্চল। জল, কাদা, পাঁক আর হাতিদের দেহাবশেষে ভর্তি। সারা জন্ম খোঁজ করলেও গুপ্তধন উদ্ধার সম্ভব হবে না। হবে যদি টিমাটু যায় সঙ্গে।

ধীরে ধীরে টিমাটুর দিকে তাকায় ইন্দ্রনাথ। দুই চোখে নীরব প্রশ্ন।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে কালো মহাদেশের কালো মানুষটার। কঠিন চক্ষু তারকায় কঠোর সঙ্কল্পের আভাস।

রুদ্রকণ্ঠে বললে শুধু একটি শব্দ, নো।

মুখোস খুলে গেল ওবারজোহানের

ইব্রাহিম—হাঁক দিলে ওবারজোহান।

দরজায় আবির্ভূত হল ইব্রাহিম। চোখে ত্রস্ত চাহনি।

কঠিন স্বরে বলল ওবারজোহান, বিশজন কুলি তোমার নিজের লোক?

ইয়েস স্যার।

প্রত্যেকে জানে কি জন্যে মোটা মাইনে দিয়ে তাদের এখানে আনা হয়েছে?

ইয়েস স্যার।

কি জন্যে, সেটা একবার এদের শুনিয়ে দাও।

ইন্দ্রনাথের দিকে জুল জুল করে তাকাল ইব্রাহিম, ওঁকে চোখে চোখে রাখা। আপনার কথা না শুনলেই খতম করে দেওয়া।

রাইট—হৃষ্টস্বর ওবারজোহান, এখন থেকে আরও একজনকে রাখতে হবে চোখে চোখে—এই টিমাটুকে। কথা না শুনলেই খতম করে দেবে। বন্দুক আছে তো সবার কাছে?

সাদা দাঁতের ঝলক দেখিয়ে বললে ইব্রাহিম, নিশ্চয়। লেক চাডে বন্দুক ছাড়া কেউ আসে? জলে কুমীর আর জলহস্তী—ডাঙায় হাতির পাল।

টিমাটু ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান। বন্দুকের গুলি দিয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক ঠাণ্ডা করে দিতে পারবে?

কত করেছি,—অবহেলাভরে বললে ইব্রাহিম।

ঠিক আছে। তৈরি থাক।—হাতের ইশারায় ইব্রাহিমকে বাইরে যেতে বলে ওবারজোহান।

ঘরে এখন শুধু তিনজন। ওবারজোহান, ইন্দ্রনাথ আর টিমাটু।

বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে ওবারজোহান, টিমাটু, কি করবে এখন? গুপ্তধন যদি খুঁজে না দাও, খতম হয়ে যাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র—সেই সঙ্গে তুমি।

ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রাখে টিমাটু। অঙ্গার জ্বলছে দুই চোখে।

কিন্তু পরম পরিতৃপ্তের সুরে বললে ইন্দ্রনাথ, রাজী হয়ে যাও টিমাটু। খামোকা প্রাণ খুইয়ে লাভ নেই। জল কাদা পাঁকের তলায় কোথায় পড়ে আছে কুবেরের সম্পদ—বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। সেই টাকায় কত গরীব মানুষের উপকার হবে জান?

টিমাটুর ভয়ঙ্কর চাহনি কিন্তু প্রশান্ত হল না ইন্দ্রনাথের অভয় বচনে।

বললে রূঢ় স্বরে, ইউ কাওয়ার্ড। বাট ফর ইউ—

রাজী,—সোল্লাসে বললে ইন্দ্রনাথ।

ওবারজোহান হাসল। সেই জানোয়ারি হাসি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি, কি ঘটনা ঘটতে চলেছে এরপর।

শূন্যে উড়ল করাল কুমীর

কেন যে এতটা পথ ইব্রাহিম তার দলবল নিয়ে ইন্দ্রনাথ আর ওবারজোহানকে ঘিরে রেখে দিয়েছিল, এবার নিশ্চয় আর তা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অস্পষ্ট নয়।

কিংঘাবা গ্রাম থেকে বেরিয়েও ঘটল সেই একই কাণ্ড—এবার আরও প্রকটভাবে। ওবারজোহানের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট, তখন আর লুকো-ছাপার ধার দিয়েও কেউ যাচ্ছে না। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে জিঘাংসা বেশ বিকটভাবেই ফুটে উঠেছে। বন্দুক হাতে তৈরি প্রতিটি ওবারজোহান-স্যাঙাত—লক্ষ্য শুধু ইন্দ্রনাথ

আর টিমাটু।

রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছে ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে। কেড়ে নিয়েছে ইব্রাহিম স্বয়ং। টিমাটু ভেবেছিল, শরীরী বজ্রের মত ইন্দ্রনাথ রুদ্র বাধা দেবে।

কিন্তু কোন বাধাই দেয়নি ইন্দ্রনাথ।

উল্টে ভারি মোলায়েম হেসে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিল ইব্রাহিমের হাতে।

বলেছিল, বাপু হে কুমীর-টুমীর তেড়ে এলে প্রাণটা বাঁচানোর ভার এখন থেকে তোমার ওপরেই। কেমন?

অট্টহেসে জবাব দিয়েছিল ওবারজোহান, সে ভাবনা আমার, মিঃ রুদ্র। তবে কি জানেন, লেক চাড অঞ্চলের কুমীর আর জলহস্তীরা মানুষ দেখলে বরং সরে পড়ে—তেড়ে আসে না।

তাই নাকি?—চোখ কপালে তুলে সেকী বিস্ময় প্রকাশ ইন্দ্রনাথের।—মানুষের মাংস বুঝি ভালবাসে না লেক চাডের কুমীররা?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল ওবারজোহান, কে জানে? গবেষণা করলে অন্তত জবাবটা দেওয়া যেত। তবে এর আগে লেক চাডে হাতি শিকারে যারা এসেছিল—তারাই দেখেছে মানুষকে ভয় পায় এখানকার কুমীর।

কিংঘাবা গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রথম প্রথম সেইরকমটাই ঘটেছিল অবশ্য। আবার মাথার চাইতেও উঁচু ঘাস, গলা পর্যন্ত জল ঠেলে এগোতে হয়েছে। দিনকয়েক এইভাবে যাওয়ার পর সামান্য একফালি উঁচু জমির পরেই পড়ল একটা লেক।

কিংঘাবা গ্রাম থেকে দুটো ঘোড়া জোগাড় করেছিল ওবারজোহান। একটা নিজের জন্যে, আর একটা ইন্দ্রনাথের জন্যে। ঘাস জঙ্গল পেরিয়ে এসেছে এই ঘোড়ায় চেপেই। লেকের পাড়ে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল কাতারে কাতারে কুমীর জলহস্তী দেখে।

ভয় পেলেন নাকি?—পাশের ঘোড়ায় বসে বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

ওবারজোহান যেন শুনেও শুনতে পায়নি প্রশ্নটা। অন্যমনস্ক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ভাসমান জলহস্তীদের পিঠ আর কুমীরের নাক আর চোখের দিকে।

তারপর ডাক দিল টিমাটুকে, ডাওজিংয়ের প্রথম পরীক্ষাটা হয়ে যাক এখুনি। বল তো লেকের জল কতটা গভীর? ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যাবে?

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে জবাব দিয়েছিল টিমাটু, কুমীরের পেটে যা তুই!

তৎক্ষণাৎ চাবুক কষিয়েছিল ওবারজোহান, রক্তরেখা ফুটে উঠেছিল টিমাটুর নগ্ন বুকে।

এবং পরক্ষণেই ওবারজোহানের হাত থেকে চাবুক ঠিকরে গিয়েছিল শূন্যে। কে যেন অদৃশ্য হাতে চাবুকটা কেড়ে নিয়েছিল তার হাত থেকে!

বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে চাবুক গিয়ে পড়ল লেকের জলে।

টেলিকাইনেসিস! দাঁত কিড়মিড় করে বন্দুক তুলেছিল ওবারজোহান।—শয়তানের বাচ্চা! আমার ওপর টেলিকাইনেসিস।

আহা ! আহা ! করছেন কী ?—শশব্যস্তে বলেছিল ইন্দ্রনাথ—টিমাটু অক্কা পেলে গুপ্তধন তো পাবেন না ।

কটমট করে কটা চোখে তাকিয়ে বলেছিল ওবারজোহান, স্কাউন্ড্রেল !

মিটিমিটি হেসে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, কে স্কাউন্ড্রেল মিঃ ওবারজোহান ? আপনি ? আমি ? না টিমাটু ?

গর্জে উঠেছিল ওবারজোহান, আপনার দোস্তকে বলুন ঘোড়া নিয়ে লেক পেরোতে পারব কিনা বলে দিক !

টিমাটু,—সঙ্গে সঙ্গে টিমাটুর দিকে ফিরে অমায়িকস্বরে বলেছিল ইন্দ্রনাথ, বুড়ো বয়সে ভীমরতি গেল্ না তোমার ? পড়েছ মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে । বলেই দাও না বাপু জল কতটা গভীর ।

চাবুকের জ্বালায় হোক কি মনের জ্বালায় হোক টিমাটুর দুচোখ তখন করমচার মত লাল । দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিল, ইউ কাওয়ার্ড !

সে তো সবাই জানে—গালাগাল খেয়ে যেন বেশ খুশিই হয়েছিল ইন্দ্রনাথ, আমি কাওয়ার্ড না হলে ওবারজোহান এতদূর আসতে পারে ? এবার বল তো ঘোড়া নিয়ে নামবো কিনা ?

গো । নো ফিয়ার ।

ব্যাস ! এই তো হয়ে গেল । চলুন মিঃ ওবারজোহান । রায় দিয়েছে টিমাটু—ঘোড়া নিয়ে নামা যাবে ।

বিপদটা ঘটল জলে নামার পরেই ।

জলহস্তীগুলো বিরক্ত হয়েই দূরে সরে গেছিল । এমন কি কুমীরগুলো পর্যন্ত উৎপাত এড়িয়ে চম্পট দিচ্ছিল ।

যায়নি কেবল একটা কুমীরছানা । ওবারজোহানের ঘোড়া গিয়ে পড়ল তার কাছেই, কুমীরছানা নিশ্চিন্ত মনে জলে ভাসছে দেখে যেই তার ল্যাজটা ধরে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে...

জল তোলপাড় করে নক্ষত্র বেগে ধেয়ে এল একটা বিশাল কুমীর ওবারজোহানের দিকে । কুমীর ছানার মা নিঃসন্দেহে ।

এত তাড়াতাড়ি এল যে কাঁধের রাইফেল হাতে নেওয়ারও তখন সময় নেই । টিমাটুকে ডাকবারও উপায় নেই—

কারণ টিমাটু এগিয়ে গেছে সামনে—একগলা জলে কুলি পরিবৃত হয়ে এগোচ্ছে লেকের অপর পারের দিকে ।

নির্ঘাৎ মৃত্যু সামনে দেখে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছিল ওবারজোহান ।

অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তেই । জল ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল বিশাল কুমীর । পাকসাট খেতে খেতে ঠিকরে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে । জলে পড়েই সাঁ-সাঁ করে দে চম্পট ! দে চম্পট !

হতভম্ব হয়ে শুধু চেয়ে রইল ওবারজোহান ।

হতভম্ব না হয়ে উপায় কী ? টিমাটু তো অনেক সামনে । সে দেখতেও পায়নি

এইমাত্র কি ঘটে গেল তার পেছনে !

কুমীর মহোদয়কে তাহলে শূন্যে ডিগবাজি খাওয়াল কে ?

বাচ্চা হাতির বিপদ

লেক পেরিয়েই কিংঘাবা গ্রাম। ওবারজোহানের হেডকোয়ার্টার্স।

এখান থেকে শুরু হল লেক চাড অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। হাতিদের পাল যেখানে বারো মাস টহল দিয়ে দেয়—সেই এলাকা।

বন জঙ্গলের বর্ণনা টেনে লম্বা করার দরকার নেই। ছোট্ট একটা ঘটনা কেবল নিবেদন করা যাক—এই রহস্য কাহিনীর রহস্যকে ঘনীভূত করার মূলে তার অবদান একটু আছে বইকি।

কিংঘাবা গ্রাম থেকে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে সপারিষদ ওবারজোহান বেরিয়েছিল হাতিদের কবরখানার উদ্দেশে। দিনকয়েক দিনে হেঁটে আর রাতে জিরিয়ে অব্যাহত রইল অভিযান। দিনের বেলায় হাতিরা বড় একটা বেরোয় না—তখন তাদের জিরোনোর সময়। রাতে শুরু হয় জঙ্গল পরিক্রমা। তাই রাত হলেই সদলবলে ওবারজোহান আস্তানা নেয় ফাঁকা জায়গায়। চারদিকে জ্বলে আগুনের বেড়া। সারা গায়ে মশা তাড়ানো মলম মেখে রাত কাটায় ওবারজোহান আর ইন্দ্রনাথ। লেক চাডের মশা জগদ্বিখ্যাত। পয়লা নম্বর রক্তচোষা। যেমন তাদের হাঁকডাক—তেমনি তাদের দলবদ্ধতা। তেড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কুলিরা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়েও রেহাই পায় না।

এই রকম একটা চাঁদনি রাতে একটা লেকের পাড়ে রাত কাটাচ্ছে সকলে। লেক চাডের অসংখ্য লেকের অন্যতম এটি।

মাঝ রাতে ইন্দ্রনাথকে ঠেলে তুলল ওবারজোহান।

ধড়মড়িয়ে উঠে বলল ইন্দ্রনাথ, কি হল ?

উত্তরে রাতের প্রহরী কুলিটাকে শুধোল ওবারজোহান, কোনখানে ?

আঙুল তুলে দেখাল কুলি, ঐ ঐখানে।

কি আছে ওখানে ?—ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

চেঁচাবেন না—চাপা গলায় বললে ওবারজোহান—আপনাকে বলেছিলাম না হাতিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে ?

বলেছিলেন বটে।

এখান থেকে মাইলখানেক দূরে প্রায় দুশ হাতির একটা দল নেমেছে জলে।

বেশ ?

চলুন যাই চুপিচুপি।

তারপর ?

লেক চাডে আগে যারা এসেছিল, তাদের মুখে শুনেছি, চাঁদনি রাতে হাওয়ার মত নাকি হাতির দল শূন্যে মিলিয়ে যায়। দেখাই যাক না গল্পটা সত্যি না মিথ্যে।

লাফিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ, চলুন।

কথাবার্তা শুনে উঠে পড়েছিল ইব্রাহিম, বলল, আই গো।

এস,—বলে রাইফেল তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল ওবারজোহান। রাইফেল রইল ইব্রাহিমের কাছেও। নিরস্ত্র কেবল ইন্দ্রনাথ।

চাঁদের আলোয় জঙ্গল ঝলমল করছে। লেকের পাড় বরাবর এগিয়ে গেল তিনজনে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল হাতির পালকে।

কালো কালো টিলা যেন। এক-একটার ওজন কম সে কম·দু-টন। সংখ্যায় প্রায় দু-শ। লেকের জল তোলপাড় করছে। শুঁড়ে করে জল নিয়ে ছিটোচ্ছে। চাঁদনি রাতে খেলায় মেতেছে।

একটা বাচ্চা হাতি কেবল দাঁড়িয়ে লেকের পাড়ে।

দূর থেকে এই দৃশ্য দেখেই ওবারজোহান বললে, আর এগোনো ঠিক হবে না, মিঃ রুদ্র। গাছে উঠে বসে দেখা যাক অলৌকিক কাণ্ড-টাণ্ড আদৌ ঘটে কিনা।

উঠুন—বলে সামনের গাছটায় উঠতে লাগল ইন্দ্রনাথ। পেছন পেছন ইব্রাহিম আর ওবারজোহান।

একটা বড় ডালে তিনজনে উঠে পাতা সরিয়ে লেকের দিকে তাকিয়ে দেখলে দুশ হাতির একটাকেও দেখা যাচ্ছে না!

যেন ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে নিঃশব্দে!

স্তম্ভিতের মত চেয়ে রইল ওবারজোহান, আশ্চর্য! গল্প নয়, তাহলে সত্যি!

মৃদু হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, হাওয়ায় গন্ধ পেয়েই সটকান দিয়েছে নিশ্চয়।

এত তাড়াতাড়ি? এতটুকু শব্দ না করে?—ওবারজোহানের চোখ জোড়া যেন কপাল থেকে আর নামতেই চায় না।

টিটকিরি না দিয়ে পারেনি ইন্দ্রনাথ, আপনিই তো বলেছিলেন, হাতিদের বুদ্ধি অসাধারণ—হাজার হাজার বছর ধরেও হাতিদের কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

ঢোক গিলে বললে ওবারজোহান, তাই তো দেখছি।

ইন্দ্রনাথ বললে, যাইহোক, যার টাকা নিয়ে অভিযানে নিয়ে এসেছেন, তার কাজ এবার কিছুটা করুন।

তার মানে?

বাচ্চা হাতিটা এখনও পাড়ে দাঁড়িয়ে। ঐটাকে ধরে নিয়ে যান।

উজ্জ্বল হল ওবারজোহানের দুই চক্ষু, ঠিক বলেছেন।

বলেই সড় সড় করে নেমে গেল গাছ থেকে। নেমে এল ইব্রাহিম আর ইন্দ্রনাথ। ওবারজোহান ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ছুটছে। পৌঁছে গেছে বাচ্চা হাতির পাশে। শুঁড় ধরে টানছে হেঁইও হেঁইও করে।

কী আশ্চর্য! বাচ্চা হাতিটাও খেলা জুড়ে দিয়েছে ওবারজোহানের সঙ্গে, গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে ওবারজোহানের।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সামনে। বললে, কী ব্যাপার? এত ঝট করে পোষ মেনে গেল কেন বুঝলাম না তো?

একগাল হেসে ওবারজোহান বললে, স্বভাবের দিক দিয়ে বাচ্চা হাতি মানুষের খোকাখুকুদের মতই। মা কাছে না থাকলে যার কাছে আদর পায় তাকেই নিজের লোক ভেবে নেয়। হেই...হ্যাট...হ্যাট!

জঙ্গল কাঁপান ভয়াবহ বৃংহিতধ্বনিটা শোনা গেল ঠিক সেই মুহূর্তে।

মূর্তিমান যমদূতের মত জঙ্গলের ভেতর থেকে আবির্ভূত হয়েছে বাচ্চা হাতির মা। চলন্ত পাহাড়ের মত মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে এদিকে।

পালান!—একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই ভোঁ দৌড় দিল ওবারজোহান। পেছন পেছন ইন্দ্রনাথ আর ইব্রাহিম।

পর পর কয়েকটা রক্ত জল করা বৃংহিতধ্বনি শোনা গেল পেছনে—সেই সঙ্গে বাচ্চা হাতির ডাক—বোধহয় সোল্লাসে ডাকছে মা-কে।

তারপরেই ভয়ানক গর্জন শুনে থমকে গেল তিনজনেই।

ঘাড় ফিরিয়েই দেখল সেই রক্ত জমান দৃশ্য!

বাচ্চা হাতিটার গায়ে শুঁড় বুলোচ্ছে মা হাতি। পরক্ষণেই তিনজনের শিহরিত চোখের সামনেই নিজের বাচ্চাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে আছাড় মারল মা হাতি।

শুধু ফেলেই ক্ষান্ত হল না। নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ খান খান করে দিয়ে, স্তব্ধ বনভূমিকে প্রকম্পিত করে, মুহুর্মুহু গর্জন করে, বিশাল পা দিয়ে থেঁৎলে পিণ্ডি পাকিয়ে দিল নিজের বাচ্চাকে!

থ হয়ে দাঁড়িয়ে তিনজনে। এ কী অসম্ভব কাণ্ড! নিজের বাচ্চাকে—

সম্বিৎ ফিরে এল ভয়াল মা হাতির পরবর্তী উদ্দেশ্য দেখে।

শুঁড় বাড়িয়ে ধরেছে তিনজনের দিকে।

এবং সহসা নক্ষত্র বেগে ধাবিত হয়েছে তাদের দিকে।

আরও কি দাঁড়ায় ত্রিমূর্তি? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল লেকের পার বরাবর। সবার আগে দৌড়োতে দেখা গেল তালঢাঙা ওবারজোহানকে। হাতের রাইফেল ঠিকরে পড়েছে কোন কালে। পেছন পেছন দৌড়োতে দৌড়োতে সেই রাইফেল কুড়িয়ে নিয়েছে ইন্দ্রনাথ।

এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছে ধাবমান পাহাড়ের মত রুদ্রানী হস্তিনীর সামনে। পাশেই ইব্রাহিম। রুখে দাঁড়িয়েছে সে-ও। দুজনেরই রাইফেল উদ্যত ভয়ঙ্করী মা-হাতির দিকে।

কিন্তু ট্রিগার টেপবার আগেই...

আচম্বিতে থমকে দাঁড়াল করাল হস্তিনী।

আর তারপরেই পুরো দেহটা আস্তে আস্তে ভেসে উঠল শূন্যে। হাল্কা বেলুনের মত ভেসে গেল লেকের দিকে। বিপুল শক্তিধর একজোড়া অদৃশ্য হাত তাকে যেন অবহেলা ভরে নামিয়ে দিল লেকের জলে!

সে রাতের ঘটনা কোনদিনই ভুলবে না ওবারজোহান।

ব্যাখ্যাও করতে পারবে না কোন শক্তিধর শেষ মুহূর্তে দু-টন ওজনের অত বড় হাতিটাকে গ্যাস ভর্তি বেলুনের মত শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছিল লেকের জলে।

শঙ্কাশিহরের কারণ আছে আরও একটা। আগের অভিজ্ঞতার অব্যাখ্যাত বিভীষিকা।

তেড়ে আসা কুমীরটাই বা ঐভাবে কেন ঠিকরে গেল শূন্য পথে?

হাতি আর কুমীর—দুই ক্ষেত্রেই টেলিকাইনেসিসের ভেলকি দেখায়নি টিমাটু। তবে কার অপার্থিব শক্তি দেখা গেল পর পর দুবার?

একটা রহস্যের ব্যাখ্যাই কেবল বাগাড়ম্বর করে শুনিয়েছে ইন্দ্রনাথকে।

ইন্দ্রনাথ নিতান্ত অজ্ঞের মতই জানতে চেয়েছিল—হ্যাঁ, মশাই, মা কখনো নিজের বাচ্চাকে ঐ রকম নৃশংসভাবে মারে? কারণটা বলতে পারেন?

হ্যা-হ্যা করে হেসে বিজ্ঞের মত বলছিল ওবারজোহান, নিশ্চয় পারি।

তাহলে বলুন দয়া করে।

জঙ্গলের হাতিরা মানুষের গন্ধ একদম সইতে পারে না।

কিন্তু বাচ্চাটা কি দোষ করল?

আহা, আমার গায়ের গন্ধ যে বাচ্চার গায়ে লেগেছিল।

তাই বলে—

আবার সেই গা-জ্বলানো হেঁ-হেঁ হাসি হেসে বলেছিল ওবারজোহান, এই জন্যেই তো বলেছিলাম, হাজার হাজার বছর ধরেও হাতিদের কেউ বুঝে উঠল না। অপত্যস্নেহও নিমেষে উবে যায় বাচ্চার গায়ে মানুষের গন্ধ পেলে। তখন বিষম আক্রোশে নিধন করে তাকে। অথচ পোষ মানলে এই হাতিই আবার মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচায়—এমন কি মানুষের বাচ্চাকেও।

মানুষের বাচ্চাকেও?—বিমূঢ় স্বর ইন্দ্রনাথের।

চোখ নামিয়ে বলেছিল ওবারজোহান, মিঃ বীরবিক্রম ডিটেকটিভ, শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে টিমাটুর ছেলেটাকে আপনি কি বাঁচাতে পারতেন যদি না পদ্মনাভন মানুষের খোকা বলেই শুঁড়টা তুলে দ্বিধায় না পড়ত?

তা ঠিক। এ সম্ভাবনাটা পরেও ভেবেছে ইন্দ্রনাথ। পদ্মনাভনের বড় ভূমিকা ছিল এ ব্যাপারে। মানুষ শিশুদের বড় ভালবাসত। মত্ততা আসার পূর্ব মুহূর্তেও তাই দ্বিধায় পড়েছিল পায়ের গোড়ায় টিমাটুর কালো খোকাকে দেখে!

এসে গেছে কবরখানা। হাতিদের কবরখানা।

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জল আর কাদা। পাঁক আর নলখাগড়ার বন। যেদিকে দু চোখ যায়, কেবল এই দৃশ্য।

লেক চাডা অঞ্চলের মূল তিনটে নদী শারি, লোগোনি আর কামাডুগা ইয়োবের একটি বয়ে গেছে এই বাদা বনের কিছু দূর দিয়ে। নাম তার—লোগোনি। শাখা-প্রশাখা দিয়ে বর্ষার জল এসে পড়ে বাদায়। গ্রীষ্মে আসে না। তখন আর কাদায় থক থকে হয়ে ওঠে নলখাগড়া বন।

শনির বাহন শকুনি ছাড়া এখানে নেই কোন বিহঙ্গ। আছে অজস্র কীটপতঙ্গ। আর বিকট দুর্গন্ধ।

সুদূর অতীতে এই লোগোনি নদী পথেই ভাইকিংদের জাহাজ এসেছিল বাদার অনতিদূরে। তারপর বোধহয় বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা শাখাপ্রশাখায় নৌকো চালিয়ে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য এনে রেখেছিল হাতিদের কবরখানায়।

যুগ যুগ ধরে তা লোক মুখে প্রবাদ কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইকিংরা আর ফিরে আসেনি। হাতিদের কঙ্কাল আর দেহাবশেষের কথাও কেই অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

হাতিরাই রক্ষা করে এসেছে বিপুল সম্পদ। কিন্তু কোথায় তা আছে—ঠিক কোন জায়গাটিতে আজও কাদায় তলিয়ে রয়েছে—কেউ তা জানে না...কেউ না।

ধুরন্ধর ওবরজোহান তাই প্ল্যান করেছে ইংল্যান্ডে বসেই। খোঁজ খবর নিয়েছে। স্কটল্যান্ডের ইয়ার্ডের গোপন ফাইল দেখেছে। টেলিকাইনেসিস আর ডাওজিং জানা একজনের খোঁজ পেয়েছে। সেই একজনকে রাজী করানোর জন্যে কৌশলে ইন্দ্রনাথকে আফ্রিকায় এনে ফেলেছে।

দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা এতদিনে সফল হতে চলেছে।

এই সেই কবরখানা। হাতিদের শেষ শয্যার ক্ষেত্র।

মিঃ রুদ্র—হুমকি দিয়ে বললে ওবারজোহান, এইবার খেল দেখান আপনার।

যথা ?—মুগ্ধ বিস্ময়ে ধু-ধু জলাভূমির দিকে তাকিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ।

হাঁ করে কি অত দেখছেন ?—ধমকে ওঠে ওবারজোহান, যুগ যুগ ধরে হাতিরা এসেছে মরবার সময় হলেই—অদ্ভুত ওদের ক্ষমতা। মানুষদের মত যেখানে সেখানে কাঁধে চেপে গোরস্থানে যায় না। অত দেখবার কি আছে ?

ফিসফিস করে বললে ইন্দ্রনাথ, দেখছি না, টের পাচ্ছি।

কি টের পাচ্ছেন ?—কাঁধের রাইফেল হাতে নেয় ওবারজোহান, সঙ্কুচিত চোখে সন্দেহের রোশনাই।

মৃত্যুর হাতছানি।

মানে ?

মানে, এ জায়গা মরণের জায়গা—জীবনের নয়। এখানে সবাই আসে সব কিছু রেখে যেতে—নিয়ে যেতে নয়।

কাব্য রাখুন—কড়া গলা ওবারজোহানের, টিমাটু রাস্কেলটাকে বলুন বাদায় নেমে পড়তে—দেখি ওর ডাওজিংয়ের ভেলকি।

ভেলকি ?—পরম বিস্ময়ে ওবারজোহানের দিকে তাকায় ইন্দ্রনাথ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। —বিদ্রূপে শাণিত ওবারজোহানের স্বর।

কি ভেলকি দেখতে চান ?

ন্যাকামি রাখুন। টিমাটুকে বলুন—

টিমাটুকে কেন, ঠিক লোককেই বলব। যে ভেলকি কখনো দেখেননি, সেই ভেলকিই দেখাব।

তাই নাকি ? তাই নাকি ? কি ভেলকি আমি কখনো দেখিনি জানতে পারি কি ?

জানবার জন্যেই তো আপনাকে এতদূরে নিয়ে এলাম। এ ভেলকির নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ভেলকি।

স্টপ ননসেন্স। হেনরিক ওবারজোহানকে দেখাবেন আপনার ভেলকি ?

হেনরিক ওবারজোহান ! আপনি ?

থমকে গেল ওবারজোহান। দু চোখে বাঘের দৃষ্টি।

ইন্দ্রনাথের স্বপ্নালু চোখে কিন্তু সুদূরের চাহনি, মিঃ পল সুপারম্যান, আসল হেনরিক ওবারজোহান ঐ দেখুন আসছেন।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই থ হয়ে গেল ওবারজোহান...

জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে অবিকল আর একজন ওবারজোহান।

না, অবিকল নয়—একটু তফাত আছে। এই ওবারজোহানের মত এত লম্বা নয়, এত রোগা নয়, এত পেটাই চেহারা নয়। হাইট মাঝারি—চাপদাড়িটা অবশ্য আছে।

পেছন পেছন আসছে আর একটি মূর্তি। কৃষ্ণকায় নিগ্রো। কিশোর। যেন কালো পাথর কুঁদে গড়া আকৃতি।

রাইফেল তুলল এই ওবারজোহান। অথবা ইন্দ্রনাথ যাকে পল সুপারম্যান নামে সম্বোধন করল, সেই ব্যক্তি।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল কালো নিগ্রো তনয়। শার্দুলের মত জ্বলে উঠল দুই চোখ।

পরক্ষণেই ঘটল সেই অভাবনীয় কাণ্ড।

রাইফেল ছিটকে গেল পল সুপারম্যানের হাত থেকে—শূন্যে উড়ে গিয়ে পড়ল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা ওবারজোহানের পায়ের কাছে—সেই সঙ্গে গাল থেকে খসে হাওয়ায় উড়ে গেল নকল চাপদাড়ি।

বিহ্বল পল সুপারম্যান কানের কাছে শুনতে পেল টিমাটুর উল্লসিত চিৎকার, সাবাস বেটা ! বাপকা বেটা !

বাপকা বেটা। —স্খলিত স্বর পল সুপারম্যানের। দাড়ি খসে যাওয়ায় উঁচু হনু আর চোয়াড়ে চোয়াল এখন সুস্পষ্ট।

ইয়েস মিঃ পল সুপারম্যান, টিমাটুর সেই ছেলে—যাকে ইন্দ্রনাথ রুদ্র প্রাণে বাঁচিয়েছিল পদ্মনাভনের শুঁড়ের তলা থেকে।

টিমাটুর ছেলে !

কোমাগো। ওর নাম কোমাগো। বাপের সব গুণই পেয়েছে। একটু বেশি

মাত্রায়। বংশগতি একেই বলে !

কোমাগো !—প্রায় খাবি খেতে খেতে বলে পল সুপারম্যান।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানে কালা নাকি ?—ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলে ইন্দ্রনাথ, ওর কাছে ঋণী আপনি দুটো কারণে।

আমি ?

নিশ্চয়। কুমীরকে শূন্যে তুলে আছাড় মেরেছিল কে ? মা-হাতিকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে জলে ফেলেছিল কে ? ঐ কোমাগো !

কোমাগো ! কোথায় ছিল ?

কোথায় আবার—আমাদের পেছন পেছন আসছিল—

কিন্তু আমি তো—

দেখতে পাননি ? কেমন ? দেখিয়ে দেখিয়ে তো আসেনি—আসল হেনরিক ওবারজোহান যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে—কোমাগোও তেমনি—

ইব্রাহিম !—অকস্মাৎ গর্জে ওঠে পল সুপারম্যান, চালাও গুলি !

বাইশজন কুলি সমেত ইব্রাহিম বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশেই। হুকুম শুনেই বন্দুক তুলে টিপ করল বটে...

তবে পল সুপারম্যানের দিকে !

জলদগম্ভীর স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, পল সুপারম্যান, এই হল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের ভেলকি ! এরা সবাই ইন্দ্রনাথ রুদ্রের দলে—এমনকি আমিও।

আপনি !

হ্যাঁ। আমিও তো জাল আদমি—জালিয়াতির সঙ্গে জালিয়াতিই করে এসেছি এতদিন। এতদিনে শেষ হল আমার অভিনয়।

আ-আপনি তাহলে কে ?

আমি ? আমার নাম ভবশঙ্কর মল্লিক। ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একই রকম দেখতে দুজনকে। তাই যেদিন ইন্দ্রনাথ ধরে ফেলেছিল আপনি জাল ওবারজোহান সেজে এসেছেন, সেইদিনই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেছিল আমাকে দিয়ে।

আ-আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আসলে ভেলকি এই রকমই হয়, মিঃ পল সুপারম্যান। জালিয়াতিতে আপনি যত সিদ্ধহস্তই হোন না কেন, ইন্দ্রনাথের কাছে আপনি শিশু। ছদ্মবেশে আর অভিনয়ে আপনি যত বিখ্যাতই হোন না কেন—ইন্দ্রনাথের কাছে এখনও আপনি শিক্ষানবীশ। ফুঃ, মিঃ পল সুপারম্যান, কার কাছে খাপ খুলতে এসেছিলেন আপনি—এ যে পলাশীর প্রান্তর !

শেষ লাইনটা অবশ্য পরিষ্কার বাংলাতেই বলল ভবশঙ্কর মল্লিক।

হোয়াট ? হোয়াট ডু ইউ সে ?

বললাম যে আপনি একটা প্রকাণ্ড গর্দভ ! ইন্দ্রনাথ আপনাকে কখন চিনেছিল জানেন ? সেই প্রথম দিনেই—যেদিন আপনি ওর বেলেঘাটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে

ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিলেন। মনে পড়ে? একটা ন্যাংটো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল? কাঠের গুলিটা আচমকা আপনার গালে এসে লেগেছিল? নকল দাড়ি খসে গেছিল সেই মুহূর্তে। খপ করে দাড়ি খামচে ধরে আপনি তীরবেগে ট্যাক্সিতে বসে পালিয়েছিলেন। পেছন থেকে দাড়ি খসে যাওয়ার দৃশ্যটা না দেখতে পেলেও সন্দেহ হয়েছিল ইন্দ্রনাথের। ছেলেটাকে পরে জিজ্ঞেস করতেই ফাঁস হয়ে গেছিল আপনার নকল দাড়ির রহস্য।

কথা নেই পল সুপারম্যানের মুখে। ঝুলে পড়েছে চোয়াল।

মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললে ভবশঙ্কর মল্লিক, তারপরের কয়েকদিন ইন্দ্রনাথের টিকি দেখতে পাননি। কোথায় গেছিল এখন নিশ্চয় আঁচ করতে পারছেন? আপনার মাতৃভূমিতে—ইংল্যান্ডে। জীবন্ত জন্তু-সংগ্রাহক হেনরিক ওবারজোহানের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে নিয়েই ফিরেছে ইন্দ্রনাথ। তাকে নিয়েই গেছে—নাইজিরিয়ায়। লোকজন যা কিছু জুটিয়েছেন মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে—সবই ইন্দ্রনাথের লোক—এই এরা—দু হাত ঘুরিয়ে বাইশজন কুলিকে দেখায় ভবশঙ্কর। বাইশটা বন্দুক উদ্যত পল সুপারম্যানের বুকের দিকে।

তা সত্ত্বেও এবার সাপের মতই গর্জে ওঠে পল সুপারম্যান, ইব্রাহিম! তুমিও?

ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলে ভবশঙ্কর, আহা! ওকে ধমকাচ্ছেন কেন? ওর নামের আগে যে অক্ষর আছে, ইন্দ্রনাথের নমের আগেও সেই অক্ষর রয়েছে। আগেই তো বোঝা উচিত ছিল আপনার।

মা-মা-মানে!

ইব্রাহিম, খোলস ছাড়!

ভবশঙ্করের মুখের কথা খসতে না খসতেই সত্যিই যেন ভেলকি দেখল পল সুপারম্যান।

কালো মিশমিশে ইব্রাহিম ফর্সা হয়ে গেল দেখতে দেখতে, উধাও হল পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো কালো চুল, উঁচু হনু।

আবির্ভূত হল সুশ্রী, গৌরবর্ণ ইন্দ্রনাথ রুদ্র!

এর পরের ঘটনা বিবৃত না করলে পাঠক-পাঠিকারা ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু মূল রহস্যকাহিনীর সঙ্গে তার সংযোগ খুবই ক্ষীণ বলে সংক্ষেপেই সারা হচ্ছে।

ই-এস-পি শক্তিধর অসাধারণ কোমাগো জলার পাড়ে দাঁড়িয়েই স্রেফ মনের শক্তি দিয়ে কাদার মধ্যে ঠেলে শূন্যে তুলেছিল ভাইকিংদের গুপ্তধন—একটা বিরাট সোনার সিন্দুক।

পরক্ষণেই ফেলে দিয়েছিল কাদার মধ্যেই।

এখনও তা আছে সেইখানেই।

থাকবেও।...

চাড লেক থেকে ফিরে এসে প্রিয় বন্ধু মৃগাঙ্ককে আশ্চর্য এক কাহিনী শুনিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। হাঁ করে সব শুনল মৃগাঙ্কর বউ কবিতা।

কাহিনী শেষ হতেই বললে মুখ বেঁকিয়ে, ঠাকুরপো, তোমার নাম আজ থেকে পাল্টে গুলনাথ রুদ্র হওয়া উচিত।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র কভি মিথ্যে বলে না—রেগে টং হয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ—যা তার ধাতে নেই।

কবিতা বলেছিল, দু টন ওজনের হাতিকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া, বিরাট কুমীরকে শূন্যে পাকসাট খাওয়ানো, সবশেষে সোনার সিন্দুককে কাদার মধ্যে থেকে টেনে তোলা মন দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়।

য়ুরি গেলারের নাম শুনেছ ?—চোখ ছোট করে বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

ইজরায়েলের সেই ফোর টোয়েন্টি ? যে শুধু মনের শক্তি দিয়ে অথবা আঙুলের টোকা মেরে চামচে, চাবি বেঁকিয়ে দিত ? বিশ্বাস কর বুজরুকটাকে ?

বৌদি, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি লস এঞ্জেলেসে স্বামী বিবেকানন্দ মনের শক্তি সম্পর্কে যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন, তা পড়েছ ?

আমতা আমতা করে কবিতা বললে, অত পড়ার সময় আমার নেই।

মৃগাঙ্ক, তুই পড়েছিস ?

পড়েছি—ছোট্ট জবাব মৃগাঙ্কর।

তাই ফট করে আমাকে গুলনাথ বলতে পারলি না। কিন্তু তোর মাথা মোটা বউয়ের জ্ঞাতার্থে জানাই, অতি প্রাচীনকালে হাজার হাজার বছর আগে, ভারতে আজকালকার চেয়ে অনেক বেশি করে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটত। তাঁর বিশ্বাস, যে দেশে লোকবসতি খুব বেশি ঘন হয়, তখন যেন সেখানকার মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পায়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে যদি লোকবসতি খুব পাতলা হয়, তাহলে বোধহয় সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ ঘটে।

আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ?—ভুরু কুঁচকোয় কবিতা।

ভ্রূক্ষেপ না করে বলে যায় ইন্দ্রনাথ, অনেক গবেষণা করে হিন্দুরা এই নিয়ে একটা বিজ্ঞান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, এসব ঘটনা অসাধারণ হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে যায়। অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। জড় জগতের অন্য যে কোন ঘটনার মতই এগুলোও নিয়মাধীন। মানুষের মনের মধ্যেই এইসব অসাধারণ শক্তি নিহিত রয়েছে। কেউ যদি এই শক্তি নিয়ে জন্মায়, সেই শক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নেই।

তেড়ে উঠে বলল কবিতা, জ্ঞান দিও না, জ্ঞান দিও না—মনের শক্তি দিয়ে কোন প্রাণীকে শূন্যে ভাসান যায়—স্বয়ং বিবেকানন্দও যদি শুনতেন—

ব্যঙ্গের সুরে ইন্দ্রনাথ বললে, শুনেছিলেন বইকি। পাশ্চাত্যের একজন বড় পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলেন যে গল্পটা, সেটা কি নিবেদন করতে পারি ?

গল্প ?

সিংহলের গভর্নর স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখে তাঁকে বলেছিলেন। কতকগুলো কাঠি আড়াআড়িভাবে একটা টুলের মত সাজিয়ে ঐ টুলের ওপর একটা বাচ্চা মেয়েকে আসন করিয়ে বসান হয়েছিল। যে লোকটি খেলা দেখাচ্ছিল, সে একটা একটা করে কাঠিগুলো সরাতে লাগল। সব কাঠি সরিয়ে নেওয়ার পর মেয়েটি শূন্যে ভাসতে লাগল।

ম্যাজিক !—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে কবিতা।

সিংহলের গভর্নরও তাই বলেছিলেন। তলোয়ার বের করে মেয়েটির নিচের শূন্য জায়গায় চালনা করেছিলেন। দেখেছিলেন, কিছুই নেই সেখানে।

সে কী !—কবিতার চোখ কপালে ওঠবার যোগাড় হল এবারে।

অনুকম্পাভরে বললে ইন্দ্রনাথ, য়ুরি গেলার জন্মেছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তেল আভিভে। তার মধ্যেও যে এই শক্তি ছিল, গবেষক বৈজ্ঞানিক আন্দ্রিজা পুহারিক তা স্বীকার করেছেন। চামচে চাবি বেঁকান তো তুচ্ছ ব্যাপার, তার সবচেয়ে পিলে চমকান কীর্তিটা শুনলে বুঝবে আমার এই কাহিনীতেও গুল নেই মোটেই।

কিরকম ?

শিম্‌গ মাউন্টেনের ওপর ১৪০ মিটার উঁচুতে একটা গাড়িকে ভাসিয়ে রেখেছিল স্রেফ মনের শক্তি দিয়ে। শুধু তাই নয়, মুখে একটা কথা না বলে শুধু মনের হুকুম দিয়ে গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছিল আবার পিছিয়ে এনেছিল শূন্যপথে।

বল কী !

আমি ঐ রকমই বলি, বৌদি। বিশ্বাস না হয় 'স্ট্রেঞ্জ স্টোরিজ অ্যামেজিং ফ্যাক্টস' বইখানার ৪১৪ পৃষ্ঠা খুলে দেখে নিও গুল মারছি কিনা।

ঢোক গিলে কবিতা বললে, তাহলে ঐ নিগ্রোটা কেরালার মন্দিরে নিজের ছেলেকে হাতির সামনে থেকে উড়িয়ে নিয়ে এল না কেন ?

লোকবসতি ঘন ছিল বলেও হতে পারে অথবা অসম্ভব ঘাবড়ে যাওয়ায় মনের শক্তি কমে যাওয়ার ফলেও হতে পারে। ই-এস-পি শক্তিধরদের ক্ষেত্রে প্রায়ই তা ঘটে। সবসময়ে শক্তি খাটাতে পারে না।

কবিতা স্থিরচোখে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আমাকে না হয় বিশ্বাস করালে—কিন্তু আর কেউ তোমার এই গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করবে না।

অপদার্থ লেখক মৃগাঙ্ক রায় যদি একটু যত্ন নিয়ে লেখে, তাহলে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। কিরে মৃগাঙ্ক, পারবি না ?

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মৃগাঙ্ক বললে, চ্যালেঞ্জ করছিস ?

হ্যাঁ করছি।

বেশ, দেখিয়ে দেব।

ফলে, লেখা হল এই কাহিনী। বিশ্বাস করা না করা পাঠক-পাঠিকার অভিরুচি।

মিশরীয় জাহাজের রহস্য

"চার হাজার ছ'শো বছর আগেকার জাহাজ ? এখনও আছে ?"

"আছে। আস্ত জাহাজটাকে পাওয়া গেছে পিরামিডের পাশের পাতালঘর থেকে।"

"সেই জাহাজের নকল তৈরি হচ্ছে প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে ?"

"হচ্ছে এই কলকাতাতেই। মানিকতলার একটা গলিতে।"

"তারপর ?"

"চালান যাচ্ছে ইন্ডিয়ার বাইরে।"

"কিন্তু নকল জাহাজ নিয়ে আপনাদের মাথাব্যথা কেন ?"

ঝুঁকে বসলেন রতন দত্ত। ফর্সা। সুপুরুষ। মাথাজোড়া চকচকে টাক মুখের বুদ্ধির রোশনাইকে বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখা নাক। সুন্দর চোখ। পাতলা ঠোঁট। গালে অল্প দাড়ি—জুলপিজোড়া লম্বা হয়ে গালের অর্ধেক ঢেকে রয়েছে। থুতনি কামানো। শক্ত চিবুক তাই চট করে চোখে পড়ে। ভদ্রলোকের সারা দেহে বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব ঝলমল করছে।

উনি বললেন, "ইন্দ্রনাথবাবু, নকল জাহাজ আমাদের মাথাব্যথার কারণ নয়। ভাবিয়ে তুলেছে ক্লিয়ারিং এজেন্ট।"

নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। সাতসকালেই রতন দত্ত এসেছেন। তাই গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরেই তাঁর সমস্যা শুনতে হচ্ছে।

বললে ডিবে বন্ধ করে, "খোলসা করুন।"

"কালেক্টর অব কাস্টমস্ পাঠিয়েছেন আমাকে। দিনা অ্যান্ড কম্পানির এক্সপোর্ট লাইসেন্স উনি সাসপেন্ড করেছেন।"

"কী অপরাধে ?"

"দেড় কোটি টাকার নারকোটিক ড্রাগস্ রপ্তানিতে সাহায্য করেছিল বলে।"

"দেড় কোটি টাকার ড্রাগস্ !"

"সারা পৃথিবী লড়ছে ড্রাগস্ চোরাচালান বন্ধ করার জন্যে। দিনা অ্যান্ড কম্পানি এই কলকাতায় বসে সেই ক্রাইম করে চলেছে।"

"বেশ করেছেন লাইসেন্স সাসপেন্ড করে দিয়ে।"

"কিন্তু ওরা ট্রায়াল কোর্ট থেকে কালেকটরের অর্ডার খারিজ করিয়েছে। আমরা গেছি হাইকোর্টে। ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির দিন আগামী বেস্পতিবার।"

"আজ থেকে তিন দিন পরে ? এর মধ্যে আমাকে কী করতে হবে ?"

"দিনা অ্যান্ড কম্পানির অপরাধ 'অকাট্যভাবে প্রমাণ করার মতো কিছু মালমসলা হাতে এনে দিন। আমরা যা পেয়েছি, তার ওপরেও আপনি দিন।"

"বুঝলাম। চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে বলুন, মিশরীয় জাহাজের গল্পটা আগে শোনালেন কেন ?"

"দিনা অ্যান্ড কোম্পানিই যে নকল জাহাজ রপ্তানিতে সাহায্য করে চলেছে।"

"আ-চ্ছা !" উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ, "মানিকতলার কোথায় নকল জাহাজ তৈরি হচ্ছে বলুন তো ?"

আধঘণ্টা পরে মানিকতলার মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। এখন ওর পরনে মুগার পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি। কোঁচা ঢুকনো পাশ পকেটে। গায়ে ল্যাভেন্ডারের খোশবাই।

এ-গলি সে-গলি ঘুরে একটা জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তা এখানে সাতফুটের বেশি চওড়া নয়। গলিই বটে, তবে পিচবাঁধানো।

ইট বের করা দেওয়াল। ঘুণধরা কাঠের ফ্রেম। পাল্লা দু'খানা কোনওমতে লেগে রয়েছে। ঝুলছে বললেই চলে।

কড়া ধরে সজোরে নাড়া দিল ইন্দ্রনাথ। ঘড়ি দেখল। সকাল ন'টা। কড়া নাড়ল আবার।

সাড়া নেই। সাতফুট চওড়া রাস্তার এদিকের জানলায় উঁকি দিল একটা মুখ। ভাঙা দরজার উলটো দিকের জানলা। বছর আট-দশের একটি মেয়ে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে। অভাবী ঘরের মেয়ে। এ-পাড়ার সবাই গরিব। বাড়িগুলো পড়ো-পড়ো।

মেয়েটি বললে, "কাকে ডাকছেন ?"

ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ, "ও তুমি ! কী নাম তোমার ?"

"দুষ্টু।"

"চমৎকার নাম। এ-বাড়িতে জাহাজ তৈরি হয়, তাই না ?"

"জাহাজ ?"

"সাদা রঙের জাহাজ। তুমি দ্যাখোনি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশুজ্যাঠা তৈরি করেন।"

"আমি এসেছি জাহাজ দেখতে।"

"কিন্তু বিশুজ্যাঠা তো এখন ঘুমোচ্ছেন।"

"এত বেলায় ?"

"এখন ক'টা বাজে ?"

"ন'টা।"

"তা হলে এই উঠলেন বলে। জোরে কড়া নাড়ুন।"

দুষ্টুর পেছনে এসে দাঁড়ালেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। খালি গা। পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। পরনে লুঙ্গি। গাল-ভর্তি সাবানের ফেনা। এক হাতে খোলা ক্ষুর। ক্ষুর দিয়ে আজকাল বেশিরভাগ মানুষই দাড়ি কামায় না। চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

ভদ্রলোক বললেন, "বিশুদা সারারাত জাগেন। তাই বেলা করে ঘুমোন। ওই খুলেছে দরজা। বিশুদা, কুম্ভকর্ণের ঘুম বটে আপনার। কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছেন ভদ্রলোক। যান, ভেতরে যান।"

ভাঙা দরজা পেরিয়েই একটা সরু গলি। তারপর একটা উঠোন। মাথার ওপর টিনের ছাউনি। রকমারি মূর্তি সাজানো চারপাশে। কোনওটা মাটির, কোনওটা পাথরের।

এইখানেই একটা বেঞ্চির ওপর বসল ইন্দ্রনাথ। বিশুবাবু বসলেন একই বেঞ্চিতে। ভদ্রলোক অসম্ভব রোগা। গায়ের রং কাজলের মতো কালো। একমুখ সাদা-কালো দাড়ি। চোখ দুটো বেশ লাল।

খেঁকি গলায় বললেন, "কী দরকার ?"

"জাহাজ দেখতে এসেছি।"

"জাহাজ ?"

"চার হাজার ছ'শো বছরের পুরনো জাহাজ। এই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো জাহাজ। মিশরের জাহাজ।"

"আপনাকে দেখাব কেন ?"

"কিনতে চাই বলে।"

"কিনবেন ? কত পিস ?"

"একশো পিসের অর্ডার আছে এই মুহূর্তে। পরে আরও বাড়বে।"

"কোথায় পাঠাবেন ?"

"ইন্ডিয়ার সব ক'টা টুরিস্ট সেন্টারে। কিউরিও সাপ্লাই আমার বিজনেস।"

"দেখে তো বিজনেসম্যান বলে মনে হচ্ছে না।"

"কী মনে হচ্ছে ?"

"কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি ?"

"জীবনে না। কেন বলুন তো ?"

"যা ড্রেস হাঁকিয়েছেন।"

"আর্টিস্টিক ?"

"আজ্ঞে।"

"আর্টিস্টিক ড্রেস না হলে তো আর্টের জিনিস বেচা যায় না।"

“তা যা বলেছেন। ভগবান আমাকে মেরেছেন ও-ব্যাপারে। আমাকে দেখলে কাক পর্যন্ত উড়ে যায়, মশাই।”

“খাঁটি আর্টিস্টদের ছাপ বাইরে থাকে না।”

“তবে কোথায় থাকে ?”

“ভেতরে।”

লাল চোখ দুটো কুঁচকে চেয়ে রইলেন বিশুবাবু। ভদ্রলোক ভয়ানক কুৎসিত। গালের হাড় উঁচু। কণ্ঠার হাড় উঁচু। মুখখানা কঙ্কালের করোটি বললেই চলে।

“আপনি আমার ভেতর দেখতে পাচ্ছেন ?”

“বিজনেসের চোখ দিয়ে দেখছি। খাঁটি আর্টিস্টরা সেলসম্যান হয় না। আপনিও নন। তাই পড়ে-পড়ে মার খাচ্ছেন।”

“কে বললে আমি মার খাচ্ছি ?”

“আপনার বাড়ি বলছে, আপনার চেহারা বলছে। সারারাত খেটেও আপনার রোজগার...”

“রোজগার করে কী করব ? কে খাবে ?”

“কেউ নেই আপনার ?”

“না। বউ ছিল, মারা গেছে। আমি একা।”

“এই বাড়ি ?”

“আমার।”

“তবে এত খাটছেন কেন ?”

“সৃষ্টি ছড়িয়ে যাক, এই আমি চাই।”

“আপনার সেরা সৃষ্টি কি তা হলে মিশরীয় জাহাজ ?”

“না। ওটা আমার খেয়াল। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনে ছবি দেখে বানিয়েছিলাম ?”

“কিন্তু ভাল মার্কেট পেয়েছেন। আমি তো আপনার ঠিকানা পেলাম কায়রো থেকে।”

“কায়রো থেকে ?” চমকে উঠলেন বিশুবাবু।

“নকল জাহাজ সেখানেও পৌঁছেছে। মিউজিয়ামের পাশেই বিক্রি হচ্ছে। আসল জাহাজের পাশে।”

“মানিকচাঁদের এলেম আছে বটে।”

“মানিকচাঁদ ?”

“মানিকচাঁদ আগরওয়াল। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস আছে। এক-একবারে পঞ্চাশ পিস ইজিপশিয়ান জাহাজ শুধু ও-ই নেয়।”

“ঠিকানাটা দেবেন তো। ব্যবসার কথা বলব। জাহাজ তৈরি করেন কোথায় ?”

“ভেতরের স্টুডিওতে। আসুন।”

উঠোন থেকে একটা সরু এঁদো গলি। তারপর আর-একটা উঠোন। এখানে চৌবাচ্চা। শ্যাওলা-সবুজ মেঝে। সিঁড়ি উঠে গেছে কোমরসমান উঁচু দাওয়ায়। পর-পর তিনটে ঘর। তিনটে ঘরেই মালপত্র ঠাসা। কারখানা ঘর। দাওয়াতেও ছড়ানো হাবিজাবি জিনিস।

মাঝখানের ঘরটায় শিকলি তোলা ছিল। খুললেন বিশুবাবু। পাল্লায় ঠেলা মারলেন।

বললেন, "দেখেছেন ?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। টানা লম্বা টেবিলের ওপর রয়েছে পাঁচখানা সাদা জাহাজ। একই রকম দেখতে। লম্বাটে গড়ন। দুটো সরু দিক একটু ওপরে তোলা এবং বাঁকানো। মাঝামাঝি জায়গায় কেবিনঘর। সামনের দিকে পাঁচ জোড়া দাঁড়। পেছনে একজোড়া। কেবিনঘরের তলার দিকে ঝিকমিক করছে রংবেরঙের কাচ।

কানের কাছে মৃদুস্বরে বললেন বিশুবাবু, "আসল জাহাজটা লম্বায় ১৪২ ফুট, আমি বানিয়েছি তিন ফুটের মধ্যে। আসল জাহাজে আছে মোট ১২২৪টা অংশ। আমার জাহাজ দুটো ছাঁচ থেকে তৈরি।"

"রাজা খুফু-র জাহাজ," যেন আপনমনে বললে ইন্দ্রনাথ।

"হ্যাঁ। এই সেই রাজা খুফুর জাহাজ। পবিত্র জাহাজ। এই জাহাজেই নাকি রাজার মমিদেহ আনা হয়েছিল নীল নদের ওপর দিয়ে। খরস্রোতের উপযোগী করেই এত সরু গড়ন রাখা হয়েছিল..."

"কাচগুলো ?"

"আসল জাহাজে নেই। নকল জাহাজের দু' পাশেই আছে। মানিকচাঁদের খেয়াল। ও এনে দেয়, আমি বসিয়ে দিই। এই তো বাক্সে রয়েছে বাড়তি কাচ।"

"ঠিকানাটা ?"

"মানিকচাঁদের ? তিন নম্বর রাসচন্দ্র বোস রোড, বড়বাজার।"

"আমি কিন্তু কাচ ছাড়াই চাইছি।"

"কাচ পছন্দ হচ্ছে না ?"

"আপনার কি পছন্দ হচ্ছে ?"

হাসলেন বিশুবাবু। কালো কুৎসিত মুখে ওঁর হাসিটা কিন্তু সুন্দর। শিল্পীর হাসি।

"না। মোটা রুচির ব্যাপার। কিন্তু খদ্দের যা চায়..."

"আমার কাছে কত নেবেন ?"

"জাহাজ-পিছু দু'শো।"

"রাজি। অ্যাডভান্স দিয়ে যাব সন্ধ্যায়। বাড়ি থাকবেন তো ?"

"কোথায় আর যাব ?"

শ্যাওলা-সবুজ উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন বিশুবাবু, "কী হল ?"

"রুমালটা...কোথায় যে পড়ল," ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের গলা। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল নিজেই। রুমাল পুরে রাখছে পকেটে, "নস্যি নেওয়ার অভ্যেস যাদের, রুমাল ছাড়া তাদের চলে না। আসি তা হলে।"

"আসুন।"

ইন্দ্রনাথ চৌকাঠ পেরিয়ে গলিতে নেমে মোড় ঘুরতেই দুষ্টুর বাবা সরে এলেন জানলার কাছ থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়। ছাদের ঘর একটাই। চৌকির ওপর বসানো একটা সাদা টেলিফোন।

দরজা বন্ধ করে চৌকিতে বসলেন। রিসিভার তুললেন। ডায়াল করলেন।

"মানিকচাঁদবাবু?"

"বলছি।"

"বিশুকাকার বাড়িতে কাউকে পাঠিয়েছিলেন?"

"না। কেন?"

"একজন এসেছিল। এতক্ষণ ছিল। এক্ষুনি গেল।"

"কিছু নিয়ে গেছে?"

"না।"

"দেখতে কীরকম?"

"খুব সুন্দর। সিনেমার হিরোর মতো চেহারা। ধুতি আর পাঞ্জাবি, মানিয়েছে চমৎকার।"

"বিশু তাকে চেনে?"

"মনে হল না।"

"ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি।"

বিশুবাবু তখন এক মগ জল চৌবাচ্চা থেকে তুলে মুখ ধুচ্ছিলেন। মানিকচাঁদ এসে দাঁড়াল সামনে। রূপকথার রাজপুত্তুরদের মতো চেহারা। টকটকে গায়ের রং। গোলগাল মুখ। হাতের আঙুলে হিরে, পাঞ্জাবির বোতামেও হিরে। হিরে যেন তার চোখ দুটোতেও।

চোখের সেই জোড়া হিরেতে ঝিলিক তুলে বলল মানিকচাঁদ, "কে এসেছিল, বিশুবাবু?"

ভেজা মুখেই বলে ওঠেন বিশুবাবু, "আপনি জানলেন কী করে? এখনও তো আধঘণ্টা হয়নি..."

"কে এসেছিল?"

"নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

"কেন এসেছিল?"

"নকল জাহাজ কিনবে বলে।"

"আপনি বেচবেন?"

"বেচব না ?"

"না," শক্ত স্বর মানিকচাঁদের।

কাঁধের গামছা টেনে নিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন বিশুবাবু, "আপনার হুকুমে ?"

"হ্যাঁ।"

বিশুবাবুর লাল চোখ একটু গরম হল বটে। আরও একটু কুৎসিত হল হাড়সর্বস্ব মুখখানা। তারপরেই শিল্পীর হাসি হাসলেন। বললেন, "জিনিসটা আমার। যাকে খুশি বেচব।"

"তা হলে আমার সঙ্গে কারবার চলবে না।"

"নিয়ে যান আপনার জিনিস।"

মিনিট-পাঁচেক লাগল প্যাক করতে। করোগেটেড বোর্ডের কার্টন বাক্স 'ওমনি' মারুতিতে করেই এনেছিল মানিকচাঁদ। প্রত্যেকটার মধ্যে ভরা ছিল খড়কুটো আর কাটা কাগজ। পাঁচটা জাহাজ ঢুকে গেল তাদের মধ্যে। ছোট্ট বাক্স-ভর্তি বাড়তি কাচগুলো নিয়ে গটমট করে ভাঙাবাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

গলি পেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়তেই লাল মোটর সাইকেল এসে দাঁড়াল সামনে। নেমে এল ট্রাফিক সার্জেন্ট। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আপনার লাইসেন্স ?"

ভুরু কুঁচকে গেল মানিকচাঁদের "চোদ্দ বছর গাড়ি চালাচ্ছি, লাইসেন্স সঙ্গে রাখিনি কখনও।"

"তা হলে চলুন থানায়।"

"থানায় ?"

সার্জেন্ট-ছোকরা বড় কড়া। কোনও আপত্তি টিকল না। সাদা ওমনিকে নিয়ে গেল মানিকতলা থানায়। মানিকচাঁদের মুখ তখন শুকনো। তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বসানো হল একটা ঘরে। হাতে তার বাড়তি কাচভর্তি ছোট্ট বাক্স। এ-ঘরে আর কেউ নেই।

দরজা খুলল আধঘণ্টা পর। ঘরে ঢুকলেন প্রথমে বিশুবাবু, তাঁর পেছনে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, রতন দত্ত, আর-একজন ভদ্রলোক। এঁর চেহারা বেশ শৌখিন। চোখে সোনার চশমা। খুব দামি ওস্তাগর বানিয়ে দিয়েছেন ঝকমকে সুট।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মানিকচাঁদ, "বিশুবাবু, এসব কী ব্যাপার ?

বিশুবাবু এখন একটা রঙিন খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। ফলে তাঁর কালো রং আরও খোলতাই হয়েছে। আমতা-আমতা করে উনি বললেন, "কী যে ব্যাপার..."

"আমি বলছি কী ব্যাপার," এগিয়ে এল ইন্দ্রনাথ, "বিশুবাবু, আপনার ঘর থেকে বেরনোর সময় হাত-সাফাই করেছিলাম। রুমাল খুঁজবার অছিলায় ছোট বাক্সের বাড়তি কাচগুলোর একটা পকেটে করে এনেছিলাম। কাচটা দেখেছেন ইনি। ইনি

বিখ্যাত জহুরি রামেশ্বর প্রসাদ। কাচখানা উনি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় কিনতে চেয়েছেন।”

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। প্রতিটি মানুষ থ হয়ে দেখছে ইন্দ্রনাথকে।

রামেশ্বর প্রসাদ কেসে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, “আটচল্লিশ লাখে কিনে বেচব সাত কোটি টাকায়।”

এবার বুঝি অ্যাটম-বোমা পড়ল ঘরে। একখানা কাচের দাম সাত কোটি টাকা!

ইন্দ্রনাথ বললে, “কারণ এটা কাচ নয়, ব্লু ডায়মন্ড। ওড়িশার কালাহাণ্ডি, ফুলবনি আর বোলাঙ্গির জেলা থেকে বেআইনিভাবে খনি থেকে তোলা হিরে। এরকম আরও দামি পাথর ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে নানাদিকে। মোট দাম চারশো কোটি টাকা। বিশুবাবু এইগুলিকেই কাচ মনে করে নকল জাহাজের গায়ে ফিট করে দিতেন। কাচ মনে করেই সবাই ছেড়ে দিয়েছে। কোটি-কোটি টাকার পাথর এভাবে খোলাখুলি পাচার হতে পারে, কেউ ভাবতেও পারেনি।”

ঢোক গিলে বিশুবাবু বললেন, “তা হলে বাক্সভর্তি হিরে-মানিক ছিল?”

“এখনও আছে। মানিকচাঁদবাবু, অত আঁকড়ে ধরবেন না, এটা থানা। দিন, এই খুললাম ডালা। জহুরিমশায় কী বলেন?”

একটার পর একটা পাথর তুলে চুলচেরা চোখে দেখলেন রামেশ্বর প্রসাদ, “সবই দামি পাথর। কোটি-কোটি টাকা দাম।”

রতন দত্ত আরক্ত মুখে বললেন, “এ যে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ। ড্রাগ্‌স্-এর মামলায় ব্লু ডায়মন্ড।”

“ড্রাগ্‌স্‌ও আছে,” বলল ইন্দ্রনাথ।

“কোথায়?”

“মৃগাঙ্ক।”

দরজার বাইরে একটা তিন ফুট লম্বা নকল জাহাজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ইন্দ্রনাথের তলব শুনে ঢুকলাম ঘরে এবং ওর শেখানো কাজটা করে ফেললাম চক্ষের নিমেষে।

সুন্দর সাদা জাহাজটাকে মাথার ওপর দু' হাতে তুলে আছড়ে ফেললাম মেঝেতে।

লাফিয়ে উঠেছিলেন বিশুবাবু। কিন্তু হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। মিশরীয় জাহাজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে গোটা-দুই টুকরো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, “আসুন রতনবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা টুকরোর মধ্যে সুড়ঙ্গ রয়েছে।”

“রয়েছে।” গলা বসে গেছে রতন দত্তর।

“অর্থাৎ, তিন ফুট লম্বা জাহাজের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে, যার ব্যাস দেড় ইঞ্চি।”

“হ্যাঁ।”

“সুড়ঙ্গের মধ্যে সাদা গুঁড়ো ছিল, এখন মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই টুকরো

দুটোর গর্তে এখনও রয়েছে, একটু জিভে চেখে দেখবেন ?”

আঁতকে উঠলেন রতন দত্ত, “পাগল !”

“পাগল নয়, পাগল নয় ! বদমাশ !” আচমকা চিৎকারে চমকে ওঠে ঘরের সবাই। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বিশুবাবুর। ফুলে উঠেছে রগের শিরা। ভয়ানক ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কুৎসিত মুখখানা, “ফোর টোয়েন্টি ! সমস্ত ফোর টোয়েন্টি !”

“চেঁচাচ্ছেন কেন বিশুবাবু ?” নিরীহ গলায় বলল ইন্দ্রনাথ। বিষম কৌতুকে নৃত্য করছে তার দুই চোখ।

“তবে কি গান গাইব ? চারশো বিশের ম্যাজিক দেখাচ্ছেন ?”

“চারশো বিশের ম্যাজিক ! সেটা আবার কী ?”

“দু' খানা ছাঁচ থেকে তৈরি জাহাজের ভেতর তো ফোঁপরা হবেই। তার মধ্যে সাদা গুঁড়ো এল কী করে ?”

“আপনি ভরেননি ?”

“আ-আমি ভরব ড্রাগস্ ? জেনেশুনে ?” রাগের চোটে কথা আটকে গেল বিশুবাবুর।

“সত্যিই তো, আপনি ভরতে যাবেন কেন ! আপনি হলেন শিল্পী, খাঁটি শিল্পী। ও কাজটা করেছে আপনার মানিকচাঁদ !”

এই প্রথম তেড়ে উঠল মানিকচাঁদ, এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কাঠের পুতুলের মতো, “দেখেছেন আপনি ?”

নিমেষে পালটে গেল ইন্দ্রনাথের চোখ-মুখের চেহারা। উধাও হল হাসি আর কৌতুক। যেন মশাল লকলকিয়ে উঠল দুই চোখের তারায়।

কড়-কড়-কড়াত করে বুঝি বাজ ফেটে পড়ল গলার আওয়াজে, “পিশাচ ! জানোয়ার ! অমানুষ ! এখনও লম্বা-লম্বা কথা। টেনে জিভ ছিঁড়ে ফেলব আর একটি বাজে কথা বললে !”

এ যে মূর্তিমান প্রলয় ! ইন্দ্রনাথের এই ভয়াল মূর্তি ঘরের আর কেউ তো কখনও দেখেনি। তাই চোখ বড়-বড় করে চেয়ে আছে তার রুদ্র রূপের দিকে। মুখের ওপর সপাং করে চাবুক আছড়ে পড়লে মানুষ যেমন সিঁটিয়ে যায়, মানিকচাঁদের অবস্থা এখন সেইরকম।

কড়-কড়-কড়াত গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, “বিস্ট ! লক্ষ-লক্ষ স্কুলের ছেলেমেয়েদের ড্রাগসের নেশায় ধ্বংস করছ তুমি, মানিকচাঁদ, তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত ! বিশুবাবু, মানিকচাঁদের যে ঠিকানা আমাকে দিয়েছেন, সে নামে কোনও রাস্তা কলকাতায় নেই।”

“সে কী !” বিশুবাবু নিজেই মিইয়ে গেছেন ইন্দ্রনাথের রুদ্ররোষে।

“আপনি শিল্পী, এত খোঁজ নেওয়ার দরকারও হয়নি। কিন্তু আমি দেখেছি, স্ট্রিট ডিরেক্টরিতে ও রাস্তা নেই। আসল ঠিকানা আছে গাড়ির ব্লু-বুকে, যা থাকে গাড়ির মধ্যেই। তাই ট্রাফিক সার্জেন্টকে দিয়ে গাড়ি আনা হয়েছে থানায়। ব্লু-বুক-এর

ঠিকানায় হানা দিয়ে কী পেয়েছি জানেন ? কী হে মানিকচাঁদ ? কী ছিল তোমার আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে ?”

মানিকচাঁদ কি জ্যান্ত মড়া হয়ে গেল ?

দুই চোখে অসীম ঘৃণা ছিটিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, “প্যাকেট-প্যাকেট নারকোটিক ড্রাগস্ । এখান থেকে সাদা জাহাজ সেখানে পৌঁছলে ছুরি দিয়ে ঘষে খুলে আনা হয় একটা পাথর । সেই ফুটো দিয়ে ভেতরে ড্রাগস পুরে ফের পাথর বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় । কাজটা হচ্ছে কীভাবে, তা দেখে এসেছি । নিজের চোখে । মানিকচাঁদ, আর কিছু বলার আছে ?”

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের শুনানি বেরিয়ে গেল বেস্পতিবার । ছেচল্লিশ শো বছরের পুরনো মিশরীয় জাহাজের নকল বানিয়ে, তার ভেতরে চোরা সুড়ঙ্গে পাচার হত নারকোটিক ড্রাগস্, চোরাই পাথর লাগানো থাকত গায়ে, কাচ মনে করে কেউ খুলেও দেখেনি, খুললেই সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে ঝরে পড়ত কেজি-কেজি ড্রাগস্ ! দিনা অ্যান্ড কম্পানির লাইসেন্স সাসপেন্ড করেছেন বিচারপতিরা । ফেঁসে গেছে মানিকচাঁদ এবং আরও অনেকেই ।

ইন্দ্রনাথের তুঙ্গে এখন বেস্পতি । যেখানে গোলমালের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, ডাক পড়ছে সেইখানেই ।

ধরণীর খোঁজে

"আপনার নাম ?"

"সুযোধন চোপদার।"

"সুযোধন ?"

"আজ্ঞে।"

"মানে কী সুযোধনের ?"

"দুর্যোধন।"

"সুযোধন মানে দুর্যোধন !"

"সুযোধনের আর-একটা নাম দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির এই নামেই ডাকতেন দুর্যোধনকে।"

"মহাভারতটা ভালই পড়েছেন দেখছি।"

"ওইটুকুই আমার বিদ্যে," বলে কাষ্ঠহাসি হাসলেন সুযোধন চোপদার।

ইন্দ্রনাথ বললে, "খুব বিপদে না পড়লে আমার কাছে কেউ আসে না। বিশেষ করে এত সকালে। বিপদটা আপনার নিজের, তাই না ?"

"আজ্ঞে...," ঢোঁক গিললেন সুযোধন।

"কী হয়েছে ?"

কথার সুরে এমন কিছু একটা ছিল, যা সুযোধনের অন্তর ছুঁয়ে গেল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ইন্দ্রনাথের হাত খামচে ধরে বললেন, "ইন্দ্রনাথবাবু, আমার ফাঁসি হবে। বাঁচান আমাকে।"

ভয়-ব্যাকুল গুলি-গুলি চোখ দুটোর দিকে খানিক চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, "কী করেছেন ?"

সুযোধন তখন যা বললেন, তাই এই :

গোলকুণ্ডা শহরে সবচেয়ে খাটিয়ে মানুষটার নাম কিরণ চোপদার। নিজের বাড়ির সামনের দিকের চালায় পেট্রলপাম্প, খুব কাছেই অন্য একটা বাড়িতে চুটিয়ে

চালাচ্ছে মিনি সুপারমার্কেট। দোকানঘরের ওপরের তলায় রেখেছে খানকয়েক ঝলমলে ঘর। রকমারি কাজের ঝকমারিতে ওকে সাহায্য করে স্ত্রী চন্দনা। একসময়ে প্রসূতিসদনের নার্স ছিল। মানে, ধাইমা। কিরণের বউ হওয়ার পর তাদের ছেলে ধরণীকে মানুষ করেছে। ধরণী এখন এই শহরের সকলের চোখের মণি। যেমন ফুটফুটে, তেমনই দুরন্ত। বয়স মোটে সাড়ে পাঁচ।

১৯৮৮-র ২১ নভেম্বরের সন্ধ্যা। চন্দনা তাকে পাউডার মাখিয়ে, চোখে কাজল টেনে দিয়ে, কোঁকড়া চুলে চিরুনি চালিয়ে শুইয়ে দিয়েছে ছোট্ট খাটে। মশারি খাটিয়ে দিয়ে পাশে বসে গল্প শুনিয়েছে, গান গেয়েছে।

ধরণী ঘুমিয়ে পড়তেই রোজকার অভ্যেসমতো পা টিপেটিপে সরে এসেছে খাটের কাছ থেকে। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে তারের জাল লাগানো দরজা। স্প্রিং-লক ক্লিক করে লেগেছে পেছন ফিরতেই। ছুটে চলে এসেছে মিনি সুপারমার্কেটে। কিরণ যখন ঝাঁপ তোলে, চন্দনা তখন পাশে দাঁড়ায়। মিনিট পঁয়তাল্লিশ লেগেছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে দোকান বন্ধ করতে। তারপর দু'জনে ফিরল বাড়িতে। দেখল, ধরণীর ছোট্ট খাটে ধরণী নেই! নিশ্চয় নতুন দুষ্টুমি জুড়েছে পাজিটা। খাট থেকে নেমে লুকিয়ে রয়েছে বাড়ির মধ্যেই কোথাও। এরকম বজ্জাতি ওকেই মানায়। স্বাস্থ্য ভাল, যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ পাগল করে ছাড়ে মা'কে অথবা বাবাকে।

সারা বাড়ি খুঁজে এল কিরণ আর চন্দনা। পাওয়া গেল না ধরণীকে।

তা হলে হয়তো বিচ্ছুটা গেছে বাড়ির বাইরে। আশেপাশেই খেলা করছে।

ছুটে বেরিয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরল। প্রতিটি বাড়িতে খোঁজ নিল। কিন্তু গোলকুণ্ডা শহরের কোথাও পাওয়া গেল না দুরন্ত ধরণীকে।

মুখ শুকনো করে যখন বাড়ি ফিরছে দু'জনে, তখন আসতে হয়েছিল বিশাল জলাটার পাশ দিয়ে। এই জলা কত গভীর অথবা আদৌ গভীর কি না কেউ তা জানে না। কাদা, পাঁক আর আগাছায় ভর্তি। কেউ নামে না।

দামাল ধরণী জলায় পড়ে যায়নি তো?

বাদলা এদের সঙ্গেই ঘুরছিল। ঝন্টু আর ঘোঁতনাও ছুটে এল। এ-শহরে ধরণীকে ভালবাসে সকলেই।

কিরণ আর চন্দনা জলার দিকে চেয়ে আছে দেখে বাদলা বলেছিল, "মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। ধরু এখানে আসেনি।"

ধরণীকে আদর করে সবাই 'ধরু' বলে ডাকত।

কিডন্যাপিং শব্দটা বড় ভয়ঙ্কর শব্দ। গোলকুণ্ডার মতো শান্তির শহরে এ-শব্দটা স্বভাবতই কারও মাথায় আসেনি। দেবশিশুর মতো ধরুকে যে কোনও মানুষ-পিশাচ গায়েব করে মোটা মুক্তিপণ চাইতে পারে, এমনটা কিরণ অথবা চন্দনা কেউই ভাবতে পারেনি। এসব ব্যাপার ঘটে বড়-বড় শহরে বড়-বড় লোকেদের বেলায়। কিরণ আর বন্দনা ছাপোষা মানুষ। কে নেবে তাদের নয়নের নিধিকে? অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব ঘটনাও যে ঘটতে পারে শান্ত শহর গোলকুণ্ডায়, তা পরিষ্কার হয়ে গেল খুব শিগগিরই।

খালি বাড়িতে ফিরে এল কিরণ আর চন্দনা। কাঠের ফটকের সামনে আসতে-না-আসতেই দেখল, পাশের রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ে আসছে গোপা চোপদার, কিরণের বউদি।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিরণ। বউদি তো কখনও এভাবে দৌড়োয় না। ফরসা মুখ ঘামে ভিজে গেছে এই শীতের রাতেও। কপালের লাল টিপ ধেবড়ে গেছে ঘামে। বিষম উত্তেজনায় চোখে দুটো কোটর থেকে প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় এইটুকু দেখেই বুকটা ধক্ করে উঠেছিল কিরণ আর চন্দনার।

কী খবর নিয়ে আসছে বউদি? দাদা-বউদি থাকে প্রায় সিকি মাইল দূরে, বটেশ্বর রোডে। ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে নাড়ছে একটা ছেঁড়া কাগজ।

হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে বউদি, "ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল।"

কাঁপা হাতে কাগজটা টেনে নিয়েছিল কিরণ। বাদামি কাগজ, যে কাগজ দিয়ে ঠোঙা তৈরি হয়। ঠোঙা থেকেই একটা দিক টেনে ছিঁড়ে নিয়ে কী যেন তাতে লেখা হয়েছে। পেনসিল দিয়ে লেখা।

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়ে গেল কিরণ :

"এখনও যদি কোনও চিঠি না পেয়ে থাকেন, চলে যান উত্তর গোলকুণ্ডার চণ্ডীতলায়। তুকারাম সামুই-এর বাড়িতে পাবেন চিঠি।"

এ-চিঠির মানে কী, তা নিমেষে বুঝেছে কিরণ। ধেয়ে গেছে ফটক খুলে বাড়ির দরজার সামনে। গর্তটা চোখে পড়েছে তখনই।

মশা আটকানোর জন্য তারের দরজা বানিয়েছিল কিরণ। কাঠের দরজা ছাড়াও একটা তারের দরজা। স্প্রিংয়ের তালা লাগিয়ে নিয়েছিল। এ তালার সুবিধে এই যে, বাইরে থেকে টেনে পাল্লা বন্ধ করে দিলে লক এঁটে যায়, তখন চাবি না লাগালে খোলে না। কিন্তু ভেতর থেকে চাবি ছাড়াই খোলা যায়। সুপারমার্কেটে নতুন স্প্রিং-লক আসতেই শখ করে নিজের বাড়িতে বসিয়েছিল কিরণ।

সেই লক ভেতর থেকে খোলা হয়েছে বাইরে দাঁড়িয়ে। কাতুরি দিয়ে দরজার তার কাটা হয়েছে গোল করে, ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে তালা খুলেছে, দরজা খুলেছে, ধরুকে নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু কতদূরে আর যাবে? দৌড়োদৌড়ি করলে এখনও নিশ্চয় দুষ্টু ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনা যাবে।

তাই তিনজনেই প্রায় ছুটে চলে গিয়েছিল চণ্ডীতলায় তুকারাম সামুইয়ের বাড়িতে। সেখানেও দেখেছিল বন্ধ দরজার কড়ায় গোঁজা একটা বাদামি রঙের কাগজ। ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ।

মুক্তিপণের দ্বিতীয় চিঠি :

"ছেলে আমাদের কাছে। যা বলছি, তাই করবেন। পুলিশকে যদি খবর দেন, সিরিয়াল নম্বরের নোট দেন, এই চিঠি পুড়িয়ে না ফেলেন, ছেলেকে আর দেখতে পাবেন না।

৫ টাকার নোট ১০০০, ১০ টাকার নোট ১০০০, ২০ টাকার নোট ৫০০, ৫০ টাকার নোট ৫০০, ১০০ টাকার নোট ৫০০—মোট এক লক্ষ টাকা একটা জুতোর বাক্সে ভরে এই রাস্তা ধরে চলে আসুন :
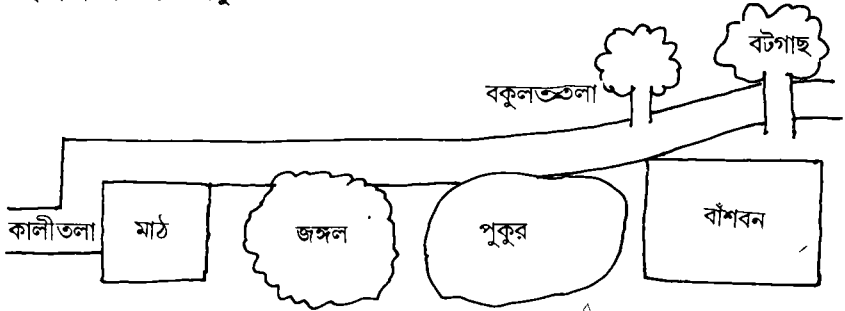
চিঠি গোঁজা ছিল যে বাড়ির কড়ায়, সেটা পাকাবাড়ি নয়। ঝুপড়ি বললেই চলে। হাবিজাবি জিনিস দিয়ে কোনও মতে চালু চালা বানিয়ে মাটি আর দরমার দেওয়ালে রাখা হয়েছে আলগোছে। দীনহীন এই নিকেতনের মালিকের নাম তুকারাম সামুই। জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আর কাঠের কাজ করে পেট চালায়। রাত ন'টা নাগাদ তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজে। "কে রে," বলে ডেকে উঠতেই জবাব এসেছিল হেঁড়ে গলায়, "কড়ায় গুঁজে রেখে গেলাম একটি চিঠি। এক্ষুনি নিয়ে যা পেট্রলপাম্পের কিরণ চোপদারের কাছে। দশটা টাকা বখশিশ পাবি।"

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল তুকারাম। স্মাগলারদের জ্বালায় এ-অঞ্চলে টেকা দায় হয়ে উঠল দেখছি। এই তো মাস কয়েক আগে হামলা চলছিল বাড়ির সামনে। তুকারাম বেরিয়েছিল রগড় দেখতে। শাঁ করে একটা বুলেট এসে বিঁধেছিল কাঁধে।

কাজেই আর ঝঞ্ঝাট নয়। হেঁড়ে গলায় কথা বলে লোকটা যে হন-হন করে চলে যাচ্ছে, তা নিস্তব্ধ রাতে স্পষ্ট শুনতে পেল তুকারাম। আওয়াজ অনেক দূরে মিলিয়ে যেতেই বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল ওই পাড়াতেই একজনের বাড়িতে। দরজার কড়ায় কী গুঁজে গেছে হেঁড়ে গলার লোকটা, তা সে দ্যাখেনি।

কিরণ, চন্দনা আর গোপার হাঁকডাক শুনে গুটি-গুটি বাড়ি ফিরে এসে সব বললে তুকারাম। আধবুড়ো নিরীহ মানুষ। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। ধরুকে সে যে ধরে আনেনি—এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু ধরুকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্তিপণ লাগুক, ধরুকে চাই।

কিডন্যাপারের কথার অন্যথা করেনি কিরণ। দুটো চিরকুটই পুড়িয়ে ফেলেছিল। পুলিশকেও খবর দেয়নি। সারাজীবন হাড়ভাঙা খেটে কিরণ আর চন্দনা যা কিছু করেছিল, তার বিনিময়ে লাখখানেক টাকা জুটিয়ে নিয়েছিল সোমবার মাঝরাতের আগেই।

কালীতলা জায়গাটা ওর বাড়ি থেকে মাইল দশেক দূরে। জঙ্গলটার নাম ডাকাতে কালীর জঙ্গল। দু-একজন কাঠুরে ছাড়া ওদিক কেউ মাড়ায় না। জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দির এখনও আছে। গভীর রাতে সেখানে নাকি শাঁখ-ঘণ্টা বাজে। নিশ্চয় কেউ পুজো করে। শোনা যায়, ভাঙামন্দিরের কালীর কাছে যা চাওয়া যায়, তিনি তাই দেন।

একলক্ষ টাকার বাণ্ডিল জুতোর বাক্সে ঢুকিয়ে কিরণ আর চন্দনা সোমবার বিকেল নাগাদ গেল এই জঙ্গলে। বড় গভীর জঙ্গল। মন্দিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেক কষ্টে ভাঙামন্দিরে পৌঁছে রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল দু'জনেরই।

মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠে টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে।

চারদিক পুরোপুরি নিস্তব্ধ নয়। পাখিরা গাছে ফিরছে। বড় চেঁচাচ্ছে। ডানা ঝটপট করছে। তালে-তালে ধুক-ধুক করছে দু'জনের হৃৎপিণ্ড।

সঙ্গে পুজোর সরঞ্জাম এনেছিল চন্দনা। মনে সাহস এনে ঢুকল ভাঙা ইট-পাথর মাড়িয়ে মন্দিরের মধ্যে। ফাটা দেওয়াল দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি যেন গনগনে চোখে তাকিয়ে ছিলেন ওঁদের দিকে। সত্যিই জাগ্রত দেবী। নইলে চাহনি অমন হয়?

ফুল-টুলগুলো নামিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলেছিল চন্দনা, "মাগো, ধরুকে ফিরিয়ে দাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল চন্দনার। অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল গলা চিরে।

চকচকে জিনিসটা একটা সোনার আংটি। আংটির পাথরটা একটা গোমেদ। গোমেদ-বসানো এই আংটি ছিল ধরুর আঙুলে!

সেই আংটি রয়েছে বেদিতে—চন্দনার চোখের সামনে—যেখানে ও মাথা ঠেকিয়েছিল!

বকুলতলায় গিয়ে কিন্তু টর্চের ফ্ল্যাশ দেখতে পায়নি কিরণ আর চন্দনা। ধরুকেও পায়নি।

দশমাইল পথ টলতে টলতে ফিরে এসেছিল দু'জনে। কাঠের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল নাচুভাই। কিরণের দাদা সুযোধন চোপদারের পেট্রলপাম্পে কাজ করে। হাতে একটা বাদামি কাগজের ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ।

কিডন্যাপের তৃতীয় চিঠি।

ফ্যাকাশে মুখে চিঠি হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে গেল কিরণ :

“একা যাবেন। অন্য রাস্তা ধরে আসবেন। ভোর চারটের সময়। পেছনে কেউ নিয়ে যাবেন না। বাক্সে সব টাকা রাখবেন। দু'বার ফ্ল্যাশ দেখলে দাঁড়াবেন।”

কিরণের ঠোঁট তখন কাঁপছে। চন্দনা পাথর হয়ে গেছে।

নাচুভাই বললে, “পেট্রলপাম্পে কুড়িয়ে পেলাম আমি আর কোকো।”

কোকো এই শহরেরই ছেলে। নাচুভাইয়ের বন্ধু। থাকে কিরণের বাড়ির পেছন দিকে। ধরুকে বড় ভালবাসে।

নাচুভাই বললে, “কাগজের উলটো দিকের নকশাটা দ্যাখো, কিরণদা।”

উলটে দেখল কিরণ। এবারের নকশায় নেড়ানেড়ি পাড়ায় যেতে বলা হয়েছে। অনেক রাস্তা আঁকা। তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে কীভাবে কোন দিকে যেতে হবে।

বলল কিরণ, “আমি একাই যাব। নাচুভাই, কাউকে বলিসনি। কোকোকেও বলিসনি আমি যাচ্ছি, ও যা ছেলে, ঠিক পেছন-পেছন আসবে।”

সত্যিই তাই। গোলকুণ্ডা শহরে কোকো-র মতো ডাকাবুকো, লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ আর দুটি নেই। টকটকে ফরসা রং। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা। মনটা কিন্তু ফুলের মতো নরম। পাঁচজনের উপকারে বুক দিয়ে পড়ে।

নাচুভাই বললে, “কোকো কিন্তু এ-চিঠি পড়েছে। রাগে ফুঁসছে। এল বলে তোমার কাছে।”

ঝটিতি বললে কিরণ, “তা হলে আমি যাই। চন্দনা, তুমি বাড়ি থাকো। কোকো এলে আটকে রাখবে। ভেবো না, ধরু ফিরবেই।”

অনেক ঘুরে, অনেক হেঁটে কিরণ যেখানে পৌঁছল, সে জায়গাটা বড়দা সুযোধনের পেট্রলপাম্পের কাছেই। গ্যারাজপাড়া থেকে যে রাস্তাটা গুদোম পাড়ার রাস্তার সঙ্গে কাটাকুটি করেছে, ঠিক সেইখানেই।

দু'বার টর্চের ফ্ল্যাশ দেখা গেল এখানে। অন্ধকারে ডেকে উঠল একটা পেঁচা। অশথগাছের তলায় জুতোর বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিরণ। ফ্ল্যাশ দেখা গিয়েছিল ওইখানকার ঘুপসি অন্ধকারে।

ফিরে এল বাড়িতে।

কয়েক ঘণ্টা পরেও ফিরল না ধরু। কয়েকদিন পরেও না।

এই ক'দিন কিন্তু টগবগ করেছে কোকো। ধরু তার বড় প্রিয়। তার খেলার সঙ্গী। যে শয়তান ওকে নিয়ে গেছে, তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলতে চায় নিজের হাতে।

চন্দনা আর কথা বলে না। একদম বোবা। নাওয়া-খাওয়াও ছেড়েছে। এই সময়ে একটা অদ্ভুত খবর নিয়ে এল কোকো।

গোপাবউদিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিশ সন্দেহ করেছে সুযোধনকে। সুযোধনের ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। যদিও গোলকুণ্ডা শহরে প্রথমে সে এসেছে, পেট্রলপাম্পও প্রথমে খুলেছিল, কিন্তু ছোটভাই তার পরে এসে একই কারবার করে লাল হয়ে গেল। সুপারমার্কেট খুলে এখন তার রমরমা দ্যাখে কে।

এই নিয়ে গোপাবউদির সঙ্গে প্রায় তুমুল ঝগড়া হত সুযোধনের। কাকচিল উড়ে যেত চেঁচামেচিতে।

তারপরেই নিখোঁজ হয়েছে গোপাবউদি। সুযোধনের হাত নেই তো এর ভেতরে ?

তারপরের দিনই আগুনের মতো খবরটা ছড়িয়ে গেল গোলকুণ্ডা শহরে। সুযোধন চোপদার পালিয়েছেন গোলকুণ্ডা ছেড়ে।

কাহিনী শেষ করে জুলজুল করে চেয়ে রইলেন সুযোধন চোপদার। এমন শীতেও তাঁর টাকে ঘাম দেখা দিয়েছে। কালো মুখটা বিশাল কালো জামরুলের মতো চকচক করছে।

ঘরের এককোণে সোফায় শালমুড়ি দিয়ে বসে সব দেখলাম, সব শুনলাম আমি।

ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টে সুযোধনের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "পালিয়ে এলেন কেন ?"

"নইলে ফাঁসি দিত। অমু-দারোগা নাকি বলেছে, গোপাকে আমি খুন করেছি। ধরুকেও আমি সরিয়েছি। অথচ তখন আমি বাড়িতেই ঘুমোচ্ছিলাম।"

"ধরুকে সরিয়ে আপনার লাভ ?"

"কিরণের মন ভেঙে দেওয়া। ওর দুটো ব্যবসায় যে ঠিক এক লাখ টাকা নগদে ঘুরছে, তা শুধু কাছের লোক ছাড়া কেউ জানে না। ওই এক লাখ ব্যবসা থেকে বের করে আনতে পারলেই ওর কারবার চুপসে যাবে, আমার কারবার ফুলে উঠবে।"

"আপনার স্ত্রীকে খুন করতে যাবেন কেন ?"

"মাথামোটা অমু-দারোগার বিশ্বাস, গোপা ছাড়া আর কে জানবে ধরুকে আমি সরিয়েছি ? তাই গোপার মুখ বন্ধ করেছি ওকে খতম করে দিয়ে।"

"কিডন্যাপারের প্রথম চিরকুট কার বাড়ির দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল ?"

"আমারই বাড়ির দরজায়," গলা কেঁপে যায় সুযোধনের।

"তৃতীয় চিঠিটা কোথায় পেয়েছিল নাচুভাই ?"

"আমারই পেট্রলপাম্পে।"

"আ-প-না-র পেট্রলপাম্পে ?"

"আজ্ঞে," ঢোঁক গিললেন সুযোধন, "কোকো ট্রাক চালায়। জঙ্গলের কাঠ চালান দেয়। থাকে আমার বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট্ট ঘরে। খায়দায় হোটেলে। মাসের তিনভাগ বাইরে থাকে ট্রাক নিয়ে। আমার কর্মচারী নাচুভাই

ওর বন্ধু। রাত্রে শখ করে ওর ট্রাকে ঘুমোয়। সেদিন রাত্রে ওকে ঘুম থেকে তুলে কোকো নিয়ে গিয়েছিল আমার পেট্রলপাম্পে পেট্রল নেওয়ার জন্য। চাবি থাকত নাচুভাইয়ের কাছে। পেট্রল দিতে দিতে নাচুভাই শুনেছিল অফিসঘর থেকে কোকো হেঁকে বলছে, 'এটা আবার কী ?' পেট্রল দেওয়া শেষ করে নাচুভাই গিয়ে দেখল কোকো রাগে ফুঁসছে। হাতে কিডন্যাপারের চিরকুট। বন্ধ দরজার তলা দিয়ে বদমাশটা ফেলে গিয়েছিল ঘরের মেঝেতে, কোকো দরজা খুলে ঢুকেই দেখেছে।"

"দরজার তলায় চৌকাঠ আছে ?"

"আজ্ঞে, তা আছে।"

"পাল্লা ভেতর দিকে খোলে, না বাইরের দিকে ?"

ভ্যাবাচ্যাকা মুখে সুযোধন বললেন, "বাইরের দিকে।"

"ইঁদুর আছে বুঝি অফিসঘরে ?"

"না তো।"

"দরজার তলার কাঠ খেয়ে যায়নি ?"

"এক্কেবারে না। অ্যালুমিনিয়াম পটি দিয়ে মোড়া। খাপে-খাপে লেগে যায় চৌকাঠে। ইঁদুরের সর্দারিও ঢুকতে পারে না।"

"অফিসঘরের দরজায় কি তালা দেওয়া ছিল ?"

"আজ্ঞে, চাবি ছিল নাচুভাইয়ের কাছে।"

"টাকা ভর্তি জুতোর বাক্সটা যেখানে ছুঁড়ে এসেছিল কিরণ, সে জায়গাটাও আপনার বাড়ির কাছে ?"

ঠিক যেন ককিয়ে উঠলেন সুযোধন, "সার..সার... এই সবের জন্যই অমু-দারোগা আমাকে ধরবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ধরুকে আমি সরাইনি, গোপাকে আমি মারিনি। আমাকে বাঁচান।"

"কলকাতায় উঠেছেন কোথায় ?"

"শিয়ালদার এক হোটেলে।"

"আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?"

চমকে উঠলেন সুযোধন, "সে তো সার এই কলকাতাতেই, ঝামাপুকুরে।"

"ঠিকানা ?"

"সার... সার...," প্রায় কেঁদে ফেললেন সুযোধন, "ওখানে খবর দেবেন না। গোপার ভাইটা একটা মস্তান। আমার লাশ ফেলে দেবে। শুধু পুলিশের ভয়ে নয় সার, পিন্টুর ভয়েই আমি পালিয়েছি বাড়ি ছেড়ে।"

"পিন্টু দে ?"

"আপনি চেনেন ?"

সুযোধনের কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। বলল, "তুই যা, মৃগাঙ্ক।"

আর কিছু বলতে হল না আমাকে। কোথায় যেতে হবে, তা বুঝে

গিয়েছিলাম।

আমি বেরিয়ে যেতেই নাকি নেতিয়ে পড়েছিলেন সুযোধন। হেঁচকি তুলেছিলেন।

হেঁচকি থামতেই সুযোধনের প্রথম প্রশ্নটা ছিল এই, "কেন পাঠালেন সার ? পিন্টু ঠিক লাঠি মারবে আমার মাথায়।"

নিষ্করুণ গলায় ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, "অমু-দারোগার টেলিফোন আছে তো ?"

"টে-টে-টেলিফোন !"

"হ্যাঁ। থানায় ফোন আছে ?"

"সার ! সার ! ওখানেও খবর দেবেন ?" কেঁদে ফেলেছিলেন সুযোধন।

"নাম্বার জানেন ?"

হু-হু করে সুযোধন তখন কাঁদছেন। নাম্বারও গুলিয়ে ফেলেছিলেন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে নাম্বার জুটিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তখনই ফোন করেছিল অমু-দারোগার অর্থাৎ অমিয় তরফদারকে।

পরের দিন একটা নাটক হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাড়িতে।

বসবার ঘরের একদিকে সোফায় বসে চন্দনা, কিরণ আর অমু-দারোগা পলকহীন চোখে চেয়ে আছেন এদিকের সোফায় জবুথবু হয়ে বসে থাকা সুযোধনের দিকে। ভদ্রলোক পোড়া বেগুনের মতোই একেবারে চুপসে গেছেন। বিষম আতঙ্কে চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ইন্দ্রনাথ ওঁকে সারাদিন সারারাত ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখেছিল—পাছে পালিয়ে যান, এই ভয়ে।

এমন সময়ে জুতো মসমসিয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি। আমার পেছনে পিন্টু-মস্তানের তালঢ্যাঙা বপু দেখেই আঁতকে দাঁড়িয়ে উঠলেন সুযোধন। তারও পেছনে ধরুকে কোলে নিয়ে গোপা ঘরে ঢুকতেই সবেগে উঠে দাঁড়াল কিরণ আর চন্দনা।

কড়া গলায় অমু-দারোগা বললেন, "এই নাটকটা করার দরকার ছিল কি ? টেলিফোনে বললেই তো হত ?"

পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্দ্রনাথ বললে, "তাতে জিনিসটা এত সহজে বোঝানো যেত না।"

"কিছুই তো বুঝলাম না মশাই।"

"একটা জিনিস তো বুঝেছেন, সুযোধন চোপদার নির্দোষ ?"

"আপনি বুঝলেন কী করে ?"

"এই ঘরে বসেই মনের চোখে ঘটনাগুলো দেখতে পেয়েছিলাম বলে। অমিয়বাবু, কিডন্যাপারের চিঠি প্রথমবারে সুযোধনবাবুর বাড়ির দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল। অদ্ভুত নয় কি ? কিডন্যাপার কখনও নিজের বাড়িতে মুক্তিপণের

কাগজ গুঁজে রাখে ? তৃতীয় চিঠিটাও পাওয়া গেল তাঁরই পেট্রলপাম্পে ? আরও অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না ? টাকার বাক্সও ছুঁড়ে ফেলা হল তাঁর বাড়ির কাছে। আশ্চর্য কাকতালীয় ! প্রচণ্ড মনোবল থাকলে ঝানু কিডন্যাপার এইভাবে নির্দোষ সাজবার চেষ্টা করে। পুলিশ যেন ভাবে, নিশ্চয় কেউ তাকে ইচ্ছে করে ফাঁসাতে চাইছে। কিন্তু সুযোধনবাবু ননীর পুতুল, এইরকম উৎকণ্ঠা তৈরি করে তার মধ্যে বেঁচে থাকার ক্ষমতা ওঁর নেই। তাই না সুযোধনবাবু ?"

সুযোধন চোপদার হাসলেন। মেঘ কেটে যাওয়ার পর ঝকঝকে আকাশের হাসি।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তা হলে এমন কেউ সুযোধন চোপদারকে ফাঁসাতে চাইছে, যে কিরণ চোপদারের কাছের লোক, তাঁর ব্যবসায় ঠিক লাখ টাকা নগদে ঘুরছে—এ খবর জানে, ধরু কখন একলা থাকে, সে-খবরও রাখে। সে কে ?"

"কে সে ?" হুঙ্কার ছাড়লেন অমিয় দারোগা।

"তার মনোবল প্রচণ্ড। টেনশন সইবার ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। সে কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিল যে, সুযোধনবাবুর পেট্রলপাম্পে তৃতীয় চিরকুট ফেলে দিলে ভোর রাতের আগেই তা কিরণবাবুর হাতে পৌঁছবেই ?"

চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে অমু-দারোগার, "ও মাই গড !"

"কে আগে দেখেছিল তৃতীয় চিরকুট ?"

"কোকো।"

"দরজার তলায় অ্যালুমিনিয়াম পাটি লাগানো—চৌকাঠে খাপে-খাপে বসে যায়। তার ফাঁক দিয়ে চিরকুট ঢুকিয়ে ঘরের মেঝেতে কি ফেলা যায় ? যায় না ? তা হলে, কিডন্যাপারই দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পকেট থেকে চিরকুট বের করে হাতে নিয়ে নাচুভাইকে ডেকেছে।"

"কোকো !"

"হ্যাঁ, কোকো। দুর্দান্ত ছোকরা কোকো। ট্রাকের ব্যবসায় নিশ্চয় নতুন ট্রাক কেনার ফিকিরে ছিল—খোঁজ নিলেই জানবেন। তাই এক লাখ টাকা বাগানোর এই পরিকল্পনা করে। ধরুর মা বেরিয়ে যেতেই তারের জাল কেটে ঘরে ঢুকেছিল। ধরুর মুখে তোয়ালে জড়িয়ে মুখ টিপে ধরে ছুটে পালিয়ে যেতে যেতে যখন বুঝল, ধরু আর গোঙাচ্ছে না, নড়ছে না, তখন ভেবেছিল তোয়ালের চাপে বোধহয় দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। না, মারা যায়নি। কোকো কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে ডাকাতে কালীর জঙ্গলে ওর দেহ ফেলে দিয়ে পালায়।"

"তারপর ?" উদগ্রীব হয়ে বসেছেন অমু-দারোগা।

"তারপরের ঘটনা কি গোপা চোপদার বলবেন ?" বললে ইন্দ্রনাথ।

"আপনিই বলুন," ধরুর গাল টিপে দিয়ে চোখ নামিয়ে বললেন গোপা।

"বেশ, আমিই বলছি। ছেলেপুলের জন্য মানত করতে উনি গিয়েছিলেন ডাকাতে কালীর জঙ্গলে। হঠাৎ দেখতে পেলেন ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে ধরু। ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ধরু যে এখনও বেঁচে আছে, এটা যদি

কিডন্যাপার জানতে পারে, তা হলে আবার ধরু গায়েব হতে পারে—এই ভয়ে তাকে লুকিয়ে রাখবেন ঠিক করেন। আসবার সময় মা-কালীর সামনে গিয়ে প্রণাম করার সময়ে ধড়ফড় করার ফলে ধরুর আঙুলের গোরুর চোখ খুলে পড়ে যায় মায়ের পায়ের তলায়।"

"গোরুর চোখ?" অমু-দারোগার প্রশ্ন।

"গোমেদ। মানে, গোরুর চোখ। সেই পাথর বসানো আংটি দেখেছিলেন ধরুর-মা। হাড়িকাঠে রক্ত দেখে ধরে নিয়েছিলেন ধরু আর নেই। কিন্তু উনি এটা ভাবেননি যে, রক্তটা পাঁঠাবলির রক্ত হতে পারে।"

"আপনি কেন ভাবলেন?"

"ভাবলাম এই কারণে যে, সুযোধনবাবুই বলেছিলেন, ওঁর স্ত্রী ছেলেপুলের জন্য মানত করতে মন্দিরে গিয়েছিলেন। সে মন্দির তো ও অঞ্চলে এই ডাকাতে কালীর মন্দির। গোপা চোপদার কি তা হলে ধরুকে নিয়েই সটকান দিয়েছেন? ধরুকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার জন্য? তাই মৃগাঙ্ককে পাঠালাম ওঁর বাপের বাড়িতে। সেখানেই বহাল তবিয়তে পাওয়া গেল ওঁদের। কী হে পিন্টু, তুমি নাকি জামাইবাবুর মাথায় লাঠি মারতে চাও?"

"কে বলেছে?" বুক চিতিয়ে বললে পিন্টু-মস্তান।

স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন সুযোধনবাবু, "আরে, ওটা একটা রসিকতা। খেপে যাচ্ছ কেন?"

কোকো ধরা পড়েছিল। অমু-দারোগার ঠেঙানি খেয়ে সব কবুল করেছিল। যে পেনসিলে চিরকুটগুলো লিখেছিল, সেই পেনসিল আর বাদামি কাগজের একগাদা ঠোঙা ওর ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল।

সেই সঙ্গে জুতোর বাক্স-ভর্তি এক লাখ টাকা।

তা থেকে একটা একশো টাকার বাণ্ডিল ইন্দ্রনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কিরণ আর চন্দনা।

অলৌকিক আখড়া রহস্য

ইলেকট্রনিক মজা

ইন্দ্রনাথকে ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য জমিয়ে আড্ডা মারা। ও বড্ড একলা থাকে। সঙ্গ দেওয়া দরকার। আমারও দরকার সুভাষ সরোবরের টাটকা হাওয়া।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। তারপরেই শুনলাম ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর :

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...

খুট করে কেটে গেল লাইন। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রনাথের গলা চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু এরকম বিদঘুটে রসিকতাও আশা করিনি।

আবার ডায়াল করলাম। আবার সেই একঘেয়ে বয়ানের গা-জ্বালানো পুনরাবৃত্তি :

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...

এবারও লাইন কেটে যেতে রিসিভার রেখে দিয়ে বললাম, "শুনছ ?"

কবিতা বললে, "কী ?"

"ইন্দ্রনাথের এই নতুন মজাটা একদম ভাল লাগছে না।"

"কী মজা ?" ঝুঁকে বসল কবিতা। গোয়েন্দা ইন্দ্রঠাকুরপোর নাম শুনলেই রাজ্যের কৌতূহল জড়ো হয় কবিতার চোখেমুখে। গোয়েন্দা গল্পের নম্বর ওয়ান পোকা যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে এই কবিতা, আমার বউ।

"যতবার ফোন করছি, ততবার 'নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব' বলে লাইন কেটে দিচ্ছে।"

হেসে ফেলল কবিতা। ওর সেই মার্কামারা হাসি। যে-হাসি রাজরানিরা হাসে। হেসে কুটিপাটি হয়ে বললে, "তোমার মাথায় গোবর আছে। বাস করছ ইলেকট্রনিক যুগে। ইলেকট্রনিক ঠাট্টা-মজার খবর রাখ না ?"

"ইলেকট্রনিক মজা !"

"ইন্দ্রঠাকুরপো একলা থাকে তো। যখন থাকে না, তখন টেলিফোন ধরবে

কে ? তাই ইলেকট্রনিক যন্তর বসিয়েছে। সেই যন্তরেই নিজের গলা রেকর্ড করে গেছে। জানে তো আজ শনিবার, তুমি ফোন করবে, তাই মজা করছে।"

রেগেমেগে বললাম, "কলেজ লাইফ থেকে ওর এই সৃষ্টিছাড়া মজার ঠেলায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। এই জন্যই ওর কিচ্ছু হল না।"

"সত্যিই কি হয়নি ?" বলে আর-একদফা হাসি হাসল কবিতা। এ-হাসিটা বিদ্রূপের হাসি কি না ঠিক ধরতে পারলাম না।

ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক

আমরা এখন বেলেঘাটায়। গাড়ি থেকে নামবার আগেই দেখে নিয়েছি ইন্দ্রনাথের একতলার ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে বন্ধুবর নস্যি নিয়ে ফিরেছে।

গেট খুলতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি, "এসেছে, এসেছে, ডিটেকটিভ গল্পের খদ্দেররা এসে গেছে।"

এবার কিন্তু রেগে গেল কবিতা নিজেই। তেড়েমেড়ে দাওয়ায় উঠে দরজায় ঠেলা দিয়েই অবশ্য থমকে গেল চক্ষের নিমেষে।

ঘরের সোফায় বসে পাশাপাশি দুটি মূর্তি। একটা মূর্তিকে আমরা হাড়ে-হাড়ে চিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এখন তার গায়ে রক্ত রঙের চাদর, পরনে লাল টকটকে ধুতি, কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ। কাপালিক-কাপালিক চেহারা। মৌজ করে নস্যি নিচ্ছে, আর সকৌতুকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তার পাশের মূর্তিটা যে সত্যি-সত্যি কাপালিক ! গালে কালো কুচকুচে দাড়িগোঁফের আফ্রিকান জঙ্গল, লম্বা বাবরি চুলে চিরুনির পাট নেই, গলায় রক্তজবা আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে-বুকে-কণ্ঠায় রক্তচন্দনের মাখামাখি, চোখ দুটো আগুনের গুলির মতো ধকধকে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল কবিতা। ভড়কে গেছিলাম আমিও। তাই দেখে অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। এঁকে দেখে ভিরমি খাওয়ার দরকার নেই। এঁর চেহারাটা বিকট হতে পারে, মানুষটা অপরূপ, বিশেষ করে এঁর সাধনা।" এই পর্যন্ত বলেই বিকট কাপালিকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "বলুন না মশাই, আপনার নামটা বলুন।"

কাপালিক ভদ্রলোকের হাইট ইন্দ্রনাথের চেয়ে ইঞ্চিকয়েক বেশি। মানুষ-দৈত্য বললেই চলে। ইন্দ্রনাথের গুঁতো খেয়ে তিনি কিন্তু একটু হেসে পড়লেন। বন্ধুবরের নস্যির ডিবেটা দেখলাম তাঁর বাঁ হাতে। ডান হাতের দু' আঙুলে করে বেশ খানিকটা তামাকু-চূর্ণ নাসিকা-গহ্বরে ঠেসে দিয়ে নাকের ডগা মুছতে-মুছতে বললেন, "আমার নাম নাদাচার্য।"

চমকে উঠলাম গলার আওয়াজ শুনে। দৈত্য-বপুর গলা থেকে স্টিরিও-আওয়াজ বেরোবে ভেবেছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে উলটো।

বাচ্চা ছেলের মতো কচি গলায় কথা বলছেন নাদাচার্য। এবং বিলক্ষণ আধো-আধো গলায়।

আমার আর কবিতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চয় করুণা হল নাদাচার্য কাপালিকের। তিনি বললেন ইন্দ্রনাথকে, "দেখলেন তো, আমার গলা শুনেই কীরকম হয়ে গেলেন। স্রেফ এই জন্যই আমি কথা বলতে চাই না। কেন যে মা-তারা আমার গলাটাকে পাকিয়ে তুললেন না।"

কবিতা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাশাপাশি বসলাম আর-একটা সোফায়। বললে কাষ্ঠহেসে, "সবার গলা কি মোটা হয় ?"

আগুনচোখ মেলে নাদাচার্য আধো-আধো সরু গলায় বললেন, "না হোক, পুরুষালি গলা হতে ক্ষতি কী ছিল। তারা, তারা ব্রহ্মময়ী ! হাজার হলেও আমি তো তান্ত্রিক।"

"বস্তাপচা শস্তা তান্ত্রিক অবশ্য নন"—পাশ থেকে বলে উঠল ইন্দ্রনাথ, "রীতিমত ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক।"

সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। বিশেষ করে নাদাচার্য মশাইয়ের হাসিটা শুনে। এত মিষ্টি, এত সুরেলা হাসি কচিকাঁচারাই শুধু হাসতে পারে।

কিন্তু ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক ! সেটা কী বস্তু ?

আমাদের মানে আমার আর কবিতার মনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মনের একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। মুখ খোলার আগেই ও বুঝে নেয়। এখনও বুঝল, বেজায় ধোঁকায় পড়েছি কর্তা-গিন্নি দু'জনেই।

ইন্দ্র তাই বললে, "হে বউদি, হে মৃগাঙ্ক, ডিটেকটিভ গল্পের অনেক ছাইভস্ম তোমরা পড়ছ আর লিখছ। কখনও কি শুনেছ তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্সকে প্রয়োগ করা হচ্ছে ?"

"তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্স !" আমার কণ্ঠস্বর অনেকটা খাবি খেতে-খেতে কথা বলার মতো শোনাল।

"মডার্ন-ফিজিক্স যে-অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে, নতুন-ফিজিক্স সেখানে আলোকপাত করতে চলেছে। এজন্য দরকার মাইক্রোচিপ।"

"মা, মা।"

"মাইক্রোচিপ। ইলেকট্রন যার প্রাণ। যে ইলেকট্রনকে কেউ কোনওদিন দেখতে পাবে না, সেই ইলেকট্রনের খেলবার জায়গা মাইক্রোচিপ। যে জিনিস কম্পিউটারে লাগে, মাইক্রোপ্রসেসরে লাগে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?"

"না, না তো !"

"নাদাচার্যমশাই নিজেই ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক। পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ আনিয়েছিলেন এই কারণেই।"

"পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ !"

"হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ। তার এখনকার বাজার দাম পাঁচ কোটি টাকা। সব চুরি হয়ে গেছে।"

ফস করে বললে কবিতা, "এইজন্যই বুঝি কাপালিক সেজেছ ?"

"নইলে চোর ধরব কী করে ?" বলে নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াল ইন্দ্রনাথ।

টরে-টক্কা পোস্টকার্ড

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াতেই নাক সিঁটিয়ে কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ল কবিতা। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে, "খবরদার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ মুখ খুলবে না।"

অমনি তারস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, "বউদি, ফ্রিজে এক কিলো ভেড়ার মাংস আছে।"

"ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, নুন, পাতিলেবু, মাখন ?" ভুরু কুঁচকে বললে কবিতা।

"স-ব আছে। বানাবে কী ?"

"মাটন মোরব্বা।"

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক, "তোফা ! তোফা ! তারা ! তারা ! ব্রহ্মময়ী !"

মাটন মোরব্বা উদরে প্রস্থান করেছে। চোখে পাকিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রয়েছে কবিতা।

ইন্দ্রনাথ একটা ঢেঁকুর তুলে বললে, "ব্যাপারটার শুরু একটা টরে-টক্কা পোস্টকার্ড থেকে।"

"টরে-টক্কা পোস্টকার্ড !" কবিতার চোখ একটু ছোট হল।

"কাল রাতে বাড়ি ফিরে লেটার-বক্স খুলে পেলাম একটা পোস্টকার্ড। এই সেই পোস্টকার্ড।"

বলে, টেবিলের রাশি-রাশি কাগজ, পত্রিকা আর চিঠির মধ্যে থেকে একটা পোস্টকার্ড তুলে এগিয়ে ধরল ইন্দ্রনাথ। হাত বাড়িয়ে নিল কবিতা। নিমেষে চোখ বোলানো হয়ে গেল। ভুরু দুটোয় একটু ঢেউ খেলিয়ে বললে, "কচি খোকার লেখা মনে হচ্ছে।"

"হেঁ, হেঁ, ওটা আমার লেখা," যেন মরমে মরে গেলেন তান্ত্রিকমশাই।

কার্ডটা হাতে নিলাম আমি। চিঠিটা লেখা হয়েছে এইভাবে :

ওহে ইন্দ্রনাথ,

তোমার মতো অপদার্থ গোয়েন্দাদের গোল্লায় যাওয়া উচিত। তোমার কবচ হয়ে গেছে। হাতে পরলেই গুলিগোলা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলেও তোমার মরণ হবে না (যদিও হলে বাঁচতাম)। আসবে কবে বাছাধন ? ডেরায় গিয়ে নিয়ে নিও। দশ হাজারের বাণ্ডিল ছেড়ে যেও। ইতি

তোমার যম
নাদাচার্য

চিঠি পড়ে বললাম কবিতাকে, "হাতের লেখা তো পাকা। কচি খোকার লেখা বললে কেন ?"

"এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দা গল্প লেখো কেন ? পোস্টকার্ডের বর্ডারগুলো চোখ এড়িয়ে গেল ?"

"বর্ডার ? ও হ্যাঁ, চারদিক ঘিরে শুধু লেখা রয়েছে ইংরেজি জিরো আর ওয়ান। এক-একজনের ওরকম খেয়াল থাকে। নাদাচার্যমশাই দেখছি জিরো আর ওয়ানের খুব ভক্ত।"

"হেঁ হেঁ হেঁ !" কাষ্ঠহাসি হাসলেন নাদাচার্য, "এখনও ধরতে পারলেন না।"

তাকালাম জুলজুল করে, "কী ধরতে পারলাম না ?"

"মেসেজটা।"

অসহায় চোখে তাকালাম ইন্দ্রনাথের দিকে, "কিসের মেসেজ রে ?"

ইন্দ্রনাথের তখন সবে একটিপ নস্যি নেওয়া হয়েছে। নাকের ডগা মুছছে। চোখে একটু জলও এসে গেছে। সেই অবস্থাতেই বললে, "জিরো আর ওয়ান ঠিক একটা ফরমুলার মতো সাজানো রয়েছে না ?"

"কীরকম ভাবে ?"

আবার তাকালাম পোস্টকার্ডে দিকে। যা দেখলাম, তা নিচে এঁকে দেখাচ্ছি—

ওঁ তুল্ল 00011000 ওঁ তুল্ল 00011000 ওঁ তুল্ল

00011000 ওঁ তুল্ল 00011000

ওঁ তুল্ল ওঁ তুল্ল

ওহে ইন্দ্রনাথ,

তোমার মতো অপদার্থ গোয়েন্দাদের গোল্লায় যাওয়া উচিত। তোমার কবচ হয়ে গেছে। হাতে পরলেই গুলিগোলা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলেও তোমার মরণ হবে না (যদিও হলে বাঁচতাম)। আসবে কবে বাছাধন ? ডেরায় গিয়ে নিয়ে নিও। দশ হাজারের বাণ্ডিল ছেড়ে যেও। ইতি

তোমার যম

নাদাচার্য

00011000 ওঁ তুল্ল 00011000 ওঁ তুল্ল 00011000 ওঁ

00011000 ওঁ তুল্ল 00011000 ওঁ তুল্ল

ইন্দ্রনাথ আমার মুখের অবস্থা দেখেই বুঝেছিল হালে পানি পাচ্ছি না। তাই বললে, "মুর্খ মৃগাঙ্ক, ইংরেজিতে টরে-টক্কা মেসেজ যখন লেখা হয় 'ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট'—তখন কী বোঝায় ? বুঝলে না ? মর্স কোড-টা

এই," বলতে বলতে পোস্টকার্ডের উলটো দিকে লিখল ইন্দ্রনাথ :

••• — — — •••

ফস করে উঠল কবিতা, "পতাকা সঙ্কেত অথবা আলোর সঙ্কেত তো এই একই মেথডে পাঠানো হয়। কলেজ লাইফে শিখেছিলাম। বলব আমি ?"

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "জানতাম তুমিই বলবে। ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট—কী মানে, বউদি ?"

"সেভ আওয়ার সোলস ; সংক্ষেপে এস. ও. এস. ; বাংলায় বাঁচাও, বাঁচাও। জাহাজডুবির সময়ে অথবা সেইরকম বিপদে পড়লে এই সঙ্কেত পাঠানো হয়। কিন্তু ঠাকুরপো, জিরো আর ওয়ানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?"

"বউদি, এটা ইলেকট্রনিক সিগন্যাল।"

"খুলে বলো।"

"000 111 000 সঙ্কেতে এস. ও. এস. মেসেজ পাঠানো হয়েছে। প্রতিবার এস. ও. এস. লিখে মাঝে 'ওঁ তুল্ল' লেখা হয়েছে নিছক ভড়কি দেওয়ার জন্য অবশ্য নয়।"

এবার সটান বড়-বড় চোখ মেলে নাদাচার্যের দিকে তাকাল কবিতা, "পোস্টকার্ডে অত গোপনে 'বাঁচাও বাঁচাও' করলেন কেন ?"

কবিতার ধমক তো ! বেলুনের মতো চুপসে গেলেন নাদাচার্য। রক্তচক্ষু ছোট্ট করে ফেলে তাকালেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, "নাদাচার্য তান্ত্রিককে আমি চিনি না। কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন। ইলেকট্রনিক মেসেজ পাঠিয়ে আমার সাহায্য চেয়েছেন। যাদের ভয়ে গোপন সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন, তারা নিশ্চয় তাঁর ডেরা-র সন্ধানও জানে। সুতরাং গবেষণা করতে লাগলাম, কোন চুলো থেকে এসেছে পোস্টকার্ডটা। পেয়েও গেলাম।"

"কোত্থেকে ?"

ঝুঁকে বসল ইন্দ্রনাথ, "অলৌকিক আখড়া যে অঞ্চলে—সেখান থেকে।"

অলৌকিক আখড়া

একটা ছোট এলাচ তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে কবিতা বললে, "আখড়া কখনও অলৌকিক হয় ?"

"কেরালায় আছে এন্তার, কলকাতায় হয়েছে একটা।"

"অলৌকিক আখড়া ?"

"হ্যাঁ বউদি, হ্যাঁ। কেরালার থ্রুসুর জেলায় থুকথুক করছে প্রেতলোকের এজেন্টরা—তিন হাজার বছর ধরে। তারা অশরীরীদের ধরে এনে মানুষের উপকার করায়—অপকারও করায়।"

"বলছ কী ঠাকুরপো !"

"হুঁ হুঁ, বউদি, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সব খবরই রাখতে হয় আমাকে।"

"তোমার এই অহঙ্কারেই একদিন পতন ঘটবে।"

"আমার তো ? তাতে মৃগাঙ্করই ক্ষতি, গল্পের মসলা পাবে কোথায় ? হ্যাঁ, কী বলছিলাম ? অলৌকিক আখড়া, ভূতপ্রেতের মঠ, কেরালার এই জেলাটা তাদের বড় আড্ডা। সবচেয়ে বড় ঘাঁটি কেরালার সাংস্কৃতিক শহর থ্রিসুরে—ভূত-গুরুদের শহরও বলতে পারো—এরকম ভূতপুজো তুমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবে না।"

"ভূতপুজো ! ভূত-গুরু ! তোমার মাথা ঠিক আছে তো ঠাকুরপো ?"

"বিলক্ষণ ঠিক আছে। আর-একটু নস্যি নিলে আরও ঠিক হবে। নেব ? আচ্ছা, আচ্ছা নেব না। কুট্টি চাথান-দের নাম শোনোনি নিশ্চয়। কেরালায় ভূত-গুরুদের বলা হয় কুট্টি চাথান। প্রায় কুড়িটা মঠ আছে শুধু এই একটা জেলাতেই, 'চাথান সেবা মঠ' নামেই এরা বিখ্যাত। রোজ এক হাজার মানুষ যায় এইসব মঠে ভূতেদের দয়া ভিক্ষা করতে।"

"ভূতেদের মঠ বলে কিছু কি থাকতে পারে ?"

"আছে বউদি, আছে। তিন হাজার বছর ধরে ভূত-গুরুরা দাপিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে যে মঠটায়, তার নামটা শুধু শুনে রাখো...আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া।"

"আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া ?"

"বাঃ, বাঃ, বেশ তো উচ্চারণ করে গেলে। 'কানাড়ি মঠ'টা তা হলে সহজেই মনে থাকবে—এর বয়স দেড় হাজার বছর। তিন নম্বর বিখ্যাত মঠটার নাম একেবারে মনে গেঁথে যাবে, শ্রীকালী চাথান সেবা মঠ।"

"মা-কালীকে নিয়ে কারবার !"

"কে না করছে ? যাক সে-কথা। সমাজমনোবিজ্ঞানী আর যুক্তিবাদীরা যতই চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাক না কেন, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রোফেসর, অ্যাডভোকেট, জার্নালিস্ট, পলিটিশিয়ানরাও দলে-দলে এইসব মঠে ভিড় করছে। কেউ-কেউ আসছে সুদূর রাজস্থান থেকেও। দক্ষিণা দিচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সাড়ে চারশো..."

"টাকা ?"

"তবে কি পয়সা ? কড়কড়ে খরচ গুনে দিতে হয় পুজো বা অর্চনার জন্য। মঠের বেদির সামনে একজন মিডিয়ামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে বলতে হবে, কী তোমার যাচ্ঞা। নিজের মঙ্গল চাও, না অন্যের ক্ষতি করতে চাও।"

"অন্যের ক্ষতির জন্য ভূতপুজো ?"

"কথা না বলে শুনে যাও বউদি। ভূত-গুরু যে শক্তির আরাধনা করে, সে শক্তি যে পয়লা নম্বর কুচুটে আর করাল, তা কে না জানে। সুতরাং তুমি যদি চাও অমুক লোকের পেটের নাড়িভুঁড়িগুলোকে পেটের ভেতরেই ক্যাঁচ করে কেটে দেবে, তা হলে ভূত-গুরু সেই ব্যবস্থাই করবে। কীভাবে জানো ? মিডিয়াম তোমার আরজি শুনবে। তারপর অপদেবতা তার ওপর ভর করবে। সে বোঁ-বোঁ করে পাক খাবে, চোখ ঘুরিয়ে হাঁই-হাঁই করে অনেক কথা বলে যাবে, ভূতের ভাষা বলে একবর্ণও

বুঝবে না তুমি। তারপর ভূত-গুরু হঠাৎ কারও কাছ থেকে একগোছা পান নেবে। বেদির সামনে পুজোটুজো করে কচ করে বোঁটাগুলো কেটে দেবে, যার ক্ষতি করতে চাও, তার নাড়িভুঁড়িগুলোও সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক যেন খুর দিয়ে কাটা হয়ে যাবে।"

"ইস্ ! সত্যি কি তাই হয় ?"

"শোনা কথা। মা-কালী জ্বলন্ত সরা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্যও নাকি অনেকে দেখেছে। সেই সরার মধ্যে দেখা গেছে গনগনে কাঠকয়লা, মেটে সিঁদুর, জবাফুল, গলাকাটা একটা পায়রা..."

"ও মাগো !"

"তা হলে আর বলব না। যদি কারও যেতে ইচ্ছে হয়, বলবে মঙ্গল আর শুক্রবারে যেতে।"

"শনি-মঙ্গলে নয় ?"

"না। এখানে যত রহস্য ওই মঙ্গল-শুকুরে। যেমন ঘটছে কলকাতার কুশগ ওয়ানচেং মঠে।"

"এটা তো কেরালা-নাম বলে মনে হচ্ছে না, ঠাকুরপো।"

"ধরেছ ঠিক। তিব্বতে একজন বিখ্যাত লামার নাম কুশগ ওয়ানচেং। তাঁর নামেই মঠ। এখানেও হচ্ছে ভূতপুজো। বাঞ্ছাপূরণ। লোকের অমঙ্গল। অনাচার অবিচার আর প্রতারণা।"

"প্রতারণা ! তোমার টনক নড়েছে এই কারণেই ?" আর-একটা ছোট এলাচ তুলে নিল কবিতা।

"তক্কে-তক্কে ছিলাম অনেকদিন ধরেই। ঠিকানাটাও খুঁজে বের করেছিলাম, কিন্তু চান্স পাচ্ছিলাম না ঢুঁ মারার। এখন সুযোগ এসে গেল।"

"এল এই টরে-টক্কা পোস্টকার্ড ?"

"জি হ্যাঁ, বউদি। পোস্টকার্ড পড়েই বুঝলাম, নাদাচার্য নামে এক তান্ত্রিক বড় বিপদে পড়েছেন। তাঁর নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি, কিন্তু তিনি আমার নাড়িনক্ষত্র জেনে বসে আছেন। ভদ্রলোক ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে এক্সপার্ট, অথচ তিব্বতি মিস্টিসিজম বিলক্ষণ জানেন। মোদ্দা কথা, তিনি একজন অত্যাধুনিক তন্ত্রসাধক। লুকিয়েচুরিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। তাঁকে আমি কবচ বানানোর কথা মোটেই বলিনি। অথচ তিনি সেই ভড়ং মেরেছেন চিঠির লাইনে-লাইনে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মর্স কোড লিখলেন কেন? নিশ্চয় যাদের হাত দিয়ে পোস্টকার্ড ফেলতে দিয়েছেন—তারা যেন বুঝতে না পারে এস. ও. এস. মেসেজ—শুধু বুঝবে যে, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র নামে একটা অখদ্যে গোয়েন্দা হাজার দশেক টাকার তোড়া নিয়ে হাজির হবে নাদাচার্যর ডেরায়। এবং এই টাকাটাই তাদের দরকার—নিশ্চয় মুক্তিপণ হিসেবে। পরিষ্কার ?"

কবিতা বললে, "একেবারে। কিন্তু তুমি বুঝলে কীভাবে ব্যাপারটা কুশগ ওয়ানচেং মঠেই ঘটছে ?"

চোখ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওই একটা রহস্যই শুধু তোমাকে ফাঁস করতে হবে। তবেই বুঝব তুমি গোয়েন্দা-লেখকের উপযুক্ত বউ।"

রেগে গিয়ে কবিতা বললে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন বলো, গিয়ে কী দেখলে কুশগ ওয়ানচেং মঠে ?"

"দেখলাম শরীরী প্রেত," বলে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, বেশ আওয়াজ করে।

শরীরী প্রেতের নাচ

ইন্দ্রনাথ ছবির মতো বলে গেল ঘটনাটা :

"জায়গাটা বড় রাস্তার ধারে হলেও নির্জন। ট্রাম লাইন নেই। সরকারি বাস রুট আছে একটাই। বিবিডি বাগের বাস। সন্ধের পর তাই বাস চলে না। ঝিমিয়ে পড়ে গোটা অঞ্চলটা।

রাস্তার দু'পাশে কারখানার টিনের শেড। গুদাম আর খাটাল। গাছগাছালি এন্তার। মাঝে-মাঝে পুরনো বাগানবাড়ি, ফটক আর থাম এখন শ্রীহীন। দূরের বারান্দা আর তার পেছনকার একতলা বাড়ি আরও শ্রীহীন। এখন সেসব জায়গায় নানা কারবার।

একসময়ে কলকাতা এই পর্যন্ত ছিল না, এখন ছাড়িয়ে চলে গেছে সল্টলেকে। এখানে, এই বড় রাস্তার ধারে, একটা বটগাছের ঝুপসিতে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ।

ওই যে একতলা বাড়িটা, ওই বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনেক দুর্নীতির বাসা। কিন্তু সেই কুকর্ম যে কী, তা সঠিক জানা যায়নি। তবে কালীপুজো হয় এখানে ধুমধাম করে। ভোরবেলা থেকে ভক্তরা আসে। ইচ্ছাপূরণ হয়। চলে যায় টাকার থলি রেখে দিয়ে।

এই সেই কুশগ ওয়ানচেং মঠ। যদিও মঠ বলে মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়ি বললেই চলে। সর্বাঙ্গে ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ সুস্পষ্ট। নিশ্চয় এককালে কোনও সাহেব থাকতেন। বড়-বড় থাম, উঁচু-উঁচু জানলা, পেল্লায়-পেল্লায় দরজা আর ফুটবল খেলার মতো বিশাল ছাদটা সেইসব স্মৃতি বহন করছে। আধো অন্ধকারে ছাদের ওপর পায়রা ওড়ানোর কেরামতিও চোখে পড়ছে। লম্বা একটা লগা, তার মাথায় চৌকোনো জাল পাতা।

ইন্দ্রনাথ তান্ত্রিক বেশে এসেছে। বগলের ফাঁকে অবশ্য ওর প্রিয় সঙ্গী রিভলভারটা আছে। বলা তো যায় না, অলৌকিকের আখড়াগুলোতেই লৌকিক কদর্যতা প্রকাশ পায় সবচাইতে বেশি।

জায়গাটা এখন একটু ফাঁকা। সন্ধের পর ঝট করে এদিকে কেউ আসতে চায় না। দুটো কারণে—এক, ওই বাড়ির পেছনেই আছে একটা গোরস্থান। দুই, জায়গাটায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা একটু বেশি।

ইন্দ্রনাথ তবুও এসেছে। নাদাচার্য লোকটার পোস্টকার্ড পেয়েই ও বুঝেছে, তান্ত্রিক ভদ্রলোক তাকে ঠিক এখানেই আসতে বলেছে। কেন আসতে বলেছে—সেটা একটু অ্যাডভেঞ্চার না করলে জানা যাবে না।

জোনাকির আলো জ্বলছে গাছপাতার অন্ধকারে। ঝিঁঝি ডাক শুরু হয়েছে। এমন সময়ে একটা খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল।

আওয়াজটা এল ইয়ামোটা বটের গুঁড়ির দিক থেকে।

বডি না ঘুরিয়ে আড়চোখে সেদিকে তাকাল ইন্দ্রনাথ।

একটা ভাঙা গাড়ি পড়ে আছে গুঁড়ি ঘেঁষে। যে গাড়ির চাকা লুঠ হয়ে গেছে। মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে চেহারাটাও পালটে গেছে। জানলা-দরজার বালাই নেই।

আওয়াজটা আবার শোনা গেল তার মধ্যে।

আর ঠিক তার পরেই একটা পেন্সিল টর্চের মতো সরু আলো ফ্ল্যাশ দিয়ে উঠল মর্স কোডের সঙ্কেতে।

নাদাচার্য নাকি ?

পায়ে-পায়ে সেদিকেই একটু সরে গেল ইন্দ্রনাথ। কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেল কচি মিহি গলায় উদার আহ্বান, "আসা হোক ! আসা হোক ! ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশ্চয় ?"

আর-একটু এগিয়ে গিয়ে ততোধিক মিহি গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "মহাশয় কি নাদাচার্য ?"

"ধরেছেন ঠিক। এই না হলে গোয়েন্দা ! আমার সঙ্কেতের মানে আপনি অন্তত বুঝবেন, এটা জানতাম।"

"পোস্টকার্ডের সঙ্কেত ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ...ঢুকে আসুন... ভয় নেই .... ভয় নেই ... আমি যখন আছি। আপনিও থাকবেন।"

বগলের রিভলভারে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ধূলিধূসরিত ভাঙা গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

অমনি ফুস করে পেন্সিল টর্চ জ্বলল ওর মুখের ওপর। সেই আলোয় নাদাচার্যর মুখাবয়বও অবলোকন করে নিল ইন্দ্রনাথ।

বললে, "এই বিরাট চেহারা নিয়ে এরকম কচি গলায় কথা বলেন কেন ?"

"তারা ! তারা ! ব্রহ্মময়ী !" বললে কচি গলা, "আপনাকে ডেকেছিলাম উদ্ধার পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার আর দরকার হল না। আমিই পালিয়ে এসেছি চান্স পেতেই। একেবারে চম্পট দিইনি শুধু আপনার জন্য। আপনাকে না আবার ফাঁদে ফেলে।"

"খুলে বলুন মশাই।"

"যা ধুলো, ঘাড় গুঁজে কথা বলা যায় ? আপনার বাড়ি গিয়ে বলব। তার আগে ভূত দেখে যান।"

"ভূত !"

"গোরস্থান থেকে তো ভূত ধরে আনে এরা। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিকদের আড্ডা মশাই। আমাকে ধরে এনেছিল আমার ঘিলুর বড়া খাবে বলে, তাতে নাকি ওদের শক্তি আরও বাড়বে।"

"ঘিলুর বড়া !"

"পরে শুনবেন। দেরি করলে আপনার ঘিলুর বড়াও বানাতে পারে।"

"ভূত আসে গোরস্থান থেকে ? আপনি দেখেছেন ?"

"না দেখলে পেত্যয় হল কী করে ? আসেন, আসেন, আপনাকেও দেখাচ্ছি।"

এই 'আসেন, আসেন' শুনেই ইন্দ্রনাথ বুঝেছিল, নাদাচার্যমশাই বাঙাল। কিন্তু আর কথা বাড়ায়নি। নিঝুম রাতে গাছপালার অন্ধকার ঠেলে ওকে নিয়ে নাদাচার্য পৌঁছেছিল গোরস্থানের ভেতরে। একতলা বাড়িটার একটা জানলার কাচ ভাঙা। পা টিপে-টিপে তার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন ভেতর দিকে।

টানা লম্বা ঘরটায় নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। নীল ধোঁয়া পাকসাট খাচ্ছে। মেঝেতে বসে দশ-বারোজন নারী এবং পুরুষ। বিভিন্ন বয়সের। বিভিন্ন জাতের। প্রায়-অন্ধকার নীলচে আভায় এর বেশি দেখা যায়নি।

দেখা যা গেছিল, তা অতি ভয়ঙ্কর।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে ভাসছে একটা নর-করোটি।

শুধু একটা কঙ্কালের মুণ্ডু। সাদা হাড় ঘিরে ঘুরে-ঘুরে উড়ে যাচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। মুণ্ডুটা একদৃষ্টে কোটর-চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে মেঝেতে আসীন মানুষ ক'জনের দিকে।

ভাসমান মুণ্ডুর সামনে একটি মেয়ে তাথৈ-তাথৈ নেচে চলেছে। তার সারা গায়ে রক্ত রঙের শাড়ি জড়ানো। তার কপাল জুড়ে লাল সিঁদুর লেপা। তার চোখ আধ-বোজা। কালো চুলের রাশি ঝোড়ো মেঘের মতো পুঞ্জে-পুঞ্জে আছড়ে পড়ে সাপটে ধরছে তাকে দমকে দমকে।

অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে কী যেন মেয়েটা বলে যাচ্ছে উদ্দাম নৃত্যের তালে-তালে। সারা ঘর থমথম করছে দুর্বোধ সেই গুঞ্জনধ্বনি—নর-করোটির নিষ্পলক চাহনি আর নীলাভ ধোঁয়ার আবর্তে।

এই পর্যন্ত দেখিয়েই ইন্দ্রনাথকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নাদাচার্য।

কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম

কবিতা গালে হাত দিয়ে সব শুনল। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল পয়েন্টগুলো টুকে ফেলার জন্য। কিন্তু সে সময় আর পেলাম না।

নাদাচার্যমশাই ফোঁত-ফোঁত করে দু'বার নস্যি নিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা ইন্দ্রনাথ মশাইকে খুলে বলেছি। আপনারাও শুনুন। ওই গোরস্থানের বাড়িতে কঙ্কালী গুরু যে ভূত নামানোর খেলা দেখিয়ে চলেছে, তার আসল উদ্দেশ্য পয়সা কামানো।"

"সে তো বটেই," বললে কবিতা, "কিন্তু কীভাবে ?"

"মা-জননী ভারী বুদ্ধিমতী," কচি গলায় স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন নাদাচার্য, "কিন্তু আসল ব্যাপারটা পুলিশও এখনও আঁচ করতে পারেনি। খবরও পায়নি। তাই ডেকেছিলাম রুদ্র সাহেবকে।"

"আসল ব্যাপার কী ?" অসহিষ্ণু গলা কবিতার।

"ভারতের নানা জায়গা থেকে বড়লোকেরা যায় হায়দরাবাদে কিডনি পালটাতে—কাকপক্ষীও অবশ্য জানে না। সেসব কিডনি আসে কোত্থেকে ? স্কুলের ছেলেদের শরীর থেকে।"

"অ্যাঁ !" মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কবিতার।

"এই তো সেদিন পঁচিশজন স্কুলের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ভ্যানে চাপিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়েছিল পিশাচগুলো। দুটি ছেলে সকালে উঠেই কোনও একটা অছিলা দেখিয়ে ভোঁ দৌড় দেয় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তাদের মুখেই সবাই এখন জেনেছে সমস্ত ব্যাপারটা। যাক সে-কথা, কলকাতাতেও এখন শুরু হয়েছে এই ব্যবসা—চালাচ্ছে কঙ্কালী গুরু। কীভাবে ? আরে মা-জননী, কুশগ ওয়ানচেং মঠটার প্ল্যান এসেছে কেরালার মঠগুলোর থেকে। ওই যে মেয়েটা ধেই-ধেই করে নাচছে, ও খুব ভাল মিডিয়াম—ভূতপেত্নিরা চট করে ওর শরীরটাকে আশ্রয় করে নিজেদের কথা বলে যায়। যারা বসে আছে মেঝেতে, তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ—সব লোক আছে, যেমন থাকে কেরালার মঠগুলোয়। এরা প্রত্যেকে হাজার টাকা ফি দেয় কঙ্কালী গুরুকে, আর বলে, গুরু, অমুক লোকটা আমায় বড় কাঠি দিচ্ছে—ওকে সরিয়ে দাও। কী বুঝলে ?"

কবিতা শুধু ঢোঁক গিলল। ওর ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

নাদাচার্য বললেন, "মিডিয়াম তাই শুনে করোটির সঙ্গে কথা বলে নেয়। করোটি ভৌতিক ভাষায় মিডিয়ামকে বলে কী করতে হবে। সে ভাষা শুনতে পায় কেবল কঙ্কালী গুরু। তারপর যে লোকটাকে সরাতে হবে, সে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। মা-জননী দেখছি খুব ঘাবড়ে গেছ ? অদৃশ্য হয়ে যায় মানে বুঝলে না ? তাকে খতম করে দেয় কঙ্কালী গুরুর চ্যালাচামুণ্ডারা। মারার আগে নিয়ে নেয় কিডনি দুটো। সেই কিডনি বসে যায় কোনও এক বড়লোকের পচা কিডনির জায়গায়। দু'দিকে লাভ কঙ্কালী গুরুর।"

এইবার আমি কথা বললাম।

"ইন্দ্রনাথ, তুই কি শুধু রঙ্গ দেখবার জন্য অভিযানে বেরিয়েছিলি ?"

দুই চোখের মণি নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "সত্যিই কি হয় ! জয়ন্ত এতক্ষণে মঠ তোলপাড় করে ফেলেছে।"

জয়ন্ত আমাদের পুলিশবন্ধু।

পায়রাগুলো উড়ে গেছে

ইন্দ্রনাথ নাটক জানে বটে। ঠিক সময় বুঝে জয়ন্তর নামটা বলেছিল। মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতে বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ করে একটা জিপ গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

তার পরেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল জয়ন্তর আখাম্বা মূর্তি, অতিশয় কর্কশ গলায় বললে ইন্দ্রনাথকে, "মজা মারার জায়গা পাসনি ? কোথায় তোর কঙ্কালী গুরু ? সব ভোঁ-ভাঁ। ছাদের পায়রাগুলো সুদ্ধু উধাও।"

ইন্দ্রনাথ বসে রইল সোফায়। কিন্তু সটান উঠে দাঁড়ালেন নাদাচার্য, "সে কী !"

"তিষ্ঠ ! তিষ্ঠ !" কটমট করে তাকিয়ে বলল জয়ন্ত, "খবরের গন্ধ অনেক দিন ধরেই নাকে আসছিল। ইন্দ্রনাথ ঠিক জায়গায় হানা দিল বটে, কিন্তু পাখি গেল উড়ে !"

ইন্দ্রনাথ বলল, "পায়রা গেল উড়ে !"

"হ্যাঁ, পায়রা গেল উড়ে।" বলেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন নাদাচার্য, "পুলিশমশাই, আপনার তিষ্ঠ-তিষ্ঠ রব শুনেও তিষ্ঠোতে পারছি না। আমার আশ্রমে এক্ষুনি আমাকে যেতেই হবে।"

আস্তে-আস্তে ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বগলের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে বের করে তুলে ধরল নাদাচার্যের দিকে।

বললে ভারী মিষ্টি গলায়, "লাভ নেই। গোয়েন্দার দল সেখানেও হাজির। পায়রাগুলোর ঠ্যাং নিয়ে তারা এখন বড় ব্যস্ত।"

পায়রার ঠ্যাং

নাদাচার্যকে নিয়ে প্রস্থান করেছে জয়ন্ত।

ভীষণ রেগে মুখ লাল করে কবিতা বলছে, "এটা কী ধরনের মজা হল ?"

ইন্দ্রনাথ নিরীহ গলায় বললে, "প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ—এর নাম আড়াই প্যাঁচের বাবা।"

কবিতা আরও রেগে গেল।

ইন্দ্রনাথ তখন বললে, "এক ঢিলে দুটো পাখি মারলাম বউদি। নাদাচার্য পাঁচ কোটি টাকার মাইক্রোচিপ স্মাগল করে এনেছিল জুনপুটের একটা দ্বীপ থেকে। মাছ ধরার নাম করে ট্রলার যায় সেখানে। স্মাগলারদের বোট সেখানে নামিয়ে দিয়ে যায় ব্রিফকেস ভর্তি মাইক্রোচিপ। শঙ্করপুরের বন্দরে ওদের বড় আড্ডা। নাদাচার্য ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক না কচু তান্ত্রিক। সে তার আশ্রমের ছাদে পায়রা পোষে। পায়রাদের ঠ্যাঙে মাইক্রোচিপ সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়। দরদাম ঠিক হয়ে গেলে একটা কি খানকয়েক পায়রা উড়িয়ে দেয়। সেই পায়রা এসে বসে কুশগ ওয়ানচেং মঠের ছাদে। কঙ্কালী গুরু ঠ্যাং থেকে মাইক্রোচিপ খুলে ফের উড়িয়ে

দেয় পায়রা, ফিরে যায় নাদাচার্যর মঠে। এইভাবেই চলছিল কারবার চমৎকার। কঙ্কালী গুরু কোথায় যে পালাল ভগবান জানেন, পাঁচ কোটি টাকার লোভে সবক'টা পায়রাকে লুঠ করে এনে রাখল নিজের মঠের ছাদে। তার দল ভারী। তাই নাদাচার্য কায়দা করে ইলেকট্রনিক মর্স কোডের পোস্টকার্ড নিজেই ডাকবাক্সে ফেলে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম। আমাকে দিয়েই পুলিশে খবর পাঠিয়ে হানা দেওয়ালো মঠে। মতলবটা ছিল পরিষ্কার—পায়রাদের খুপরিতে পুলিশ কখনওই হাত দেবে না। কঙ্কালী গুরু ধরা পড়লেই আমাকে নিয়ে মঠে যাবেন তিনি সকালের দিকে। কোনও এক ফাঁকে ছাদে উঠে উড়িয়ে দেবেন পায়রার দল। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে আকাশপথে পাঁচ কোটি টাকার মাইক্রোচিপ ফিরে যাবে তাঁর আশ্রমে। তিনি তাদের সদ্ব্যবহার করবেন।”

কবিতা ফিক করে হাসল, “কী কুচুটে বুদ্ধি তোমার! তার আগেই ওঁর আশ্রমে পুলিশ পাঠিয়েছিলে? ঠিকানা জানলে কী করে?”

“কলকাতার পুলিশ জানে না এমন কিছু নেই,” নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, “তবে হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারে পায়রাগুলোকে নিশ্চয় ছেড়ে দিয়ে যায়নি কঙ্কালী গুরু—সঙ্গেই নিয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “তুই কি সত্যি ভূত দেখেছিস?”

“করোটির ভাসমান মাথাটা তো? সত্যিই দেখেছি—তুই যা ভাবছিস তা নয়—স্লাইড প্রোজেকশন নয়। তা হলে তার দুটো ডাইমেনশন দেখা যেত—থার্ড ডাইমেনশন দেখা যেত না।”

“থার্ড ডাইমেনশন!” বিমূঢ় স্বর কবিতার।

“হ্যাঁ বইকী! কোনও জিনিসের গভীরতা অর্থাৎ পেছন দিকে কতটা রয়েছে, এটা তো ফোটোগ্রাফিতে বোঝা যায় না। সেখানে শুধু দুটো মাত্রা দেখা যায়, কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। কিন্তু তোমার এই মাথাটা যে খোঁপা-টোঁপা নিয়ে পেছন দিকে তিন ফুট ঠেলে রয়েছে...”

“তিন ফুট!”

“ওই হল গিয়ে, ধরো এক ফুট। সেটাকে তো ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যায় না। দরকার আধুনিকতম একটা আবিষ্কারের। তার নাম হলোগ্রাফি।”

“হলোগ্রাফ।”

“হলোগ্রাফ নয়, হলোগ্রাফি। হলোগ্রাফ মানে একজনের হাতে সমস্ত লেখা একখানা দলিল। হলোগ্রাফি মানে ত্রি-মাত্রিক ছবি। লেসার রশ্মি আবিষ্কারের পর ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মতো হলোগ্রাম প্লেট তৈরি হচ্ছে। তাতে ছবি থাকে না, থাকে শুধু সাদা-কালো লাইন আর একই কেন্দ্র ঘিরে অনেক বৃত্ত। এই হলোগ্রাম থেকে কাচের মতো স্ক্রিনে যে ছবি ভাসবে তাকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হবে। ঘরে কম আলো আর ধোঁয়া থাকলে স্ক্রিন প্রায়-অদৃশ্য থাকবে—যেমন দেখা যায়নি কুশগ ওয়ানচেং মঠে। শুধু একটা কঙ্কালের মুণ্ডু, জানলার ফুটো দিয়ে দেখতে-দেখতে আমি ডাইনে-বাঁয়ে চোখে সরিয়ে দেখেছি, নর-করোটির

এপাশ-ওপাশ আবছামতো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দ্যাট ইজ হলোগ্রাফি। জয়ন্তর কাছে রিপোর্ট পরে পাবে। সবই বুজরুকি।"

আমি কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললাম, "বুঝলাম, বুঝলাম, বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না, পোস্টকার্ড হাতে পেয়েই বুঝলি কী করে যে, তোকে যেতে হবে কুশগ ওয়ানচেং মঠে ?"

"বউদি, তুমি বুঝেছ ?" ইন্দ্রনাথের সাফ প্রশ্ন।

কাষ্ঠহেসে কবিতা বললে, "একদম না।"

"এই তো সেই পোস্টকার্ড," বললে ইন্দ্রনাথ, "জিরো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো জিরো-র পরেই প্রতিবার লেখা হয়েছে 'ওঁ তুল্প'। দেখতে পাচ্ছ ? শুধু মানেটা জানা নেই, এই তো ?"

"বলছি তো জানি না !" রেগে যায় কবিতা।

"আমার ওই বইয়ের তাক থেকে 'ম্যাজিক অ্যান্ড মিস্ট্রি ইন টিবেট' বইটা নিয়ে গিয়ে পড়বে। আলেকজান্ড্রা ডেভিড নীল লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তুল্প-র। তুল্প মানে চিন্তার চেহারা। তিব্বতি যোগীরা বিশ্বাস করেন, মন থেকে জগৎসৃষ্টি সম্ভব। মনের শক্তি দিয়ে যে-কোনও বস্তু গড়ে তোলা সম্ভব। ভয়ানক দানব সৃষ্টিও সম্ভব। তিব্বতি ভাষায় একে বলে তুল্প। আর কিছু বলার দরকার আছে ?"

"তিব্বতি তুল্পর আরাধনা চলতে পারে শুধু তিব্বতি মঠ কুশগ ওয়ানচেং-এ ? তাই তো ?" বললাম আমি।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে কবিতা বললে, "ইস্, মাটন মোরব্বা বেশ খানিকটা রেখে দিয়েছি—ভুলেই গেছিলাম।"

"যাও, যাও, গরম করে আনো," বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ড্রাগন হাড়

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর দু'চোখে এখন যেন দুটো হিরের কণা ঝিলিক তুলছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে রেখে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যে-জিনিসটার দিকে, সেটা একটা পুরনো হাড়।

ওর সামনে চেয়ার টেনে বসে রয়েছে একজন চিনেম্যান। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়েছে, ঝুলে পড়েছে। নাকের নীচে রোঁয়ার মতো হলদেটে গোঁফ ঠোঁটের দু' কোণ দিয়ে ঝুলছে। লোকটার দাড়ি বেশ লম্বা। দাড়ির ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে বারবার—পরিষ্কার দেখছি, থির থির করে কাঁপছে রোগা, সরু আঙুল। তিনটে আঙুলে ঝিকমিক করছে তিন ধরনের পাথরবসানো আংটি। গলায় দুলছে লাল আর নীল পুঁতির মালা। গায়ে পুরনো আমলের আলখাল্লা—ছুঁচ আর সুতোর কারুকাজ। মাথায় একদম চুল নেই। কিন্তু চুল আছে বটে ভুরুতে—জট পাকিয়ে রয়েছে। বয়স হয়েছে, তাই চোখের তেজ কমে এসেছে। কিন্তু টেবিল ল্যাম্পের আলো তার চোখে পড়ায়, ছ্যাতলা পড়া চোখের মণির তলায় দেখতে পাচ্ছি অদ্ভুত এক দ্যুতি। ঠিক যেন ছাইচাপা আগুন।

এঁর নাম চিঙলি। থাকেন এখনকার চিনেপাড়ায়, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে। বিপদে পড়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছেন বেলেঘাটায়, সুভাষ সরোবরের পাড়ে, ইন্দ্রনাথের বাড়িতে।

আমি তখন ছিলাম সেখানে। তাই দেখলাম রহস্যময় সেই হাড়। আর শুনলাম আশ্চর্য সেই কাহিনী।

হাড়টা চ্যাটালো। প্রায় চৌকোনা। হলদেটে। ইঞ্চিদেড়েক পুরু। মাঝে-মাঝে চিড় খেয়েছে। ফাটা রেখার গা-ঘেঁষে খোদাই করা অজস্র আঁকিবুকি।

ড্রয়ার টেনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল ইন্দ্রনাথ। বিরাট কাচ। হাতের

তেলোর মতো বড়। হাড়ের হিজিবিজি লেখা আর ছবিগুলো অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর ঘুরে বসল বুড়ো চিনার দিকে। চিঙলি তখন ঘাড় ঝুঁকিয়ে পিঠ কুঁজিয়ে অদ্ভুত চিকমিকে চোখে চেয়ে ছিলেন ইন্দ্রনাথের দিকে। টেবিল ল্যাম্পের আলো ঠিকরে যাচ্ছে চকচকে টাকমাথা থেকে। জটপাকানো ভুরু দুটো আরও জটিল হয়েছে। একে তো বেঁটে থসথসে চেহারা, ওইভাবে কোল-কুঁজো অবস্থায় বসে থাকায় আরও ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ ওর হিরে-ঝিকমিকে চোখে চিঙলি'র অদ্ভুত আলোয়-ভরা চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ঘর এখন নিস্তব্ধ। এত রাতে সুভাষ সরোবরের পাড়েও কেউ বেড়াচ্ছে না। গোটা তল্লাট তাই নিথর।

খুব আস্তে, খুব স্পষ্ট গলায় বলল ইন্দ্রনাথ, "এরই নাম ড্রাগন-হাড় ?"

"হ্যাঁ," পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেন চিনা বৃদ্ধ। গোটা জীবনটাই নাকি কেটেছে কলকাতায়। প্রথম পরিচয়েই তা জানিয়েছেন।

"কিন্তু," থেমে-থেমে বলল ইন্দ্রনাথ, "এ তো দেখছি কচ্ছপের খোলা।"

হাসলেন চিঙলি। চিনাদের চামড়া হলুদ হয়, দাঁত হলুদ হয়—এইরকম কত কথাই না শুনেছি। গল্পেও পড়েছি। কিন্তু এই বৃদ্ধের যে দাঁত দেখলাম, তার বাহার দেখিয়ে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দিলে বাজার মাত হয়ে যাবে। হাতির দাঁতের মতো সাদা। মজবুত।

"বাবু, আমার বয়স কত জানেন ? বাহাত্তর। দেখে কী মনে হয় ? বাহান্ন। বয়সটাকে কমিয়ে রেখেছি কীভাবে জানেন ? চাইনিজ বক্সিং করে, আর এই হাড়ের ওষুধ খেয়ে।

"চাইনিজ বক্সিং !"

"খুব আস্তে দৌড়ই রোজ ভোরে, শূন্যে ঘুসি, লাথি ছুঁড়ি দুপুরে, আর রাতে খাই ড্রাগন হাড়ের পাঁচন। সাহেবি ওষুধ একদম খাই না।"

"বেশ করেন। কিন্তু কচ্ছপের হাড়কে ড্রাগনের হাড় বলছেন কেন ?"

"ড্রাগনের হাড় তো বলছি না। ড্রাগন তো পুরাণের গালগল্প, ড্রাগন কি আদৌ ছিল ? ছিল না। কিন্তু এ-হাড়ের নাম দাঁড়িয়ে গেছে ড্রাগন-হাড়। কারণ এই হাড় গুঁড়িয়ে, এর সঙ্গে গাছগাছড়ার রস মিশিয়ে এমন পাঁচন তৈরি হয়, যা মানুষকে বুড়ো হতে দেয় না।"

"তাই তো দেখছি," ড্রাগন-হাড় নামিয়ে রেখে নস্যির গুঁড়ো ডিবে থেকে তুলতে তুলতে বলল ইন্দ্রনাথ, "কিন্তু রাত এখন দশটা। এত রাতে হাড়ের পাঁচন না খেয়ে আমার কাছে এলেন কেন ?"

"কারণ," কোল-কুঁজো বুড়ো আরও ঝুঁকে পড়লেন। চোখ আরও প্রদীপ্ত হল। গলা আরও খাদে নেমে এল, "কারণ, এ-হাড় তো আগের হাড়গুলোর মতো নয়।"

"কেন নয় ?"

"এ-হাড় গুঁড়িয়ে খেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, গুপ্তধনের সন্ধান আর কেউ পাবে না।"

আওয়াজ করে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। দেওয়ালের টিকটিকিটাও বোধ হয় চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল।

"হাড়ের গায়ে গুপ্তধনের নকশা আছে নাকি ?" ইন্দ্রর প্রশ্ন।

"আছে।"

"আপনি জানলেন কী করে ?"

"কারণ, আমি প্যালিওগ্রাফার। প্রাচীন ভাষার মানে বের করা আমার নেশা। চিনে ডাক্তারের ফরমুলা অনুযায়ী এই হাড় আমি কিনি চিনেপাড়ারই এক কিউরিও দোকান থেকে। এক-একটা হাড় অনেকদিন চলে। কিনে এনেই আমি পিকটোগ্রাম-এর মানেটা বুঝে নিই। পিকটোগ্রাম মানে বোঝেন তো ?"

"একটু বুঝি। ছবি দিয়ে বর্ণমালা।"

"ড্রাগন-হাড়ের গায়ে খোদাই করা থাকে আদিম পিকটোগ্রাম। নখের ফালি মানে চাঁদ, বৃত্ত মানে সূর্য। এই দেখুন, এই যে চিহ্নটা, এর মানে পুরুষ, এই চিহ্নটার মানে নারী, এটার মানে মুখের কথা, এটার মানে শিশু।"

চিঙলি যে-চিহ্নগুলো ড্রাগন-হাড়ে দেখিয়ে গেলেন সরু আঙুলের ডগা দিয়ে, সেগুলো এইরকম :
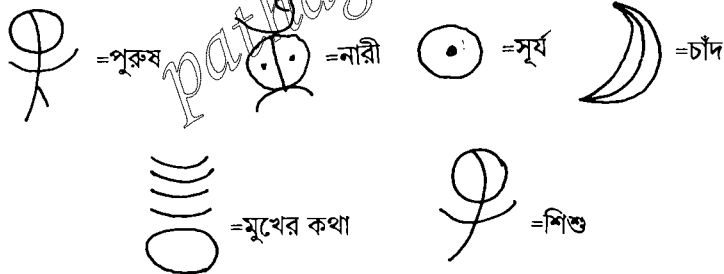
ইন্দ্রনাথ বলল, "বুঝলাম, গোটা হাড় ফেটেফুটে রয়েছে, গায়ে-গায়ে আঁকা কিম্ভূত ছবি। এর মধ্যে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। সেই থেকেই ফেউ লেগেছে পেছনে।"

"ফেউ !"

"বাবু, আমি বুড়ো হতে পারি, ভিতু নই। আমি নিজে যদি প্যালিওগ্রাফার না হতাম, তা হলে যে-সাহেব হাড়টা কিনতে এসেছিল মোটা দাম দিয়ে, তাকেই বেচে দিতাম।"

ইন্দ্রনাথের চোখের পাতা দুটো স্থির হয়ে গেল, "সাহেব কিনতে এসেছিল !"

"আমি কিনেছি পরশু। গতকাল কিউরিও-র দোকান থেকে যত হাড় ছিল,

সমস্ত কিনে নিয়ে যায় এই সাহেব। আজ সকালে সেই সাহেবই এসেছিল আমার কাছে।"

"কত দাম দিতে চেয়েছিল ?"

"পাঁচ লাখ।"

"কচ্ছপের হাড়ের দাম পাঁচ লাখ !"

"শুরু করেছিল একশো টাকা থেকে। অন্য কেউ হলে দিয়ে দিত। কিন্তু আমি যে ওর মধ্যে গুপ্তধনের খবর পেয়ে গেছিলাম। তাই একশো কেন, এক কোটি দিলেও হাড় হাতছাড়া করব না বলেছিলাম। সাহেব তখন 'বেশ, বেশ' বলে মোলায়েম হেসে চলে গেল। তার একটু পর থেকেই দেখলাম, বাড়ি পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা ছোকরা। চিনে পাড়ারই ছোকরা। কিন্তু কেউই ভাল নয়। আমি আর দেরি করিনি—"

"আমাকে তখনই ফোন করেছিলেন। নাম্বার পেলেন কোথায় ?"

"টেলিফোন গাইডে। প্রেমচাঁদ আপনার বন্ধু ? প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রেমচাঁদ মালহোত্রা ?"

"হ্যাঁ।"

"আগে ওঁকে ফোন করেছিলাম। উনি তো দিল্লিতে বসেন। অফিস-ম্যানেজার হাড় নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলল। আপনি বললে, প্রেমচাঁদ কেস টেকআপ করবে।"

"বটে ! বটে ! সাহেব তা হলে ফেউ লাগিয়েছে আপনার পেছনে ! ফেউ-এর চোখ এড়িয়ে এখানে এলেন কী করে ?"

আবার সাদা হাসি হাসলেন কোল-কুঁজো বুড়ো, "চিনেপাড়ার গলিঘুঁজি কাশীর গলিঘুঁজিকেও হার মানায়। এর রান্নাঘর, এর কলতলা, ওর ছাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়।"

"লি সাহেব," বলল ইন্দ্রনাথ, "আপনার এই পাঁচন খাওয়ার যদি ইচ্ছে হয়, ফরমুলা কোথায় পাব ?"

"পাবেন না। এ-ফরমুলা প্রায় একশো বছরের পুরনো। কাঠের ফলকে খোদাই করা। আমার ঠাকুরদা এনেছিলেন পিকিং থেকে। ড্রাগন-হাড়ের আবিষ্কারটা ঘটে যে বছরে, তার বছর কয়েক পরেই। আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, সে-কাহিনী আপনি জানেন না। জানতে চান ? রাত প্রায় এগারোটা। ট্যাক্সি যখন ছেড়ে দিয়েছি, মৃগাঙ্কবাবুর গাড়ি করে না হয় বাড়ি ফেরা যাবে। তার আগে ইতিহাসটা বলে নিই। ১৮৯৯ সালে পিকিং-এর এক ডাক্তার ম্যালেরিয়া সারানোর জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছিলেন। ফ্যামিলির কর্তা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গাছগাছড়া আর ড্রাগন-হাড় কিনে এনেছিলেন। তাঁর নাম ওয়াং আইয়ুঙ। হাড়টা গুঁড়ো করতে গিয়ে তাঁর খটকা লাগে। কেননা, ড্রাগন-হাড় বলে তাঁকে যা গছানো হয়েছে, তা তো একটা কচ্ছপের খোলা। ফেটেফুটে চৌচির। অজস্র পিকটোগ্রাম আঁকা। ছবির মানে বোঝার শিক্ষা তাঁরও

ছিল। কিছুটা মানে বুঝেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল। ফার্মাসিস্টের দোকান থেকে সমস্ত হাড় তিনি কিনে নিয়েছিলেন। রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাই জানতে পেরেছিলেন, হাড়গুলোর বয়স ৩৪০০ বছর, শাঙ রাজবংশের আমলের। ওয়াং আইয়ুঙ তাই নিয়ে বই লেখেন। সে-বই আছে আমার কাছে, তাতেই উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শাঙ রাজবংশ কিংবদন্তি নয়, সত্যিই ছিল। চিনদেশের প্রথম শিক্ষিত রাজবংশ, পৃথিবীর আদিমতম লিখন পদ্ধতি চালু হয়েছিল এই সময়েই। এখনও যা মরে যায়নি, টিকে রয়েছে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম চিঙলি'র কাহিনী। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত এগারোটা ছাড়িয়ে গেছে। টেবিল ল্যাম্পের নরম আলোয় বুড়ো চিনাকে মনে হচ্ছে যেন কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষ। ঘরের বাকি অংশ প্রায় অন্ধকার। বাইরে নিঝুম রাত। ভেজানো দরজার সামনে একঠেঙে দৈত্যের মতো জ্বলছে ঘেরাটোপ-দেওয়া একটা নীল বাতি।

দম নিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে একই রকম থামা-থামা গলায় বলে গেলেন চিঙলি, "ওয়াং আইয়ুঙ-এর আবিষ্কার টনক নড়িয়ে ছাড়ে চিনের পণ্ডিতদের। ড্রাগন-হাড় খোঁজার হিড়িক শুরু হয় তখন থেকেই। উত্তর চিনের নানা অঞ্চল খুঁড়ে বের করা হয় রাশি-রাশি ড্রাগন-হাড়। কোনও হাড়ই ড্রাগনের নয়। কোনওটা কচ্ছপের, কোনওটা গোরু বা মোষের কাঁধের চ্যাটালো হাড়। ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নিয়ে গরম করা হত বলেই অত ফেটেফুটে যেত। তারপর গায়ে খোদাই করা হত ছবি। ১৯২৮ সালে চিনের সরকার আইন করে বেধড়ক খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি আজও চলছে।"

"শুধু একটা গর্তেই পাওয়া গেছে ১৭০০০ ড্রাগন-হাড়," বলে ফের সশব্দে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। ফের চমকে উঠে 'ঠিক, ঠিক, ঠিক' করে উঠল দেওয়ালের টিকটিকি।

আর যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে ফেললেন কোল-কুঁজো বৃদ্ধ, "আপনি জানেন ?"

"জানি, শাঙ রাজবংশের সবশেষের রাজধানীর খবরও রাখি। মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে ৯২ ফুট লম্বা রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের পাশেই কারখানা বাড়ি, যেখানে তৈরি হত পাথরের যন্ত্রপাতি, হাড়ের ফলা বসানো তীর, কারুকাজ-করা ব্রোঞ্জের বাসনপত্তর। পাওয়া গেছে পাথরের ভিতের ওপর তৈরি ইঁটের বাড়ি, আর মন্দির, কাঠের থামের ওপরে ধরা ছাদ, পোর্সিলেনের মূর্তি, চাকাওলা গাড়ি, আর রাশি-রাশি নরকঙ্কাল।"

"পাতালঘরে," থেমে-থেমে বললেন চিঙলি, "গণহত্যার রেওয়াজ ছিল রাজবংশে। কারিগরদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হত বাড়ির দেওয়ালে। জানেন তো ?"

"জানি, লি সাহেব, তাও জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন, এত জিনিস থাকতে লেখবার জন্য কেন হাড় বেছে নেওয়া হয়েছিল ? কেন অমন অস্বাভাবিভাবে

প্রতিটা হাড় ফেটেফুটে থাকত ? আর কেনই বা পিকটোগ্রাম আঁকা হত ফাটা আর চিড়গুলোর গা ঘেঁষে ?"

থসথসে বুড়ো চিঙলি এখন যেন পাথরের মূর্তি। ভুরুর জঙ্গলে কিন্তু প্রবল আন্দোলন চলছে। কাঁপছে হাতের আঙুল।

ইন্দ্রনাথ বলল, "জানেন, জানেন, তাও জানেন। ভবিষ্যৎদ্বাণী করার জন্য হাড় বেছে নিয়েছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা। ব্রোঞ্জের শলাকা তাতিয়ে হাড়ের গায়ে চেপে ধরা হত, হাড় ফেটে যেত, চিড়গুলোর চেহারা দেখে ভবিষ্যৎবক্তা বলে যেত কী ঘটবে ! প্রশ্নটা আগে লেখা হত হাড়ের গায়ে। ব্রোঞ্জের শলাকা টিপে ধরা হত তার পাশে। জবাব ফুটে উঠত ফাটাফুটোর মধ্যে, যার মানে উদ্ধার করার ক্ষমতা ছিল শুধু জাদুকর পুরুতঠাকুরের। ঠিক কি না ?"

চিঙলি'র মুখে কথা নেই। চোখ দুটোয় আশ্চর্য সেই আলো কিন্তু আরও জোরালো হয়েছে। চোখের গহনে যেন একজোড়া পিদিম জ্বলছে।

ইন্দ্রনাথ বলে গেল শক্ত গলায়, "রাজা হয়তো লিখলেন, এ-যুদ্ধে জিতব কি ? জাদুকর পুরুত শুধু হ্যাঁ বা না লিখে হাড় ফেরত পাঠাত রাজাকে। হাজার-হাজার বছর ধরে এইভাবে ভবিষ্যৎদ্বাণী শুনে দেশের লোক আর রাজবংশ নিজেদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। এরই নাম ড্রাগনের হাড়। লি সাহেব, আজ আপনি এই হাড়ের মধ্যে পেয়েছেন গুপ্তধনের নকশা। কোথায় সেই গুপ্তধন, তা কি বলবেন ?"

"না," চিঙলি'র নাভিমূল থেকে যেন উঠে এল ছোট্ট জবাবটা।

ভারী মিষ্টি হাসল ইন্দ্রনাথ, "কিন্তু আমি যে জানি লি সাহেব। চিনের উত্তরে হোনান নামে একটা অঞ্চল আছে না ? আধুনিক চিনের লোক যখন মন্দির ভাঙতে শুরু করে, তখন একটা মন্দির একেবারেই মিশে গেছিল মাটির মধ্যে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছিল, শাঙ রাজবংশের গুপ্ত কোষাগার ছিল ওই মন্দিরের গর্ভগৃহে। মন্দিরের ঠিকানাটাই কেবল পাওয়া যাচ্ছিল না," দম নিল ইন্দ্রনাথ। চিঙলি'র চোখে চোখে চেয়ে ছুঁড়ে দিল শেষ কথাটা, "আপনার এই ড্রাগন-হাড়ে রয়েছে সেই ঠিকানা।"

"এত ন্যাকামি করার কী দরকার ছিল ?" এই প্রথম চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলতে শুনলাম চিঙলি'কে, "গুপ্তধনের নকশা জানতে পেরেছি বলেই তো আপনার কাছে আমি এসেছি। ফেউ লেগেছে বলেই—"

"লি সাহেব," অকস্মাৎ যেন আকাশের বাজ ফেটে পড়ে ইন্দ্রনাথের গলার মধ্যে, "আর তঞ্চকতা করবেন না। ফেউ আপনার পেছনে লেগেছে ঠিকই, কিন্তু সে-ফেউ চায় চিনের মঙ্গল।"

"কী বলতে চান ?" আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ান চিঙলি। এখন আর তাঁকে কোল-কুঁজো মনে হচ্ছে না। এতক্ষণ যেন ইচ্ছে করে বেঁটে সেজে ছিলেন। এখন দিব্যি লম্বা। লোমশ ভুরুর জঙ্গল প্যাগাডোর চেহারা নিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবের দিকে ডান হাত বাড়িয়েই আচমকা বাঁ হাত দিয়ে

পাঞ্জাবির তলা থেকে টেনে বের করল ওর অতিপ্রিয় নিকষ-কালো রিভলভারটাকে। ট্রিগারে আঙুল রেখে নলচের মুখ চিঙলি'র দিকে ফিরিয়ে বলল বাজের মতো কড়া গলায়, "ফটাফট সর্দার, আজ আপনার খেল খতম। আসুন আপনারা।"

আমাকে বিলকুল হতভম্ব করে দিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল প্রথমে জয়ন্ত, আমাদের পুলিশ বন্ধু, তার পেছনে একজন তালঢ্যাঙা সাহেব, মুখে বিরাট হাসি, তার পেছনে প্রেমচাঁদ মালহোত্রা, পৃথিবীজোড়া ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার, ইন্দ্রনাথের প্রাণপ্রিয় বন্ধু।

ইন্দ্রনাথ আর নস্যি নেয়নি। ডান হাত দিয়ে সোফা দেখিয়ে বলল, "আপনারা লাইন দিয়ে বসে পড়ুন। লি সাহেব, আপনিও দয়া করে বসুন। পা টনটন করবে, বয়স তো কম হল না। আপনার গল্পে অনেক সত্যি আছে। মিথ্যে একটাও নেই, কিন্তু একটা কথা স্রেফ চেপে গেছেন। মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে আপনার চোখ দেখছে। কিন্তু আমি হইনি। আপনার চোখের মধ্যে আলো জ্বলছে। এ আলো আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির। যে শক্তি ছিল নস্ট্রাডামুসের—পেতলের তেপায়ার ওপর জলের পাত্র রেখে গভীর রাতে সেদিকে চেয়ে দু-তিন হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পেতেন। নেপোলিয়ন, হিটলারের কথা উনি বলে গেছিলেন। এই দু'জনকে বলেছিলেন অ্যান্টিক্রাইস্ট। তৃতীয় অ্যান্টিক্রাইস্টের কথাও বলেছিলেন। হেঁয়ালি ছড়ার ব্যাখ্যা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগানোর জন্য এই শতকের শেষের দিকে চিন দেশ থেকেই আবির্ভূত হবে থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট। লি সাহেব, আপনার এই ড্রাগন-হাড়ে রয়েছে সেই একই ইঙ্গিত। আর রয়েছে বিশাল এক ধনভাণ্ডারের সন্ধান, যা কাজে লাগাবে তৃতীয় অ্যান্টিক্রাইস্ট। নস্ট্রাডামুসের যে-ছড়াগুলো পাওয়া যায়নি, কে জানে তাদের মধ্যে এই গুপ্তধনের কথা বলা হয়েছিল কি না। কিন্তু আপনি তা জেনেছিলেন। আপনি পেট চালাতেন বেআইনি বাজি ধরার ওপর ভবিষ্যৎবাণী করে। ফটাফট খেলতেন আপনি। তাই আপনি ফটাফট খেলার সর্দা। ও কী! মাথা ঘুরছে নাকি?"

চিঙলি'র মাথা ঝুঁকে পড়েছিল বুকের ওপর। জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখের পাতা বোজা। স্ট্রোক হয়ে গেল নাকি?

প্রেমচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ইন্দ্রনাথ, থাক, এখন থাক।"

"থাক তা হলে। 'ট্রান্স' শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। ঘোর এসেছে। লি সাহেব... লি সাহেব... শুনতে পাচ্ছেন?"

ঘড়ঘড় গলায় বললেন বুড়ো লি, "শুনছি।"

"কী দেখছেন?"

"বাক্স-বাক্স সোনা, হিরে।"

"আর কী দেখছেন?"

"থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট।"

"কীরকম দেখতে ?"

"ভয়ঙ্কর।"

"কোন দেশের লোক ?"

ঝুঁকে-পড়া চিঙলি'র মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্নটা করেছিল ইন্দ্রনাথ, তার জবাবটা যে আসবে এইভাবে, তা কল্পনা করিনি।

আচমকা দু'-পা গুটিয়ে এনে সবেগে ইন্দ্রনাথের পেটে পদাঘাত করলেন চিঙলি। একটা হাত তাঁর আগেই এগিয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথের হাতের রিভলভারের দিকে—আর খুলে গেছিল দু' চোখের পাতা। সে চোখে ঘোরে থাকার লেশমাত্র আভাস ছিল না।

ইন্দ্রনাথের ব্যায়ামপটু বডির ভোজবাজিও দেখা গেল সেই মুহূর্তে। সময় হলে ও যেন চিতাবাঘের মতোই ক্ষিপ্র হয়ে যায়। তাই চোখের সামনে দিয়ে বুঝি বিদ্যুৎ ঝলসে গেল।

জোড়া পায়ের লাথি পেটে লাগার আগেই একটু সরে গিয়ে ডান হাতের এক রদ্দায় চিঙলি'কে মাটিতে শুইয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "অত অবাক হোসনি। সকালে ফোন করেছিলেন বুড়ো আমাকে দিয়ে ফেউ-য়ের নামধাম জানার জন্য। এই সাহেব শোগবি নিলামদার। চিন দেশ থেকে ওঁকে পাঠানো হয়েছে নিলাম হেঁকে সমস্ত ড্রাগন-হাড় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট আর গুপ্তধনের গুজবের অবসান ঘটানোর জন্য। কিন্তু চিঙলি তা জানতেন না। চোরের মন বোঁচকার দিকে থাকে। তিনি ভেবেছিলেন ওঁদের সেই সর্বনেশে খেলার আড্ডাখানার সন্ধানে পেছনে ফেউ লেগেছে। ড্রাগন-হাড় যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, এই ভয়ে দৌড়ে এসেছিলেন আমার কাছে।"

আমি মিউ-মিউ করে বললাম, "কিন্তু তুই জানলি কি করে এত ব্যাপার ?"

"সকালে ফোন পেয়েই গ্র্যান্ডে ফোন করে শোগবি-র এই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম। আমি তো জানি, আমেরিকার এই বিখ্যাত নিলামদার কলকাতায় এসেছেন ভাল ছবি নিলামে চড়িয়ে বিদেশে বিক্রির জন্য। তাই সন্দেহ হয়েছিল—পুরনো দুষ্প্রাপ্য হাড় কিনতে চাননি তো ? জয়ন্তকে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরতেই উনি বললেন সমস্ত ড্রাগন-হাড় কেনার বায়না দিয়েছে চিনদেশেরই এক সংস্থা। প্রেমচাঁদ তারপরেই ফোন করে বললেন, ফটাফট কোম্পানির সর্বনেশে দিল্লি অফিসে হানা দিয়ে জেনেছে, কলকাতা আড্ডার সর্দার এক বুড়ো চিনে ম্যান। তারপর একটু পড়াশোনা করলাম, বাকিটা নাটক করে গেলাম। জয়ন্ত, ডেরাটা পেয়েছিস ?"

"হ্যাঁ," বলল জয়ন্ত, "ছিমছাম একতলা বাড়ির ছাদে বাগান, পাতালঘরে এয়ারকন্ডিশনিং, উনিশ লক্ষ নগদ টাকা, রঙিন টিভি, ওয়াকিটকি, কর্ডলেস টেলিফোন, বোমা, আর একটা পেতলের তেপায়া।"

"ভবিষ্যদ্বাণীর যন্তর। মিউজিয়ামে রেখে দিস," বলে হাই তুলল ইন্দ্রনাথ।

আমি কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে ঘুমোতে দিইনি সেদিন। নিজে বাড়ি ফিরিনি। উত্তেজনায় চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছিল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ইন্দ্রনাথের চোখে যেন বেশি ঘুম জড়ো হয়েছিল।

হাই তুলতে-তুলতে (আর নস্যি নিতে নিতে) আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেছিল এইভাবে :

"ইন্দ্র, তুই কি গণৎকার ?"

"না তো।"

"তা হলে কী করে জানলি, চিঙলি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন ?"

"অপরাধ মহলের খবর রাখি বলেই জানি। অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন চিনেম্যান নাকি বড়-বড় প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিচ্ছেন, এমনকী রেসের কোন ঘোড়া জিতবে, তাও বলে দিচ্ছেন। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা থেকে আরম্ভ করে উপসাগরের যুদ্ধে কে জিতবে, কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে, বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, কলকাতায় এইসব অনেক ব্যাপার নিয়ে লাখ-লাখ টাকার অদ্ভুত বাজি চালু হয়েছে। মদত দিচ্ছেন এক বুড়ো চিনে।"

"বুড়োর ফোন পেয়েই তাই তোর টনক নড়েছিল।"

"আজ্ঞে।"

"সাহেব কী করে জানলেন, বুড়োর কাছে ম্যাজিক-হাড় আছে ?"

"ম্যাজিক হাড় ! ভাল বলেছিস ! কলকাতার একটা জায়গাতেই ড্রাগন-হাড় বস্তায় করে আনা হয়েছিল ১৯২০ সালে—চিনেপাড়ায়। পুরনো চিনেপাড়া ভেঙে যাওয়ায় বস্তা চলে যায় নতুন চিনেপাড়ায়—বাইপাসের ধারে। খবরটা সাহেবকে আগেই দিয়েছিল সন্ধানী লোকেরা।"

"কিন্তু প্রমাণ ছাড়াই বুড়োকে চার্জ করে গেলি কেন ?"

"ধাক্কা দিয়ে মনের ভিত আলগা করে দিয়ে পেট থেকে কথা বের করার জন্য। কথায় কি না হয়, ভালমানুষকে পাগল করা যায়, পাগলকে সুস্থ করা যায়।"

"গোপন ডেরার খবর জয়ন্ত পেল কী করে ?"

"পুলিশকে প্রাইভেট এজেন্সি সাহায্য করে, প্রেমচাঁদের পৃথিবীর নানা জায়গায় শাখা অফিস রয়েছে। দেশে-দেশে বিভিন্ন বিষয়ের খবর ওর চাইতে বেশি কেউ রাখে না। ওর চর জানত ওদের আড্ডা কোথায় ! তাই চিঙলি ওদের অফিসে যেতেই আমার কাছে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। দিয়েই আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে—"

"তুই জাল পেতেছিলি ?"

"হ্যাঁ।"

বলেই হাই তুলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বাঘের নখ

"বাঘের হাড় ? কলকাতায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কলকাতায়।"

"টাকা ফেললে বাঘের দুধ পাওয়া যায় জানতাম। বাঘের হাড়-ও ?"

"ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে।"

কথা হচ্ছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর তুহিন চাকীর মধ্যে। তুহিনবাবু জাঁদরেল সরকারি অফিসার। পুব ভারতের বন-জঙ্গল তাঁর নখদর্পণে। বুনো প্রাণীরা যাতে বহাল তবিয়তে থাকে, তা দেখেন। যাদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, তাদের রক্ষা করেন।

ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু বন-জঙ্গলের মানুষ বলে মনে হয় না। রোদে জলে রংও পুড়ে যায়নি। যেমন ফরসা তেমনই তৈলমসৃণ উজ্জ্বল মুখশ্রী। চকচকে টাক দখল করছে মাথাকে। ফলে, চওড়া কপাল আরও চওড়া হয়েছে। চশমাপরা চোখে, মস্ত কপালে বুদ্ধি ঝলমল করছে। লম্বা, ঋজু শরীরটায় নিপাট স্বাস্থ্যের রোশনাই। মুখে হাসি, কথায় বিনয়, উচ্চারণে উচ্চ শিক্ষা—এই মানুষ বনে-জঙ্গলে টো-টো করেন, মানুষখেকো বাঘকে ঘুমপাড়ানি বুলেট মেরে অজ্ঞান করেন, সাপের চামড়ার চোরা চালান বন্ধ করেন, ভাবতেও অবাক লাগছে।

ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘের হাড় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন ?"

"বাঘের হাড় বেচে যে লাখপতি হয়েছে, তার জান যে যেতে বসেছে।"

"বাঘের হাড়ের এত দাম ?"

"চিনদেশে ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে যে বাঘের হাড় থেকে।"

"চিনের ওষুধে বাংলার বাঘ ?"

"শুধু বাংলার নয়, ইন্দ্রনাথবাবু, সুমাত্রা আর জাভা, বালি আর পারস্য, মাঞ্চুরিয়া আর রাশিয়া সব জায়গা থেকেই বাঘের হাড় যাচ্ছে চিনের কারখানায়।"

"কিন্তু বাঘ মারা তো নিষিদ্ধ ?"

"কে শুনছে ? নেই-নেই করেও এখনও তো হাজারছয়েক বাঘ রয়েছে পৃথিবীতে। সাইবেরিয়া যাদের আদিভূমি সেখানেই শুধু এরা নেই। বরফ-প্রান্তরে থেকে অভ্যেসও খারাপ করে ফেলেছে। গরম একদম সইতে পারে না। লম্বা ঘাসের মধ্যে, জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে থাকে—মানুষকে সমীহ করে, ভয়ও পায়—সেই মানুষই এদের সাবাড় করে আনছে। এশিয়ার বন-জঙ্গলই এখন ওদের ঠাঁই। নিস্তার নেই সেখানেও," বলতে-বলতে যেন চোখ ছলছল করে উঠল তুহিনবাবুর। গলা ভারী হয়ে এল।

নরম গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘ শিকার তো একসময়ে মস্ত বাহাদুরির ব্যাপার ছিল।"

"বাহাদুরির বাড়াবাড়ি দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে, বিশেষ করে বন্দুক আবিষ্কারের পর। শুধু ১৮৭৭ সালেই ১,৫৭৯টা বাঘ মারা হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়। আর এখন ? গোটা ইন্ডিয়ায় খুবজোর সাড়ে চার হাজার, সুন্দরবনে পাবেন শ'তিনেক।"

"কিন্তু এখন তো খোদ গভর্নমেন্টই বাঘ মারার বিরুদ্ধে। আপনারা নজর রেখেছেন। তা সত্ত্বেও বাঘ মরছে ?"

"সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন জানেন ? ২,৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এর অনেকটাই জুড়ে রয়েছে নদী, নালা, খাঁড়ি আর গভীর বন। চোরাশিকারিদের স্বর্গ। বাঘের হাড় এখন বাঘের চামড়ার চাইতেও দামি। নইলে লাখ-লাখ টাকা কামায় কী করে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"যার জান যেতে বসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার জন্যে আপনি ছুটে এসেছেন ?"

"এক সময়ে নিজে বাঘ মেরেছে, ভাড়াটে শিকারি দিয়ে মারিয়েছে—এখন সুবুদ্ধি হয়েছে। চোরাশিকার বন্ধ করার জন্যে আমাকেই খবর দিয়ে যাচ্ছে।"

"তাই তার জান-টা আপনি বাঁচাতে চান ?"

"আজ্ঞে।"

"কিন্তু তার জান নেবে কে ? বাঘের ভূত ?"

"একজন অভিজ্ঞ চোরাশিকারি। এক সময়ে ছিল ঢোলগোবিন্দর ডান হাত। এখন তার যম। লোকটার নামও অদ্ভুত। টাট্টু মহারাজ।"

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, "বিউটিফুল নাম। টাট্টু মহারাজ কি খুনের হুমকি দিয়েছে ঢোলগোবিন্দকে ?"

"স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের কথা শোনাতে দিনসাতেক আগে চলে এসেছে ঢোলগোবিন্দর কাছে।"

"স্বপ্নটা কী ?"

"ঢোলগোবিন্দর গলায় বাঘের নখ বসেছে। একটানে ছিঁড়ে দিয়েছে টুঁটি।"

"রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। শুনেই ঘাবড়ে গেছে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"সে নির্বিকার। দেখলে বুঝবেন কী জিনিস। যে-বাঘের গর্জন শুনলে লোকে

জ্ঞান হারায়, এ সেই বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভুরুর মাঝে গুলি চালায়। স্বপ্নের কথায় সে মজা পেয়েছে।"

"তা হলে ভয়ে কাঁপছে কে?"

"তার ছেলে। একমাত্র সন্তান। মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো চালিয়েছে। বাবাই তার চোখের মণি। দুর্দান্ত বাপের ঠিক উলটো। পয়লা নম্বর ভিতু। টাট্টু মহারাজকে দেখে আর তার মুখে স্বপ্নের কাহিনী শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। থানায় যায়নি, বাবাকে নিয়ে চলে এসেছে আমার কাছে। বলছে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ দরকার।"

"কলকাতায় এসেছে?"

"বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি।"

"নিয়ে আসুন।"

ঘরে ঢুকল ঢোলগোবিন্দ সরকার। বাঘের মতোই নিঃশব্দে। চোখ দুটোও বাঘের চোখের মতো কটা। উচ্চতায় মাঝারি। তবে বোতাম-খোলা কলারওলা নীল গেঞ্জি-শার্টের ফাঁক দিয়ে ঠেলে উঠছে কাঁধের মাস্‌ল, বাহুর মাস্‌ল আর বুকের উল্কি-বাঘ। বাঘের মুণ্ডটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। বড় জুলপি আর মোটা গোঁফেও সাদা চুল। চৌকো চোয়াল। থ্যাবড়া নাক। শক্ত ঠোঁট। মুখের চামড়ায় অজস্র রেখা। কপালে, চোখের কোণে, নাকের পাশে, ঠোঁটের প্রান্তে। চামড়া পুড়ে ঝলসে গেছে রোদের আঁচে। লোকটাকে দেখলেই অসুর-অসুর মনে হয়। ভেতরটাও নিশ্চয় তাই। কটা চোখের আড়ালে নৃশংসতা যেন লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

পেছন-পেছন এল তার ছেলে। বাবার চেয়ে একটু লম্বা। গায়ে মাস্‌ল বেশি না থাকলেও, বেশ চাবুক-চেহারা। মুখের গড়ন অনেকটা বাবার মতো। শুধু চৌকো নয় চোয়াল, চোখেও নেই প্রচ্ছন্ন নৃশংসতা। ভয়ের মলম মাখানো রয়েছে যেন চোখে। চাহনি চঞ্চল।

সকলের পেছনে এলেন তুহিন চাকী। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের নাম মাধব সরকার। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। এখন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে পোস্টাল ডিপ্লোমা কোর্স পড়ছে। বয়স বাইশ।

মামুলি কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ বলল, "মাধব, তুমি ভয় পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, কাকু।"

"কিন্তু স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়?"

"হুমকি তো সত্যি হতে পারে।"

"তুমি বলতে চাও, টাট্টু মহারাজ নিজেই খুন করবে তোমার বাবাকে?"

"তার গলায় দোলে বাঘ-নখ। রুপোয় বাঁধানো।"

নিঃশব্দে হাসল ঢোলগোবিন্দ। যেন বাঘের দাঁতখিঁচুনি। কিছু বলল না।

কিন্তু রেগে গেল মাধব, "তুমি এখনও হাসছ? তোমার রাশিচক্রে লেখা নেই,

মৃত্যু হবে এ-বছরেই ?”

“সেটা যে বাঘের নখে হবে, তা তো লেখা নেই,” এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ঢোলগোবিন্দ। গলার আওয়াজে কিন্তু বাঘের ডাক নেই। রয়েছে মেয়েলি তীক্ষ্ণতা। বাঘশিকারির গলা যে এত সরু হয়, তা জানা ছিল না।

“কিন্তু তুমি বাঘের নখে মরতে চাও না বলেই বাঘ শিকার ছেড়ে দিয়েছ।”

“বড্ড বাজে বকছিস,” ঢোলগোবিন্দর গলায় এবার বিরক্তি।

ইন্দ্রনাথ বলল, “মাধব, তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো ?”

“করি। নিজেও চর্চা করি। কাগজ দিন,” বলে নিচু টেবিলের তলায় রাখা স্লিপ প্যাড টেনে নিয়ে বুকপকেট থেকে ডট পেন বের করে বাঁ হাতে ঝপাঝপ আঁকল একটা রাশিচক্র। গড়গড় করে বলে গেল, অমুক গ্রহ অমুক জায়গায় রয়েছে বলে বাবার মৃত্যুর আর দেরি নেই।

নিঃশব্দে হেসে গেল ঢোলগোবিন্দ। ইন্দ্রনাথ শুনেটুনে বললে, “ডিটেকটিভ কি মৃত্যু আটকাতে পারবে ?”

রুখে উঠল মাধব, “চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ? ওইরকম একটা স্বপ্নের কথা শুনলে কার না সন্দেহ হয় ? সব শুনেও চুপ করে বসে থাকা যায় ?”

“শুধু স্বপ্ন ? না কথাও আছে তার মধ্যে ?”

“আছে। বটগাছের ডালে বসে কে যেন বলেছে, বাবার গলা ফাঁড়বে বাঘ-নখ। তারপরেই দেখা গেছে, বাবা পড়ে রয়েছে, চিত হয়ে—বাঘ-নখ ঢুকে রয়েছে টুঁটিতে,” বলতে-বলতে শিউরে উঠল মাধব।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, “চলো, শহরতলির শয়তানকে দেখে আসা যাক।”

তুহিনবাবুর গাড়ি যখন পৌঁছল ঢোলগোবিন্দর বাড়িতে, শীতের সূর্য তখন গাছের মাথায় নেমে পড়েছে। দূর থেকে বাড়ির চেহারা দেখে অবাক হয়েছিলাম। অনেক শিবমন্দির যেন গায়ে-গায়ে লাগানো। মোচার মতো গড়ন। গাছপালার ওপর দিয়ে প্রথমে দেখা গিয়েছিল চুড়োগুলো। ফটক পেরিয়ে বাগানে গাড়ি ঢোকার পর দেখলাম, প্রতিটা চুড়োর নীচে দুটো করে জানলা, ইস্পাতের পাল্লা আঁটা। দরজা মোটে একটা। মন্দির প্যাটার্নের এক-একটা ঘর যেন এক-একটা কেল্লা। এরকম অদ্ভুত বাড়ি জীবনে দেখিনি। জিজ্ঞেস করে জানলাম, শিবভক্ত এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই বাগানবাড়ি। একটা ঘর থেকে আর-একটা ঘরে যাওয়া যায় পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে। গোটা বাড়ির তলায় রয়েছে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। ঢোলগোবিন্দ সেইসব সুড়ঙ্গের নকশাসমেত গোটা বাগানবাড়ি কিনে নিয়ে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়েছে। শুনে মনে-মনে বলেছিলাম, শখের বলিহারি। যেমন ছিল পেশা, তেমনই হয়েছে আস্তানা।

বাইরের দিকের নাটমন্দিরের মতো বসবার ঘরটায় মিনিটদশেক বসেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, বিচিত্র এই শিব-পুরীর তলার গোলকধাঁধা-সুড়ঙ্গে ঘুরব। কিন্তু

ইন্দ্রনাথ হাতঘড়ি দেখে বলল, "টাটু মহারাজকে এখানে ডাকতে হবে না, আমিই যাব তার বাড়ি।"

তুহিনবাবু গাড়ি করে নিয়ে গেলেন। বিলের ধারে একটা একতলা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "পাড় দিয়ে চলে যান। আমি এখানেই রইলাম।"

ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে দিব্বি চালানো যায়। চারপাশ নিঝুম। বাঁশের ফটক খুলে ইট পাতা সরু রাস্তায় পা দিতেই বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে একটা মিশকালো ছেলে এসে বাইরে দাঁড়াল। তার পরনে হাফপ্যান্ট ছাড়া কিচ্ছু নেই। নিগ্রো-নিগ্রো চেহারা। ছোট চুল, সরু কপাল, ভোঁতা নাক, উঁচু হনু।

কালো বাঘের মতোই সে ছিটকে চলে এল আমাদের সামনে। পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল রুক্ষ গলায়, "কী চাই?"

"টাটু মহারাজের চ্যালা বুঝি?" হেসে-হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, "যাও বাবা, তোমার কর্তাকে গিয়ে বলো, কলকাতা থেকে পুলিশের লোক এসেছে।"

ছোকরার চোখ দুটো একটু চমকে উঠল। সামলে নিল তখনই। পেছন ফিরে উধাও হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, "আসুন।"

চৌকাঠ পেরিয়ে প্রায় অন্ধকার গলি। ডান দিকের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। তক্তপোশে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে একটা কালো কুচকুচে মূর্তি। গায়ে খয়েরি আলোয়ান জড়ানো।

মোলায়েম গলায় মূর্তি বলল, "আসুন। ঢোলগোবিন্দ পুলিশ ডেকেছে? এত ভিতু হয়েছে আজকাল? চোর কোথাকার। পাপের সাজা এইভাবেই হয়।"

আমি আর ইন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে তক্তপোশেই বসলাম। বসবার অন্য চেয়ার তো নেই। হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা গলি দিয়ে চলে গেল ভেতর দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, "আমরা পুলিশ নই। তবে পুলিশ আমাদের পেছনে আছে।"

মিশকালো মূর্তি পলকহীন চোখে দেখছিল ইন্দ্রনাথকে আর আমাকে। আর আমি দেখছিলাম লোকটার কাঠখোট্টা মুখাবয়ব। রসকষ একেবারে নেই। জ্যান্ত কঙ্কাল বললেই চলে। হাড়ের ওপর টান-টান করে লাগানো যেন চামড়া। চোখ দুটো খুব সাদা। হ্যারিকেনের আলোয় শ্বাপদের চোখের মতো জ্বলছে।

সে বলল, "পুলিশ নয়? তবে কী?"

"ডিটেকটিভ। এর পর আসবে পুলিশ। আপনি ঢোলগোবিন্দ সরকারকে খুনের ভয় দেখাচ্ছেন?"

জীবন্ত কঙ্কাল বলল, "ভুল। যার মনে পাপ, সে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এইভাবেই করবে। আপনি সব শুনুন। তারপর যা করবার করবেন। আমিও চলে যাচ্ছি পরশু। বাড়িভাড়া দেওয়ার টাকা নেই। এই তো বাড়ি, তাই খালি পেয়েছি। ইচ্ছে ছিল, ঢোলগোবিন্দর মড়াটা দেখে যাব, কিন্তু বড্ড দেরি হচ্ছে স্বপ্নটা ফলতে।"

"আপনার বিশ্বাস, স্বপ্ন ফলবেই?"

"না বিশ্বাস করলে সুন্দরবন থেকে এত খরচ করে এলাম কেন ? বনে-জঙ্গলে থাকি, বাঘ, কুমির, সাপের সঙ্গে ঘর করি। যা বললাম, তা মিথ্যে হবে না।"

"কিন্তু এখানে তো বাঘ থাকে না, তবে বাঘ-নখ ঝুলছে আপনার গলায় !"

ঝলসে উঠল শ্বাপদ চক্ষু, "সে-খবরও পেয়েছেন। হ্যাঁ, ঝুলছে, এই দেখুন।"

বলেই একটানে খুলে ফেলল গায়ের আলোয়ান। দেখলাম, কালো কার বাঁধা রুপোয় বাঁধানো প্রকাণ্ড বাঘ-নখ। এক সময়ে কত রক্তই না-জানি লেগেছিল এই নখে, রক্তের নেশা এখনও যায়নি। গা-শিরশির করে উঠল আমার।

টাট্টু মহারাজের গলায় এবার শোনা গেল টিটকিরি, "এই দেখেই চমকে উঠলেন ? পিঠ দেখলে তো মূর্ছা যাবেন।" বলেই, দেওয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরল আমাদের দিকে। আলোয়ান পিছলে নেমে যেতেই সত্যিই আঁতকে উঠলাম। কোনাকুনিভাবে একটা কাটাছেঁড়ার দাগ বীভৎস করে তুলেছে গোটা পিঠটাকে। মাংস আর চামড়া তালগোল পাকিয়ে ক্ষতস্থান জুড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু গোটা পিঠটার জ্যামিতি পালটে দিয়েছে।

আলোয়ান ঢাকা দিয়ে আবার ঘুরে বসল টাট্টু মহারাজ। বুকের বাঘ-নখ এক হাতে তুলে ধরে বলল, "এই নখের কীর্তি। এরই আর-একটা নখ ঢোলগোবিন্দকে বাঁধিয়ে উপহার দিয়েছি, ষড়যন্ত্রের স্মৃতি হিসেবে।"

"ষড়যন্ত্র ?"

"আমাকে খতম করার ষড়যন্ত্র। সুন্দরবনে কখনও গেছেন ? না, না, লঞ্চে চেপে যে সুন্দরবন আপনি দেখেছেন, আর আমার জানা সুন্দরবন এক্কেবারে আলাদা। দু'-তিন হাজার বছর আগেও গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ছিল সমুদ্রের তলায়। আজও সেখানে জোয়ারের জলে বেশিরভাগ বন ডুবে থাকে। এক সময়ে রাজারাজড়ারা অনেক ইমারত বানিয়েছিল, এখন আছে ধ্বংসস্তূপ। ভাটার সময় জেগে ওঠে। আমি এইরকম একটা ভাঙা প্রাসাদের পাতাল ঘরে পেয়েছিলাম চার ঘড়া সোনার মোহর। বাদশাহি মোহর। আনন্দে নেচে উঠে খবরটা দিয়েছিলাম ঢোলগোবিন্দকে। তখনই নিয়ে যেতে পারিনি—জোয়ারের জলে পাতালঘর ডুবে গেছিল বলে। ভাটার টান শুরু হওয়ার আগেই ঢোলগোবিন্দকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে নেই। বাঘের বাচ্চাটাও নেই।"

"বাঘের বাচ্চা ?"

"অন্ধ বাচ্চা। জন্মের চোদ্দদিন পরে ওদের চোখ ফোটে। সেইদিনই একটা বাচ্চা জোগাড় করেছিলাম। প্ল্যান ছিল, বাঘিনীকে লোভ দেখিয়ে এনে গুলি করে মারব। বাচ্চা নেই, ঢোলগোবিন্দও নেই দেখে ভাবলাম, বাঘিনীর পেটে গেছে। নিজেই চলে গেলাম ভাঙা প্রাসাদে। বাঘ গরম সইতে পারে না। ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। সেদিন বাঘের বাচ্চাকে ওই বাড়ির মধ্যে রেখেই গাছে উঠে বসেছিল ঢোলগোবিন্দ। আমি যেই ঢুকেছি, বাচ্চার গন্ধে বাঘিনীও ঢুকেছে। গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা ওদের অসাধারণ। বাচ্চার গন্ধ আর মানুষের গন্ধ—আর যায় কোথায়। প্রথমেই থাবা চালাল কাঁধ লক্ষ্য করে, যা ওদের ট্যাকটিক্স। কিন্তু আমি

ছিটকে যেতেই পিঠ চিরে দু'ফালা হয়ে গেল—ঘুরেই বন্দুক চালিয়েছিলাম। সেই বাঘিনীর একটা নখ এই গলায়। থাবা আর গোঁফ চালান দিয়েছি মালয়ে।"

"থাবা আর গোঁফ? বাঘের?"

"ওই দিয়ে কবচ ওরা বানায়। ভাল দাম পেয়েছি। হাড় বেচেছে ঢোলগোবিন্দ।"

"মোহর?"

"ও নাকি পায়নি। মিথ্যে কথা। তারপরেই ব্যবসা ছেড়ে এখানে বাড়ি কিনেছে। আর আমাদের নাড়িনক্ষত্র ফরেস্ট অফিসে জানাচ্ছে। স্বপ্নে ওর পাপের সাজা দেখে তাই ছুটে এসেছিলাম। মোহর বেচা টাকায় কেনা বাড়িটা দেখে গেলাম, মড়াটা আর দেখা হল না। আর কিছু জানতে চান?"

"না," বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। শিব-পুরীতে ফিরে ঢোলগোবিন্দকে বলল, "রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘুমোন?"

শব্দহীন অট্টহাস্য করে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তা ঘুমোই। তবে পাতাল-সুড়ঙ্গগুলো টাটুকে দেখিয়েছি। ক্ষমতা থাকে তো আসুক সেই পথে।"

অট্টহাস্য মিলিয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার বাঘ-নখ কোথায়?"

"আমার ছেলের গলায়," বলে বাঘের চাহনি মেলে একদৃষ্টে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া দেখে গেল ঢোলগোবিন্দ।

পরের দিন দুপুর নাগাদ আবার এলাম শিব-পুরীতে। এ-নাম আমার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে। শিবমন্দিরের মতো যে বাড়ির গঠন, তাকে শিব-পুরী ছাড়া কী বলব?

ইন্দ্রনাথ আগের রাতে বাড়ি ফেরেনি। কুমোরটুলিতে নেমে গেছিল এক বন্ধুর বাড়িতে রাতে আড্ডা মারবে বলে। আজ ভোরবেলা সেখান থেকেই একটা চৌকো বাক্স নিয়ে এসেছিল ওর সুভাষ সরোবরের বাড়িতে। তুহিনবাবু গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছলেন আমি তার আগেই গিয়ে দেখেছিলাম বাক্সটা। বাইরে তালা ঝুলছে। ভেতরে কী আছে, তা বলেনি ইন্দ্র।

শিব-পুরীতে এই বাক্স নিয়েই এল ইন্দ্রনাথ। মনে আছে, সেদিন ছিল বেস্পতিবার। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এল বাপ-বেটা দু'জনেই। মাধবের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আগের চেয়েও বেড়েছে। কারণটাও শুনলাম। কাল রাতে এ-বাড়িতে একমাত্র অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে কেউ খুন করে আগুনে ঝলসাচ্ছিল। আগুন জ্বলছিল বাগানে। তখন রাত একটা। মালীর ঘুম ভেঙেছিল সকলের আগে। বাবাকে নিয়ে মাধব গিয়ে দেখেছিল বীভৎস সেই দৃশ্য। শুকনো ঝরাপাতা জড়ো করে আগুন জ্বালা হয়েছে। দু'পাশে দুটো খুঁটি পুঁতে আড়াআড়ি কাঠ বাঁধা হয়েছে খুঁটি দুটোর মাথায়। কুকুরের দেহ ঝুলছে আগুনের ওপর। তার সামনের দুটো পা আর পেছনের দুটো পা আলাদা ভাবে বাঁধা। আড়াআড়ি কাঠটা গলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাঁধা পায়ের মধ্যে দিয়ে।

বাইরের ঘরে বসে সব শুনলাম। বলে গেল মাধব। চুপ করে রইল ঢোলগোবিন্দ। ঠিক যেন চৈনিক মুখ। মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না।

সব শেষে মাধব বলল, "নিশ্চয় টাট্টু মহারাজের কাজ। খুনের হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, তার প্রমাণ। এ-বাড়ি পাহারা দিত এই কুকুর। আজ রাত থেকে সে আর পাহারা দেবে না।"

"আমরা দেব," বলল ইন্দ্রনাথ। "আমাদের থাকার ব্যবস্থা করো।"

রয়ে গেলাম সেই রাতে। কিচ্ছু ঘটল না। শুক্রবার সকালে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল। বলল, "ভোরের হাওয়া খেয়ে এলাম। চমৎকার বিল। কিন্তু টাট্টুর দেখা পেলাম না। কথা রেখেছে। বাড়ি খালি। সুন্দরবনেই রওনা হয়েছে। মাধব, আর তোমার ভয় নেই।"

শুকনো হেসে মাধব বলল, "বাঁচলাম।"

ইন্দ্র বলল, "মৃগাঙ্ক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখে। পাতাল-সুড়ঙ্গ দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে। মাধব, যাও না সঙ্গে।"

দেখলাম বটে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। সারাজীবন মনে থাকবে। ইট দিয়ে বাঁধানো। সিধে হয়ে হাঁটা যায়। ঢোলগোবিন্দ সেখানে ইলেকট্রিক লাইন টেনেছে। আলোয় ঝলমল করছে। তা সত্ত্বেও গা-ছমছম করছিল সুড়ঙ্গের ঘুরপাক দেখে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কথা বলছিলাম তাই ফিসফিস করে। দেখছিলাম মূল সুড়ঙ্গের গা থেকে একটার-পর-একটা সরু সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয়। প্রত্যেকটা সুড়ঙ্গ ওপর দিকে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে শিব-পুরীর এক-একটা ঘরের দেওয়াল আলমারির মধ্যে। পাল্লা খুললেই ঢোকা যায় ঘরে।

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরের আলমারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে। উঠেও এলাম সেই ঘরে। ইন্দ্রনাথ আর তুহিনবাবু নীচে নামেনি। খোশ গল্প করছিল ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে। আমরাও জমে গেলাম বাঘের গল্পে। ঢোলগোবিন্দর মতো ঠোঁটটেপা মানুষেরও মুখ খুলিয়ে ছেড়েছে ইন্দ্রনাথ। ভয়াল ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের গল্পে আসর মাতিয়ে দিয়েছে। শুনতে-শুনতে রাত হল গভীর। খেলাম কব্জি ডুবিয়ে। গরম রুটি আর মুরগির মাংস। তারপর দই।

মাধব হাই তুলছিল অনেকক্ষণ থেকেই। টাট্টু মহারাজ তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ায় মনও ওর হালকা। উদ্বেগ চলে গেলে ঘুম তো আসবেই।

ইন্দ্রনাথ বলল, "যাও, যাও, টেনে ঘুমোও। ঢোলগোবিন্দবাবু, আপনিও ঘুমোন। দেওয়াল-আলমারিতে তালা দিয়েছেন?"

আবার শব্দহীন অট্টহাসি হেসে ঢোলগোবিন্দ বলল, "টাট্টু যখন ছিল, তখনও দিইনি, এখনও দেব না।"

মাধব বলে উঠল, "বাবা, তোমার গোঁয়ার্তুমি..."

থেমে-থেমে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তোর বুকে বাঘ-নখ ঝুলিয়েছি কেন?"

"প্রতিহিংসা তো পরে, তোমাকে তো আর ফিরে পাব না।"

"আমার সব সম্পত্তি তো পাবি।"

আমার আর ইন্দ্রনাথের শোবার জায়গা হয়েছিল একটা শিব-ঘরে। তুহিন চাকী শুতে গেলেন অন্য ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, "মৃগ, আলোটা নিভিয়ে দাও।"

দিলাম।

ও বলল, "টর্চ নাও।"

নিলাম।

"আলমারির পাল্লা খোলো। নিয়ে চলো ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে।"

পাল্লা খুলে, টর্চ জ্বালিয়ে সুড়ঙ্গে নামবার সিঁড়িতে পা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মতলব কী?"

"নাটক দেখা। ব্যস, আর প্রশ্ন নয়। চলো।"

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। সত্যিই আলমারির পাল্লায় তালা দেওয়া ছিল না। আমি আর ইন্দ্রনাথ যে-কোণে লুকিয়ে রইলাম আলনার জামাকাপড়ের আড়ালে, তার সামনাসামনি রয়েছে দেওয়াল-আলমারি। আলমারি আর আমাদের মাঝে রয়েছে খাট। ঢোলগোবিন্দ এর মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শীতের রাতে জানলার ইস্পাত-পাল্লা বন্ধ ঘরে নিকষ অন্ধকার, কিন্তু রুমাল দিয়ে টর্চের মুণ্ড মুড়ে নিয়ে যখন ঢুকেছিলাম ঘরে, তখনই আবছা আলোয় দেখেছিলাম চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে ঢোলগোবিন্দ। মাথায় বালিশ নেই। তার কারণ একটু আগেই গল্পের আসরে শুনেছি। শিরদাঁড়ার তিনটে হাড় ক্ষয়ে গেছে ঢোলগোবিন্দর। বালিশ ছাড়া ঘুমোলে আরাম পায়।

ঘণ্টাখানেক এইভাবেই বসেছিলাম। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছিল। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আলমারির পাল্লা।

খুব আস্তে খুট করে আওয়াজ হতেই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। টেনে ধরে রইল ইন্দ্রনাথ। টর্চ জ্বালাতেও পারলাম না। টর্চ রেখেছে নিজের হাতে। তাই উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

একটু-একটু করে ফাঁক হচ্ছে আলমারির পাল্লা। পেন্‌সিল-টর্চের আলো এসে পড়ল খাটে। নিভে গেল। একতাল জমাট অন্ধকার বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। নিঃশব্দে যেন পিছলে এল খাটের মাথার দিকে। তারপরেই শব্দ হল, খ্যাচ।

সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের হাতের টর্চ। এখন আর টর্চের মুণ্ড জড়ানো নেই রুমাল দিয়ে। তিন ব্যাটারির জোরালো আলো সটান গিয়ে পড়ল নিশাচরের মুখের ওপর।

সেই ছেলেটা। মিশকালো নিগ্রো-নিগ্রো আকৃতি। টাট্টু মহারাজের চ্যালা। খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরেই সে এসেছে এই শীতের রাতে। হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাঁত করে সেই মুখ আর গোটা শরীরটা ছিটকে গেল আলমারির গহ্বরে। দ্রুত পায়ের শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আমি খাট ঘুরে দৌড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথ শর্টকাট করেছিল। সময় এলে ও যে

শরীরী বিদ্যুৎ হয়ে যেতে পারে, আবার সেই প্রমাণ দেখিয়েছিল।

এক লাফে খাট ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ল আলমারির সামনে। আমি রইলাম তার পেছনে। সিঁড়িতে হাতড়ে-হাতড়ে যখন পা রাখলাম, টর্চ নিয়ে ইন্দ্রনাথ তখন উধাও।

নিঃসীম অন্ধকারে সুড়ঙ্গে পা দিয়ে কী করব যখন ভাবছি, ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই শুনলাম পিস্তলের নির্ঘোষ, মাত্র একবার। সেইসঙ্গে অস্ফুট কাতরানি। পরক্ষণেই ইন্দ্রনাথের হাঁক, "মৃগাঙ্ক, এইদিকে চলে এসো। নাটক শেষ হয়েছে।"

এখন আমরা সবাই ঢোলগোবিন্দের শোবার ঘরে। খাট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ইন্দ্রনাথ, তুহিনবাবু, মাধব আর...

ঢোলগোবিন্দ।

খাটেও শুয়ে আছে ঢোলগোবিন্দ। তার টুঁটি ছিঁড়ে দু'টুকরো। কিন্তু রক্ত-টক্ত কিছুই বেরোচ্ছে না। মুখও অবিকৃত। যেমন ঘুমোচ্ছিল, তেমনই ঘুমোচ্ছে।

কারণ, খাটের এই ঢোলগোবিন্দ মোম দিয়ে তৈরি। শুধু মুণ্ড আর টুঁটি। জ্যান্ত ঢোলগোবিন্দর মতোই মনে হচ্ছে। কুমোরটুলিতে একরাত থেকে মোম-শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করেছিল ইন্দ্রনাথ। ঢোলগোবিন্দকে ও দেখে গিয়েছিল, শিল্পী দেখেনি। ইন্দ্রনাথের মুখের বর্ণনা শুনে তৈরি করে দিয়েছিল আশ্চর্য মুণ্ড—যা টর্চের আলোয় আচমকা দেখলে জ্যান্ত মুণ্ড বলেই মনে হয়।

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে দুটো মূর্তি। মিশকালো সেই ছোকরা। আর টাট্টু মহারাজ। দু'জনেরই পায়ের ডিম থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ছোকরার পায়ে রুমাল জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে ইন্দ্রনাথ। টাট্টু মহারাজের পাগের ডিম থেকে ছুরিটা খোলেনি, মাস্‌ল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে রয়েছে।

যন্ত্রণা জড়ানো গলায় টাট্টু বলল, "ছুরিটা খুলে নাও ঢোলগোবিন্দ, পুরো বাঁ দিকটা যে অসাড় হয়ে যাচ্ছে।"

ঢোলগোবিন্দ তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় বলল, "বাকি জীবনটা ওইভাবেই অসাড় হয়ে থাক। ইন্দ্রনাথবাবু গিয়ে না পড়লে ওই ছুরি তো আমার বুকে বিঁধত।"

খেঁকিয়ে ওঠে টাট্টু, "ওর ছুরি কখনও ফসকায় না, এই ডিটেকটিভটা পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়লে..."

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেইরকমই। মিশকালো জল্লাদকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে টাট্টু মহারাজ অপেক্ষা করছিল সুড়ঙ্গে। পেছন থেকে ঢোলগোবিন্দ এসে যেই তাকে জাপটে ধরেছে, ঠিক তখনই ইন্দ্রনাথের তাড়া খেয়ে ছোকরা এসে গিয়েছিল সামনে। ইন্দ্রনাথের টর্চের আলোয় দুই মূর্তিকে ঝটাপটি করতে দেখে নিমেষে প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি বের করেছে, ফলা খুলেছে, মেরেছে ঢোলগোবিন্দর পিঠ

লক্ষ্য করে। ইন্দ্রনাথের পদাঘাতে ছুরি বিঁধেছে টাট্টুর পায়ে।

তুহিনবাবু হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন বললেন, "ব্যাপারটা কী হল ইন্দ্রনাথবাবু?"

"নাটক," বলল ইন্দ্রনাথ, "গোয়েন্দাগিরিতে এ-জিনিসটা না থাকলে জমে না। আমার ঘরে বসে মাধব যখন রাশিচক্র আঁকছে তখনই লক্ষ করেছিলাম ও ন্যাটা। তারপর শুনলাম একই বাঘিনীর নখ মাধব আর টাট্টুর গলায়। স্বপ্নটা দেখেছে কিন্তু টাট্টু। অমনি কল্পনায় দেখতে পেলাম, টাট্টুর ফন্দি। ঢোলগোবিন্দ খুন হবে। ওই বাঘ-নখে, কিন্তু দোষ চাপবে মাধবের ঘাড়ে। কারণ, পুলিশ দেখবে এ-খুনে লাভ কার? না, মাধবের। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। টাট্টু তাই স্বপ্নের কথা ছড়িয়েছে ফলাও করে, পুলিশ তা বিশ্বাস করবে না, তারা দেখবে প্রমাণ।"

"প্রমাণটাই তো আসল," বললেন তুহিনবাবু।

"এই দেখুন সেই প্রমাণ," মোমের মুণ্ডের টুঁটিতে আঙুল রাখল ইন্দ্রনাথ, "বাঘ-নখ বসেছে বাঁ দিকে। ন্যাটা হাতে ঠিক তাই হয়। আলমারি থেকে বেরিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লে বাঘ-নখ টুঁটির বাঁ দিক দিয়েই গলায় ঢুকত। কিন্তু আমি দেখেছি, ছোকরা খাটের পেছনে এসেছিল। ডান হাত শূন্যে তুলে বাঘ-নখ দিয়ে টুঁটি ছিঁড়েছে, যাতে মনে হয়, আলমারি থেকে বেরিয়েই হেঁট হয়ে সামনের দিক থেকে গলার বাঁ দিকে বাঁ হাতে বাঘ-নখ ঢুকিয়েছে মাধব।"

ফ্যাঁস করে উঠল টাট্টু মহারাজ, "এখনও আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। ঘোড়ার ডিমের ডিটেকটিভ! গুলি আপনিই চালিয়েছেন, আমার চ্যালার পা ফুটো করে দিয়েছেন।"

"না চালালে ওর আর-এক পকেট থেকে যে আর-একটা ছুরি বেরিয়ে আসত," বলে হেঁট হয়ে টাট্টু মহারাজের মিশকালো সাগরেদের হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বের করল ইন্দ্রনাথ, "ছোরার জাদুকর, তোমার খেল খতম, নাটকও শেষ। মাধব, ডাক্তার ডাকো, তিনিই খুলবেন ছুরি, বাঁধবেন ব্যান্ডেজ, নইলে রক্তপাতেই যে মরে যাবে টাট্টু, ওই তো চেহারা!"

দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠেছিল জীবন্ত কঙ্কাল।

এর কিছুদিন পরেই চার ঘড়া মোহর বেচার টাকা জমা পড়েছিল একটা বিখ্যাত সমাজকল্যাণ সংস্থায়। কে এত টাকা পাঠিয়েছে, তা কিন্তু জানা যায়নি।

জানি শুধু আমরা ক'জন।

হিমালয় রহস্য

"হ্যালো, আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আপনি তার সঙ্গেই কথা বলছেন।"

"নমস্কার। আমি পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি। টেলিফোনে বেশি কথা হবে না। কিন্তু কথা আমার অনেক। আপনার সঙ্গে। আপনি কি এখন ফ্রী আছেন?"

"আছি। কিন্তু আপনি কে?"

"আমি মোহন মুখোপাধ্যায়। নামটা কি শুনেছেন?"..

"মোহন...মোহন..."

"বিজনেস অ্যাডমিন্সট্রেশন পড়তে যে গেছিল আমেরিকায়।"

"মনে পড়েছে। উমার ভাবী বর তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"উমার সঙ্গে এস কিন্তু...পাশাপাশি দেখতে চাই দুজনকে।"

একটু থেমে মোহন বললে—"উমার খোঁজেই আপনার কাছে যাচ্ছি। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

মোহন মুখোপাধ্যায় এখন বসে আছে ইন্দ্রনাথের সামনে।

ইন্দ্রনাথ বললে—"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বাবা আর মা খুব রোগা আর লম্বা।"

"অর্থাৎ আপনি ঘুরিয়ে বলতে চান, আমি খুব রোগা আর লম্বা। লম্বা হওয়াটা একটা কমপ্লিমেন্টের ব্যাপার—কিন্তু রোগা হওয়াটা নয়। আমার বাবা বেঁটে, মা মোটা। অথচ আমি দুজনের কারও ধাত পাইনি," বলে চশমা ঠিক করে নিল মোহন মুখোপাধ্যায়। রঙ তার কালো, শরীর যতখানি সরু, মাথা সে অনুপাতে বড়। কপাল বেশ চওড়া। ধারাল নাকে আর চকচকে চোখে ইনটেলিজেন্সের

ছাপ। কথাবার্তা চটপটে। চালচলন চৌকস। আমেরিকা ট্রেন্‌ড় বিজনেস এক্সিকিউটিভ তো, পুঁতে দিলে ঠেলে বেরিয়ে যাবে অন্য দিক দিয়ে।

তারিফভরা চোখে তাকিয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বললে—"বাবা-মা'র ধাত তুমি না পেতে পার—উমা তো পেয়েছে। বাপের মতো কালো চোখ, মায়ের মতো লাল চুল। না বাঙালী না আমেরিকান। যাক সে কথা, উমা গেল কোথায় ?"

"সেইটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। আমি তো বম্বেতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চলে এলাম। ও তো এল পরে। বম্বেতে একদিনও রইল না। বললে পিসির সঙ্গে সিকিমে দিন কয়েক কাটিয়ে চলে আসবে বম্বেতে।"

"সেকি ! সিকিম থেকে এখনও ফেরেনি।"

"ফিরলে তো আপনার সঙ্গে আগে দেখা করত।"

"তা ঠিক। তা প্রায় মাসখানেক হলো সিকিমে গেছে। মায়ের গল্পই বোধহয় চালিয়ে যাচ্ছে পিসির সঙ্গে।"

"উমা পিসির কাছেও নেই !"

"তুমি গেছিলে সিকিম ?"

"হ্যাঁ, সেখান থেকেই আসছি। পিসির কাছে দুদিন দুরাত কাটিয়ে ফের কলকাতা রওনা দিয়েছিল উমা। আপনার কাছে আসেনি ?"

চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। বললে আস্তে আস্তে—"না"

উমার বাবা মহেন্দ্র ইন্দ্রনাথের অনেক কালের বন্ধু। আমেরিকায় গিয়ে সেট্‌ল করে যায়। লালচুলো এক আমেরিকানকে বিয়ে করে। মেয়ের বয়স যখন তেইশ, তখন মা মারা যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মারা যায় মহেন্দ্র নিজেও। জামাইকে সে দেখে যেতে পারেনি।

উমা ভারী চালাক চতুর মেয়ে। মোহনকে বিয়ে করবে ঠিকঠাক করে ফেলে চলে আসে ইন্ডিয়ায়। মোহন আগে এসেছিল, কেননা বম্বেতে রয়েছে ওর বাবা-মা। উমা এল পরে—বিষয় সম্পত্তির হিল্লে করার পর।

আত্মীয় বলতে একজনের নামই শুনেছিল। ওর পিসি সরলা। থাকেন সিকিমে। সরলা বিয়ে-থা করেন নি। সিকিমে তাঁর জন্ম, সিকিমেই শেষ জীবন কাটাবেন বাপের বাড়িতেই—এটা জেনে মহেন্দ্রও আর ফিরে আসেনি। মা নেই, বাবা নেই ; বাড়িঘরদোর আর ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে সে কি করবে ? দিদি থাকুক সেখানে—সুদের টাকায় চালাক জীবন।

উমা বড় ভাল মেয়ে। পিসির আশীর্বাদ নিতেই গেছিল সিকিমে। বাবার প্রাণের বন্ধু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে গেছিল যাওয়ার পথে।

কিন্তু আর ফিরে এল না।

গোয়েন্দাগিরি করে করে ইন্দ্রনাথের হাত খুব লম্বা হয়ে গেছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার খবর জুটিয়ে নেয়। সেদিনও তাই করল। পটাপট ফোন করে জেনে নিলে, সিকিম সরকারের যে বাসে সিকিম গেছিল উমা, সে বাসে তো ফেরেনি।

তবে গেল কোথায় মেয়েটা ? ফোন করা গেল না শুধু উমা পিসিকে। সিকিমের বাড়িতে টেলিফোন নেই। কিন্তু খোঁজ নেওয়া দরকার সেই বাড়ি থেকেই। তাই পরের দিনই মোহনকে নিয়ে বাসে চেপে সিকিম রওনা হলো ইন্দ্রনাথ। সারারাত জার্নি করে সিকিম পৌঁছলো পরের দিন দুপুরে। মোহন সঙ্গে ছিল বলেই উমার পিসির বাড়ি পৌঁছতে লাগল দু'ঘণ্টা—নইলে অনেক সময় লাগত।

বাড়িটা পাহাড়ের মাথায়। কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। চাল ছেয়ে আছে লতানো ফুলের গাছে। চার দিকেই ফুলের বাগান। ঠিক যেন একটা ছবি।

ওদের পায়ের শব্দে বেরিয়ে এলেন সরলা দেবী। ধবধবে ফর্সা। পাহাড়ের জলবাতাসে এই বয়সেও গাল লাল হয়ে আছে। লাল শাল দিয়ে মাথা মুখের অর্ধেক ঢেকে রাখলেও দেখা যাচ্ছে, সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। সত্যিই সন্ন্যাসিনীর মতো চেহারা। দেখলেই মাথা নুয়ে আসে।

মোহনকে বললেন—"উমাকে আনলে না ?"

মোহন বললে, "তার টিকি দেখা যাচ্ছে না।"

"দ্যাখো মেয়ের কাণ্ড ! বললাম, সাতটা দিন অন্তত থেকে যা—শরীরটা একটু সারিয়ে নিয়ে বিয়েটা করিস—কথা কি শোনে—মোহন—মোহন করে চলে গেল। কিন্তু গেল কোথায় মেয়েটা ?"

"সেই খোঁজেই তো এলাম পিসিমা।"

"মা নয়। মা নয়—স্রেফ পিসি বলবে, এস। ভেতরে এস। ইনি কে ?" বললেন ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে।

জবাব দিল ইন্দ্রনাথই, "মহেন্দ্রর বন্ধু। আপনার অনেক গল্প শুনেছি ওর কাছে।"

"কি নাম তোমার ?"

"ইন্দ্রনাথ।"

"উমাও তোমার কথা বলছিল। তোমার কাছেই তো গেল।"

"যায়নি পিসি। তাই তো এলাম।"

"আশ্চর্য কাণ্ড তো ! এস, এস, ভেতরে এস।"

সরলা দেবী একাই থাকেন এই কটেজ হাউসে। কাজের লোক পাহাড়ের নিচের গ্রামে থাকে। সকাল সন্ধে এসে কাজ করে দিয়ে চলে যায়। তারপর ফাঁকা বাড়িতে একা থাকেন সরলা দেবী। ঠাকুর ঘরে তাঁর সময় কেটে যায়।

সে এক আশ্চর্য ঠাকুরঘর। পাহাড়ি দেবদেবীদের মূর্তিতে ঠাসা। অদ্ভুত আকৃতির সে সব মূর্তি ইন্দ্রনাথ কখনও দেখেনি।

লণ্ঠনের আলোয় ধুনোর ধোঁয়ায় কিম্ভূত দেবদেবীদের দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "মহেন্দ্রর কাছে শুনেছি আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। আপনার ভেতরে যে ক্ষমতা আছে, বিজ্ঞান এখনও তার নাগাল পায়নি।"

"বাড়িয়ে বলেছে মহেন্দ্র," হাসলেন সরলা দেবী, "তবে ছেলেবেলা থেকেই

আমি অন্যরকম। কেন জানিনা, অনেক জিনিস টের পেয়ে যাই আগেভাগে—যা আর পাঁচজনে পায় না।"

"সাধনা করে বুঝি তাকে বাড়িয়েছেন ?"

"মনে তো হয়। ওই আসনে বসে যখন ধ্যান করি, তখন মনে হয়, অদৃশ্য সত্তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।"

"অদৃশ্য সত্তা ?"

"বিদেহী গুরু। তোমরা বিজ্ঞান-পড়া ছেলে, এসব বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই হিমালয়ে আমি জন্মেছি, এখানকার জলহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। হিমালয়ের অতীন্দ্রিয় রহস্য হিমালয়ের মানুষরা অনেক জেনেছে—আমি জেনেছি কিছুটা।"

"তাই এই দেবদেবী ?"

সরলা দেবী আর কিছু বললেন না। অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইলেন মেঝেয় পাতা আসনটার দিকে। কালোরঙের সরু বিনুনী দিয়ে বোনা আসন—ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা লাল গোলাপ।

ইন্দ্রনাথ বললে, "ওই আসনে বসে ধ্যান করলে বিদেহী গুরুদের দেখতে পাব ?"

"তার আগে দরকার অন্তর-শুদ্ধির। ও আসন সাধারণ আসন নয়।"

"বিনুনির বুনট। অদ্ভুত।"

"সত্যিকারের বিনুনি। খুব চট করে যারা প্ল্যানচেটে বিদেহী আত্মাদের ডেকে আনে, তাদের একটা গুপ্ত কৌশল আছে। এই পাহাড়ে থেকে আমিও তা শিখে গেছি।"

"ট্রেড সিক্রেট নাকি ?"

হাসলেন সরলা দেবী।

বললেন, "চলো, খেতে বসে বাকি কথা হবে। মেয়েটা গেল কোথায়, কাল সকালে খোঁজ নেওয়া যাবে।"

খাওয়া হলো ভালই। রুটি আর মাংস। কব্জি ডুবিয়ে খেল ইন্দ্রনাথ। কিন্তু একখানা রুটিই ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসের বাটিতে ডুবিয়ে খেল মোহন মুখোপাধ্যায়।

সারারাত বাস জার্নি আর সারা দিনের ধকল—তারপর এইরকম খাওয়া—চোখ টেনে এল ইন্দ্রনাথের।

পিসিকে বললে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে।"

সরলা দেবী বললেন, "পাবেই তো। ওই তোমাদের শোবার ঘর।"

"আপনিও তো শোবেন ?"

"তোমাদের জন্যেই এখনও জেগে আছি। পাহাড়ে ঘুম আসে তাড়াতাড়ি—ভাঙে তাড়তাড়ি। গুড নাইট।"

লণ্ঠন কমিয়ে দিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকেই উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

আস্তে ডাকল, "মোহন।"

"এখনও ঘুমোননি! একটু আগেই তো হাই তুলছিলেন।"

"ওটা অ্যাকটিং। ঘুম আমার পায়নি। উমার পেটে তো কথা থাকে না—একটা কথা বার বার মনে পড়ছে।"

"কি কথা?"

"আমার পাশে এসে বসো, তারপর বলব।"

কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে এল মোহন। বসল ইন্দ্রনাথের খাটে। গলা নামিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "উমা এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে। যাকে ওর জীবনসঙ্গী করবে বলে ঠিক করেছিল, তাকে দিয়েছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা।"

অবাক চোখে তাকায় মোহন। এখন তার চোখে চশমা নেই। তাই আরও চকচক করছে দুই চোখ।

বলল, "আপনি জানলেন কি করে?"

"উমার পেটে কোনও কথা থাকে না·বলে। জিনিসটা সঙ্গে আছে?"

"সব সময়ে সঙ্গে থাকে।"

"দেখাও।"

খাট থেকে নেমে নিজের ব্যাগ খুলল মোহন। জিনিসটা বের করে এনে দিল ইন্দ্রনাথের হাতে।

লণ্ঠনের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। নিজের ব্যাগ থেকে বের করল শক্তিশালী আতস কাচ।

বললে, "এস।"

দুজন গেল ঠাকুর ঘরে—হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে। এদিকটা এমনিতেই ফাঁকা। সরলা দেবীর ঘর অনেক দূরে।

হাতের জিনিসটা আর একটা জিনিসের পাশে রাখল ইন্দ্রনাথ। ওপরে ধরল আতস কাচ।

বললে, "তফাত দেখেছ?"

নিরক্ত মুখে মোহন বললে, "না।"

ব্রেকফাস্টের টেবিলে ইন্দ্রনাথ বলল, "পিসি আপনার ট্রেড সিক্রেট আমি জেনে ফেলেছি।"

চোখ তুললেন সরলা দেবী। কিছু বললেন না। শুধু চেয়ে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ কফির কাপে বেশ আওয়াজ করে চুমুক দিতে দিতে বলল—"আমার এক বন্ধুর বৌ মরে যাওয়ার পর একটা জিনিস হাতে রেখে প্ল্যানচেট করত। সঙ্গে সঙ্গে নাকি বউ আসত।"

"কোন জিনিস?" আস্তে আস্তে বললেন সরলা দেবী।

"বউয়ের মাথার চুল।"

শক্ত হলো সরলা দেবীর চাহনি।

আর একবার আওয়াজ করে চুমুক দিল ইন্দ্রনাথ।

বলল, "বউ মারা যাওয়ার পর ড্রেসিং টেবিলে ফুলদানির মধ্যে পেয়েছিল বউয়ের মাথার চুল। চুল আঁচড়ে চিরুনি সাফ করে দিয়ে রেখে দিত ফুলদানির মধ্যে। বউ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর তার শরীরের অংশ বলতে ছিল এই চুল। কৌটোয় ভরে রেখে দিয়েছিল বন্ধু। প্ল্যানচেটে বসলেই কৌটো খুলে চুল হাতে নিত।"

সরলা দেবী চেয়ে আছেন।

ইন্দ্রনাথ বলছে, "উমার বড় দেমাক ছিল ওর লাল চুল নিয়ে। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া লাল চুল। ভাবী বরকে দিয়েছিল বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর।"

চোখের পাতা পড়ছে না সরলা দেবীর।

"আপনার আসনটা অদ্ভুত। মানুষের চুল দিয়ে তৈরি। লম্বা চুলের বিনুনি। নিশ্চয় মারা গেছে, তাদের চুল—নইলে বেঁচে থেকে কোনও মেয়ে মাথার সব চুল দেয় না। বাকি ছিল মাঝের লাল গোলাপ। লাল চুল পাচ্ছিলেন না বলে কাজটা শেষ হচ্ছিল না। তাও শেষ করলেন উমার লাল চুল দিয়ে।"

অস্ফুট চিৎকার করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন সরলা দেবী। সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেছে—কিন্তু যেন দু টুকরো অঙ্গার জ্বলছে চোখের মণিতে।

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথও। দু হাত ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে এক গোছা লাল চুল বের করে বললে—"উমার চুল। হুবহু মিলে গেল লাল গোলাপের সঙ্গে। বডিটা কোথায় পিসি? বলবেন না? বেশ, বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। আজ খুব ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে চারপাশ দেখে এলাম তো। পাহাড়ের ধারে ওই যে গভীর খাদ—তার নিচে। ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন—তারপর নেমে গিয়ে মাথার সব চুল কেটে এনেছিলেন—মাংস টাংস জঙ্গলের জানোয়াররা খেয়ে গেছে। কিন্তু একাজ কেন করলেন পিসি? আপনার একমাত্র ভাইঝির চেয়ে বড় হলো, বিকৃত কেশ-সাধনা?"

আছড়ে পড়লেন সরলা দেবী। তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন।